তারীখুল ইসলাম

প্রথম খণ্ড

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

মক্কী জীবন

মূল উর্দূ

হযরত মওলানা সৈয়্যদ মোহাম্মদ মিয়া (ভারত)

অনুবাদ

মোহাম্মদ খালেদ

আশরাফিয়া লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা– ১২১১

তারীখুল ইসলাম

মূল উর্দূ ঃ হযরত মওলানা সৈয়্যদ মোহাম্মদ মিয়া (ভারত)

অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ খালেদ

প্রকাশক ঃ

মোহাম্মদ ইউসুফ

আশরাফিয়া লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা-১২১১

ফোন ঃ ৭৩১৪৭৮৯

তৃতীয় প্রকাশ ঃ জানুয়ারী, ২০০৩

মূল্য ঃ ২৫.০০ টাকা

TARIKHUL ISLAM : written by Hazrat Moulana Sayed Mohammad Mian in urdu, translated by Mohammad Khaled in to bengali and published by Ashrafia Library, Chawk Bazar, Dhaka, Bangladesh.

Price : Tk : 25.00 only.

উৎসর্গ

ইসলামী প্রকাশনা জগতের
অন্যতম পথিকৃত
ঢাকা আশরাফিয়া লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা,
মরহুম মওলানা আব্দুল আজীজ সাহেবের
রূহের মাগফেরাত কামনায়।

---অনুবাদক।

অনুবাদকের আরজ

ইসলামী ইতিহাসের উপর উর্দু ভাষায় রচিত "তারীখুল ইসলাম" একটি প্রসিদ্ধ পাঠ্যগ্রন্থ। ভারতের খ্যাতিমান আলেম, তৎকালীন জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের মহাসচিব হযরত মওলানা সৈয়্যদ মোহাম্মদ মিয়া সাহেবের রচিত এই মূল্যবান কিতাবটি আজ প্রায় অর্ধশত বছরেরও অধিক কাল যাবৎ ভারত, পাকিস্তান, বর্মা, শ্রীলঙ্কা এবং দক্ষিণ আফ্রিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে সিলেবাসভুক্ত হইয়া পঠিত হইতেছে। বিশেষতঃ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের প্রায় অধিকাংশ কওমী মাদ্রাসা সমূহে ইহা ব্যাপকভাবে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

এক কথায় "তারীখুল ইসলাম" সুদীর্ঘ কাল যাবৎ এতদাঞ্চলের মাদ্রাসা সমূহের তালেবুল এলেমদের জ্ঞান পিপাসা মিটাইয়া আসিতেছিল। এক্ষণে উহার বাংলা অনুবাদ বাহির হওয়ার ফলে দেশের সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহেও ইহা সিলেবাসভুক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হইল। তিন খণ্ডে সমাপ্ত তারীখুল ইসলামের ইহা প্রথম খণ্ডের অনুবাদ।

প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের উপযোগী ইসলামী ইতিহাসের মৌলিক বিষয়ের উপর প্রশ্নোত্তর আকারে রচিত এই কিতাবটির উপস্থাপনা ও ভাষা এমনই সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল যে, শিক্ষার্থীরা সহজেই ইহা পাঠোদ্ধার ও হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয়। অনুবাদের ক্ষেতেও মূল কিতাবের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখিতে চেষ্টা করা হইয়াছে; বরং অত্র অনুবাদের বাড়তি বৈশিষ্ট্য হইল- প্রতিটি বিবরণ শেষেই "শব্দার্থ" শিরোনামে কঠিন শব্দ সমূহের অর্থ পৃথকভাবে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। বলাবাহুল্য তারীখুল ইসলামের ইহাই প্রথম বঙ্গানুবাদ।

অনুবাদের ক্ষেত্রে "কোথাও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে নাই" এমন দাবী আমি করিব না। বরং অতীব বিনয়ের সহিত ইহাই আরজ করিব, আমার অযোগ্যতা ও অসতর্কতার কারণে কিছু ভুল-ত্রুটি থাকিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। সুধী পাঠকবর্গ আমাকে উহা ধরাইয়া দিলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব। আল্লাহ পাক আমাদের এই নগণ্য মেহনত কবুল করুন এবং ইহাকে পরকালের নাজাতের উছিলা করিয়া দিন। আমীন!

বিনীত

মোহাম্মদ খালেদ

সূচীপত্র

অনুবাদকের অন্যান্য বই

- ✯ সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া (সঃ)
- ✯ খাতামুন্নাবিয়্যীন (সঃ)
- ✯ ওসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম (সঃ)
- ✯ বিশ্ব নবীর (সঃ) তিনশত মোজেযা
- ✯ হাফেজ্জী হুজুর জীবনের ধাপে ধাপে
- ✯ আউলিয়া কেরামের হাজার ঘটনা (দুই খণ্ড)
- ✯ ফাজায়েলে কোরআন
- ✯ ফাজায়েলে মেসওয়াক
- ✯ মৃত্যুর স্মরণ
- ✯ হাশরের ময়দান
- ✯ মোনাব্বেহাত
- ✯ আহকামে মাইয়্যেত
- ✯ উম্মতের ঐক্য
- ✯ তওবা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

ইতিহাস বিষয়

প্রশ্ন : এই কিতাব যাহা তোমরা পাঠ করিতেছ কোন্ বিষয়ে (লিখিত)?

উত্তর : ইতিহাস বিষয়ে।

প্রশ্ন : ইতিহাস কাহাকে বলা হয়?

উত্তর : ইতিহাস ঐ এলেমের নাম যাহা দ্বারা বর্তমান ও অতীত যুগের মানুষের অবস্থা জানা যায়।

প্রশ্ন : ইতিহাসের এলেম কাহাদের জন্য উপকারী?

উত্তর : প্রতিটি জ্ঞানবান মানুষের জন্য।

প্রশ্ন : ইতিহাসের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা কি?

উত্তর : বর্তমান সময়ে যেই অবস্থা বিরাজ করিতেছে উহাকে অতীত অবস্থার সঙ্গে তুলনা করিয়া উহার ফলাফল বাহির করা এবং সেই ফলাফল অনুযায়ী কাজ করা।

প্রশ্ন : উহার উদাহরণ দাও।

উত্তর : যেমন, এক সময় কোন দেশের প্রজাগণ সেই দেশের বাদশার বিরোধী ছিল। আর মনে কর, ঐ বিরোধিতার কারণ হইল– বাদশাহ্ প্রজাদের উপর জুলুম করিত। এখন দেখিতে হইবে,

প্রজাগণ কেমন করিয়া বাদশার জোর-জুলুমের মোকাবেলা করিয়াছিল এবং উহার ফলাফল কি হইয়াছিল।

প্রশ্ন ঃ এই পর্যালোচনা দ্বারা বাদশাহ ও প্রজাদের কি উপকার হইবে?

উত্তর ঃ বাদশার এই উপকার হইবে যে, তিনি বুঝিতে পারিবেন, জুলুমের পরিণতি কি হয়? অর্থাৎ- জুলুমের পরিণতি যদি হয় বাদশাহী ও রাজত্বের ধ্বংস ও বরবাদী, তবে তিনি জুলুম ত্যাগ করিয়া প্রজাসাধারণকে খুশী করিতে চেষ্টা করিবেন। আর প্রজাদের এই উপকার হইবে যে, তাহারা অতীত অবস্থার আলোকে (জুলুমের বিরুদ্ধে) সংগ্রামের পথ বাছিয়া লইবে এবং বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করিয়া দৃঢ়পদ থাকিবে- যাহা তাহাদের জন্য সাফল্যের চাবিকাঠি হইবে।

সারাংশ

এই কিতাবটি ইতিহাস বিষয়ে লিখিত। যেই ফন বা বিষয় অতীত ও বর্তমানের হালাত বলিয়া দেয় উহাকেই "ফন্নে তারীখ" বা ইতিহাস বিদ্যা বলা হয়। উহার উপকারিতা হইল, বর্তমান অবস্থাকে অতীত অবস্থার সঙ্গে তুলনা করিয়া উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা।

শব্দার্থঃ

فن- বিষয়, কৌশল, বিদ্যা। موجوده- বর্তমান। تاریخ- ইতিহাস। مفید- উপকারী, লাভজনক। مقصد- উদ্দেশ্য, লক্ষ্য। نتیجه- পরিণাম, ফলাফল, পরিণতি। مثال- উদাহরণ, উপমা। مخالف- বিরোধী, প্রতিদ্বন্দ্বী। ظلم- অত্যাচার, উৎপীড়ন, জবরদস্তি, নির্যাতন। رعیت- প্রজা, অধীনব্যক্তি। غور- গভীর চিন্তা, বিবেচনা, পর্যালোচনা। تباهی- ধ্বংস, বরবাদী। ثابت قدم- দৃঢ়পদ, স্থিতিশীল। کامیابی- সফলতা, সাফল্য, কৃতকার্যতা।

পবিত্র জীবনী

প্রশ্ন ঃ এই কিতাব যাহা তোমরা পাঠ করিতেছ, ইহাতে কাহার অবস্থা বর্ণনা করা হইবে?

উত্তর ঃ ঐ পাক নবী ও মহান পথপ্রদর্শকের যাহার প্রসিদ্ধ নাম "মোহাম্মদ" ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমাদের মাতাপিতা এবং আমাদের প্রাণ তাঁহার উপর উৎসর্গ হউক।

প্রশ্ন ঃ তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কোথাকার অধিবাসী ছিলেন?

উত্তর ঃ তিনি পবিত্র মক্কায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং এই শহরই তাঁহার আবাসভূমি।

প্রশ্ন ঃ মক্কা কোথায়?

উত্তর ঃ আরবদেশে।

প্রশ্ন ঃ আরবদেশ কোথায়, কোন্ দিকে এবং উহার উল্লেখযোগ্য কিছু বিবরণ দাও।

উত্তর ঃ আরব একটি দেশের নাম। উহা আমাদের দেশ হইতে পশ্চিম দিকে বহু দূরে অবস্থিত। হাজীগণ সেখানে হজ্ব করিতে যান। আরবদেশে বালুকাময় মাঠের সংখ্যা বেশী। কোথাও কোথাও পানির ঝরণা ও প্রস্রবণও আছে। সেই দেশে প্রচুর পরিমাণে খেজুর ও আঙ্গির ফল উৎপন্ন হয়। ছাগল এবং উটের সংখ্যাও সেখানে প্রচুর। আগের যুগে সেই সকল পশুর পশম দ্বারা কাপড় ও কম্বল প্রস্তুত করা হইত। তা ছাড়া উহাদের পশম ও চামড়া দ্বারা তাবুও বানানো হইত।

প্রশ্ন ঃ মক্কা ও কা'বার মধ্যে পার্থক্য কি এবং মসজিদে হারাম কাহাকে বলে?

উত্তর ঃ মক্কা হইল আরবের একটি শহরের নাম। ঐ শহরের এক জায়গায় কা'বা অবস্থিত। কা'বা দেখিতে একটি ঘরের মত। আনুমানিক ১২/১৫ (বার/পনের) গজ লম্বা-চওড়া সেই কা'বাঘরকে বাইতুল্লাহও বলা হয়। বাইতুল্লাহ'র দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়া হয় এবং উহার চতুর্দিকে সাতবার চক্কর দেওয়ার নাম তাওয়াফ। বাইতুল্লাহ'র চতুর্দিকে প্রাচীর ঘেরা আঙ্গিনাকে বলা হয় মসজিদে হারাম।

প্রশ্ন ঃ মক্কা কে আবাদ করিয়াছেন এবং সেখানে কাহারা বসবাস করে?

উত্তর ঃ মক্কার জমিনে সর্বপ্রথম হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্‌সালাম নিজের স্ত্রী হযরত হাজেরা (রাঃ) এবং বড় ছেলে হযরত ইসমাইল আলাইহিস্‌সালামের বসত স্থাপন করান। পরে হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর বংশধরগণ সেখানেই থাকিয়া যান। হযরত হাজেরা (রাঃ)-এর যুগেই বনু জুরহুম গোত্রের কিছু মানুষ আসিয়া সেখানে বসবাস করিতে শুরু করে। মোটকথা, মক্কার অধিকাংশ অধিবাসীই তাহাদের বংশধর।

প্রশ্ন ঃ বনু জুরহুম গোত্রের লোকেরা কোথায় বসবাস করিত?

উত্তর ঃ বর্তমানে যেখানে মক্কা অবস্থিত সেই এলাকার আশেপাশে।

প্রশ্ন ঃ হযরত ইসমাইল (আঃ) কোথায় বিবাহ করেন?

উত্তর ঃ তিনি বনু জুরহুম গোত্রের বাদশাহ মাজাজের কন্যা রেয়লাকে বিবাহ করেন।

প্রশ্ন ঃ কোরাইশ কাহাদিগকে বলা হয়?

উত্তর ঃ হযরত ইসমাইল (আঃ)–এর বংশে ফাহ্র নামে এক ব্যক্তি ছিল। তাহার অপর নাম হইল কোরাইশ। সেই ব্যক্তির বংশধরগণকেই কোরাইশ বলা হয়। তবে ইহাও প্রসিদ্ধ যে, "নজর বিন কেনানা"–এর বংশধরগণও কোরাইশ নামে পরিচিত।

প্রশ্ন ঃ হযরত ইসমাইল (আঃ)–এর বয়স কত হইয়াছিল, তাঁহার সন্তানাদি কয়জন, তিনি কোথায় ইন্তেকাল করেন এবং তাঁহাকে কোথায় দাফন করা হয়?

উত্তর ঃ তাঁহার বয়স হইয়াছিল একশত সাঁইত্রিশ বছর। সন্তানাদির মধ্যে ছিল বারজন ছেলে এবং একজন মেয়ে। তিনি মক্কাতে ইন্তেকাল করেন এবং খানায়ে কা'বার হাতীমে স্বীয় মাতা হযরত হাজেরার কবরের বরাবর তাঁহাকে দাফন করা হয়।

প্রশ্ন ঃ কা'বা শরীফ কে নির্মাণ করিয়াছেন?

উত্তর ঃ খানায়ে কা'বা সর্বপ্রথম হযরত আদম (আঃ) নির্মাণ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে উহা বিনষ্ট হইয়া গেলে উহার নাম–নিশানাও মুছিয়া যায়। পরে সেই একই স্থানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং হযরত ইসমাইল (আঃ) পুনরায় উহা নির্মাণ করেন।

সারাংশ

হযরত মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহার অবস্থা এই কিতাবে বর্ণনা করা হইবে তিনি মক্কার অধিবাসী ছিলেন। হযরত ইসমাইল (আঃ)–এর আওলাদদের মধ্যেই কোরাইশ খান্দান। মক্কা আরবের একটি শহরের নাম এবং বিশ্ব বিখ্যাত খানায়ে কা'বা সেখানেই অবস্থিত। মক্কায় সর্বপ্রথম হযরত ইসমাইল (আঃ) এবং তাঁহার মাতা হযরত হাজেরা (আঃ) বসবাস শুরু করেন। সেই সময় বনু জুরহুম গোত্রের কিছু লোক

আসিয়া তথায় বসবাস শুরু করে। তাহাদের বংশেরই "ফাহর" অথবা নজর বিন কেনানার বংশধরকে কোরাইশ বলা হয়।

মক্কা, কা'বা এবং মসজিদে হারামের মধ্যে পার্থক্য হইল- মক্কা একটি শহরের নাম, সেখানে অবস্থিত একটি গৃহের নাম কা'বা এবং উহার চতুর্দিকের আঙ্গিনার নাম মসজিদে হারাম। খানায়ে কা'বা হযরত ইব্রাহীম এবং হযরত ইসমাইল (আঃ) নির্মাণ করেন।

শব্দার্থঃ

پیشوا - পথপ্রদর্শক, নেতা, ইমাম, সরদার, রাহবর। نام نامی - প্রসিদ্ধ ও পরিচিত নাম। وطن - দেশ, মাতৃভূমি, বাসস্থান। رتیلے - বালুকাময় স্থান। چشمے - স্রোতস্বিনী, পানির ঝরণা। اون - পশম, লোম। صحن - আঙ্গিনা। غرض - উদ্দেশ্য, ইচ্ছা (এখানে- মোটকথা)। وفات - মৃত্যু, ইন্তেকাল, ওফাত। منهدم - বিধ্বস্ত, ধ্বংসপ্রাপ্ত, বিলুপ্ত, বিনষ্ট।

খানায়ে কা'বার নকশা
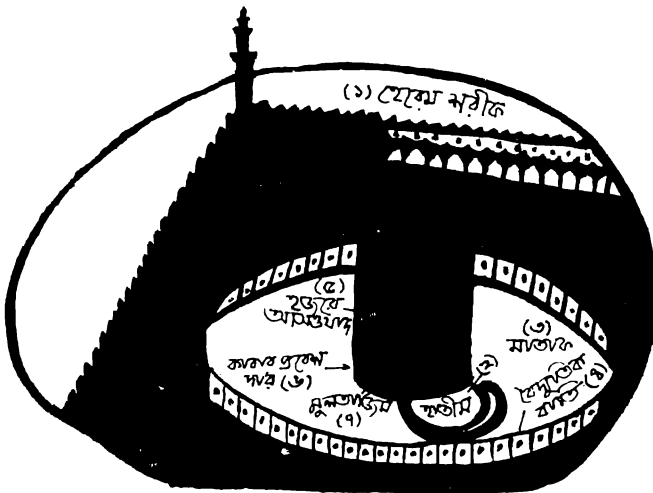
১। খানায়ে কা'বার চতুর্দিকে প্রাসাদ ঘেরা আঙ্গিনাকে হেরেম শরীফ বলা হয়।

২। খানায়ে কা'বার পয়ঃপ্রণালী, যাহা হাতীমে আসিয়া পতিত হয়।

৩। কা'বার চতুর্দিকে শ্বেত পাথর বিছানো বৃত্তাকারের খোলা মেঝে। এই মেঝের উপর দিয়াই তাওয়াফ করা হয়। এই স্থানটিকে বলা হয় মাতাফ।

৪। লোহার পাতের বেষ্টন। মাতাফের প্রান্ত ঘেষিয়া লোহার পাত দ্বারা বেষ্টন তৈরী করিয়া উহাতে বৈদ্যুতিক বাতি স্থাপন করা হইয়াছে।

৫। হজরে আসওয়াদ। খানায়ে কা'বার এই কোণে দেয়ালের কিছুটা অভ্যন্তরে হজরে আসওয়াদ স্থাপন করা হইয়াছে। জমিন হইতে আনুমানিক ছয় ফুট উপরে এবং কা'বার আস্তানা মোবারকের বাম দিকে উহা স্থাপিত।

৬। ইহা কা'বাগৃহে প্রবেশের দরজা। এই দরজার নীচের দিকের চৌকাঠের উচ্চতা প্রায় এক পুরুষ উঁচু। এই চৌকাঠকে চুম্বন করা হয়। দরজার উচ্চতার কারণে ভিতরে প্রবেশের সময় সিঁড়ি ব্যবহার করিতে হয়।

৭। মুলতাজিম। বিদায়ের সময় এখানে জড়াইয়া ধরিয়া দোয়া করা হয়।

পবিত্র জন্ম

প্রশ্ন ঃ হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের দিন–তারিখ এবং মাসের বিবরণ দাও।

উত্তর ঃ ৯ই রবিউল আউয়াল সোমবার, মোতাবেক ২০শে এপ্রিল ৫৭১ খৃষ্টাব্দ, মোতাবেক পহেলা জৈষ্ঠ, ৬২৮ বিক্রমী সালে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ঃ রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের নির্দিষ্ট সময় কোন্‌টি?

উত্তর ঃ সকালের নামাজের সময়। অর্থাৎ সোব্‌হে সাদেকের পরে এবং সূর্য উদয়ের পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ঃ হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ বছর জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর ঃ হযরত ঈসা (আঃ)–এর জন্মের পাঁচ শত সত্তর বছর পরে অর্থাৎ পাঁচশত একাত্তর বছরে, যেই বছর আসহাবে ফীলের ঘটনা ঘটে সেই বছরই তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ঃ আসহাবে ফীল কাহাদিগকে বলা হয় এবং তাহাদের ঘটনা কি বল।

উত্তর ঃ আবিসিনিয়ার বাদশাহ আবরাহা নামে এক ব্যক্তিকে ইয়ামানের গভর্ণর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই গভর্ণর ছান্‌আ নামক শহরে স্থাপিত একটি নকল কা'বাকে আবাদ করার উদ্দেশ্যে মক্কার খানায়ে কা'বাকে (আল্লাহ না করুন) ধ্বংস করিয়া দেওয়ার পরিকল্পনা করিল। সুতরাং সে এক বিশাল হস্তীবাহিনী লইয়া মক্কা আক্রমণ করিল। কিন্তু আল্লাহর ঘর ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করিবামাত্র আল্লাহ পাক (আবাবিল) পাখীর সাহায্যে আবরাহার সমুদয় বাহিনীকে ধ্বংস করিয়া দিলেন।

আসহাবে ফীল অর্থ হস্তীবাহিনী। এখানে আসহাবে ফীল দ্বারা উপরোক্ত হস্তীবাহিনীর কথাই বুঝানো হইয়াছে।

প্রশ্ন ঃ আবু রোগাল কে এবং মানুষ তাহার কবরে পাথর নিক্ষেপ করে কেন?

উত্তর ঃ আবু রোগাল কোরাইশ গোত্রেরই এক ব্যক্তির নাম। সে নিজের জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আবরাহাকে পথ দেখাইয়াছিল। আল্লাহ পাক আসহাবে ফীলের সঙ্গে সর্বপ্রথম তাহাকেই ধ্বংস করিয়া দিলেন। তাহার কবরে এই কারণে পাথর

নিক্ষেপ করা হয়, যেন মানুষের এই কথা স্মরণ থাকে যে, জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার এইরূপই শাস্তি হইয়া থাকে।

প্রশ্ন : পাখীরা কেমন করিয়া আবরাহার হস্তীবাহিনী ধ্বংস করিল?

উত্তর : পাখীরা তাহাদের ঠোঁটে ছোট ছোট পাথর লইয়া হস্তীবাহিনীর উপর নিক্ষেপ করিত– যাহা তাহাদের মাথায় বিদ্ধ হইয়া সমস্ত শরীর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যাইত। এই পাথর যাহাকে আঘাত করিত তাহাকেই ধ্বংস করিয়া দিত।

প্রশ্ন : ইহা তো বড় তাজ্জবের কথা, পাখীর ঠোঁটে এত শক্তি কোথা হইতে আসিল?

উত্তর : বন্দুকের টিগারে ছোট্ট একটি প্রাণহীন লোহার টুকরা দ্বারা যদি আমরা এত বড় শক্তির কাজ উদ্ধার করিতে পারি, তখন ইহা আর এমন কি আশ্চর্যের বিষয় যে, আল্লাহ পাক একটি জানদার পাখীর ঠোঁটের দ্বারা এই জাতীয় কাজ উদ্ধার করিবেন।

প্রশ্ন : হস্তীবাহিনীর সঙ্গে যাহারা মৃত্যুবরণ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে ইয়ামানের গভর্ণর আবরাহাও ছিল, না তাহাকে পৃথকভাবে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে?

উত্তর : আবরাহা সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে নাই; বরং তাহার দেহ পচিয়া গলিয়া হাতের একেকটি আঙ্গুল খসিয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে ছান্‌আ শহরে লইয়া যাওয়ার পর সেখানেই সে অত্যন্ত করুণভাবে মৃত্যুবরণ করে।

প্রশ্ন : রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের সময় কি ঘটিয়াছিল (অর্থাৎ ঐ সময় পৃথিবীতে অস্বাভাবিক কি কি ঘটনা ঘটিয়াছিল)?

উত্তর ঃ পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের সময় তাঁহার সম্মানিতা মাতা হযরত আমেনা একটি নূর বা আলো দেখিতে পাইলেন। ঐ আলো দ্বারা পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত গোটা এলাকা আলোকিত হইয়া গিয়াছিল। ঐ সময় হঠাৎ পারস্যের অগ্নিকুণ্ড নির্বাপিত হইয়া গেল, যাহা ক্রমাগত এক হাজার বছর পর্যন্ত অগ্নিপূজকদের উপাসনালয়ে প্রজ্বলিত ছিল। তাহারা ঐ আগুনের পূজা করিত। এদিকে পারস্যের বাদশাহ্ কিসরার রাজপ্রাসাদে হঠাৎ কম্পন সৃষ্টি হইয়া উহার চৌদ্দটি গম্বুজ ধ্বসিয়া পড়িল।

অর্থাৎ– রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের সময় এই ধরনের আরো বহু ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা বড় বড় কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

প্রশ্ন ঃ এই সকল ঘটনা কেমন করিয়া ঘটিল?

উত্তর ঃ আল্লাহ পাকের হুকুমে; যাঁহার হুকুমে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, পানি প্রবাহিত হয়, চোখ দেখিতে পায় এবং যেই আল্লাহর হুকুমে পৃথিবীর সকল কিছু কায়েম আছে।

সারাংশ

৫৭১ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল, যেই বছর আসহাবে ফীলের ঘটনা সংঘটিত হয় সেই বছরেই ৯ই রবিউল আউয়াল নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহ পাক তাঁহার জন্মের সময় আশ্চর্য ঘটনা সমূহ প্রকাশ করিয়া নিজের শান জাহের করিয়াছেন।

আসহাবে ফীলের ঘটনায় আবু রোগাল নিজের কওমের সঙ্গে গাদ্দারী করিয়া ইয়ামানের গভর্ণর আবরাহাকে সাহায্য করিয়াছিল। আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম তাহাকেই শেষ করিয়া দিয়াছেন। আবু রোগালের ইন্তেকালের পর

লোক তাহার কবরে পাথর নিক্ষেপ শুরু করিয়াছে, যেন সকলের এই কথা স্মরণ থাকে যে, নিজের কওমের সঙ্গে যেই ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হয়।

শব্দার্থঃ

پیدائش - জন্ম। صحن - আঙ্গিনা, চত্বর। سنگ مرمر - শ্বেত পাথর। فرش - মেঝে, বিছানা। قندیل - বাতি, প্রদীপ। بوسه - চুম্বন। زینه - সিঁড়ি, সোপান। آفتاب - সূর্য। دائره - বৃত্ত, সীমা, গণ্ডি। احاطه - ঘেরাও, বেড়া। سوجهنا - মনে করা, দৃষ্ট হওয়া। چنانچه - সুতরাং, অতএব, এইরূপে। چڑهائی - আক্রমণ। چونچ - পাখীর ঠোঁট। چهرا - বন্দুকের গুলি। گهوڑا - বন্দুকের টিপকল, ঘোড়া। فوراً - তৎক্ষণাৎ, সঙ্গে সঙ্গে। والده - মাতা, জননী, মা। ماجده - সম্মানিতা। آتش کده - অগ্নি-উপাসনালয়। زلزله - ভূমিকম্প, কম্পন।

পবিত্র বংশ পরম্পরা

প্রশ্ন ঃ রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত পিতা এবং সম্মানিতা মাতার নাম কি ছিল?

উত্তর ঃ তাঁহার সম্মানিত পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ এবং সম্মানিতা মাতার নাম ছিল আমেনা।

প্রশ্ন ঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদার বংশ পরম্পরা কি ছিল?

উত্তর ঃ তাঁহার দাদার বংশ পরম্পরা ছিল এইরূপঃ

মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মোত্তালিব বিন হাশিম বিন আবদে মানাফ বিন কুসাই বিন কিলাব বিন মুররাহ বিন

কায়া'ব বিন লুয়াই বিন গালিব বিন ফাহ্র বিন মালিক বিন নাজার বিন কিনানাহ্ বিন খুজাইমাহ্ বিন মুদরিকাহ্ বিন ইলিয়াস বিন মুদার বিন নাজার বিন মায়াদ বিন আদনান।

প্রশ্ন ঃ হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নানার বংশ পরম্পরা কি ছিল?

উত্তর ঃ তাঁহার মাতৃবংশ পরম্পরা ছিল এইরূপঃ

মোহাম্মদ বিন আমেনা বিন্তে ওয়াহাব বিন আব্দে মানাফ বিন জোহ্রা বিন কিলাব। কিলাব পর্যন্ত আসিয়া রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতৃকুল ও পিতৃকুল মিলিয়া যায়।

প্রশ্ন ঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদী এবং নানীর নাম কি ছিল এবং তাহারা কোন্ বংশের মানুষ ছিলেন?

উত্তর ঃ তাঁহার দাদীর নাম ছিল ফাতেমা এবং নানীর নাম ছিল বার্রাহ। তাঁহার সকল দাদী ও নানীগণ কোরাইশ খান্দানের সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা ছিলেন।

প্রশ্ন ঃ হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশীয় পরিবারকে কি বলা হয়?

উত্তর ঃ বনু হাশেম। অর্থাৎ– হাশেমের আওলাদ।

প্রশ্ন ঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোত্রের নাম কি ছিল?

উত্তর ঃ কোরাইশ।

প্রশ্ন ঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন ভাই–বোন ছিল কি? তাঁহার চাচা, জেঠা এবং ফুফু কয়জন ছিল?

এবং তাঁহার জন্মের দুই মাস পূর্বেই পিতা আব্দুল্লাহ ইন্তেকাল করেন।

প্রশ্ন ঃ রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা কোথায় ইন্তেকাল করেন?

উত্তর ঃ মদীনা মোনাওয়ারায়।

প্রশ্ন ঃ তিনি মদীনায় কেন ইন্তেকাল করিলেন?

উত্তর ঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতার নানার খান্দান "বনী নাজার" ছিল মদীনাতে। তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া যাওয়ার পথে মদীনায় যাত্রাবিরতি করিলেন। ঘটনাক্রমে সেখানেই তিনি অসুস্থ হইয়া ইন্তেকাল করেন।

প্রশ্ন ঃ রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা ত্যাজ্যসম্পদ হিসাবে কি রাখিয়া গিয়াছিলেন?

উত্তর ঃ তাহার ত্যাজ্যসম্পদের মধ্যে ছিল– পাঁচটি উট এবং উম্মে য়ামন নাম্নী একজন দাসী।

প্রশ্ন ঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতা কতদিন তাঁহার প্রতিপালন করেন?

উত্তর ঃ চার অথবা ছয় বছর বয়স পর্যন্ত। উহার পরই তাঁহার মাতা ইন্তেকাল করেন।

প্রশ্ন ঃ তাঁহার সম্মানিতা মাতা কোথায় ইন্তেকাল করেন?

উত্তর ঃ ঈওয়া নামক গ্রামে।

প্রশ্ন ঃ ঈওয়া গ্রামটি কোথায়?

উত্তর ঃ মক্কা এবং মদীনার মাঝামাঝি স্থানে।

প্রশ্ন : তিনি কি কারণে সেখানে গিয়াছিলেন?

উত্তর : মদীনা তাইয়্যেবার বনী নাজার খান্দানে নিজের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে।

প্রশ্ন : নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতার ইন্তেকালের পর তাঁহার প্রতিপালনের জিম্মাদার বা অভিভাবক কে হইলেন?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতার ইন্তেকালের পর দাসী উম্মে য়ামন তাঁহার খেদমত ও সেবা-যত্ন শুরু করেন এবং দাদা আব্দুল মোত্তালিব হইলেন তাঁহার ওলী বা অভিভাবক।

প্রশ্ন : রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতকাল আব্দুল মোত্তালিবের প্রতিপালনে (তত্ত্বাবধানে) ছিলেন?

উত্তর : আনুমানিক দুই বছর। অতঃপর আব্দুল মোত্তালিবও ইন্তেকাল করেন।

প্রশ্ন : এই সময় নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার দাদা আব্দুল মোত্তালিবের বয়স কত হইয়াছিল?

উত্তর : তাঁহার বয়স হইয়াছিল আট বছর দুই মাস দশ দিন এবং তাঁহার দাদা আব্দুল মোত্তালিবের বয়স হইয়াছিল একশত চল্লিশ বছর।

প্রশ্ন : মক্কায় আব্দুল মোত্তালিবের সম্মান ও পজিশন কেমন ছিল?

উত্তর : আব্দুল মোত্তালিবের তেমন কোন অর্থ-সম্পদ ছিল না বটে, কিন্তু মক্কার বড় বড় সরদারদের মধ্যে তিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন।

প্রশ্ন : আব্দুল মোত্তালিবের পরে রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিম্মাদার বা অভিভাবক কে হইলেন?

উত্তর ঃ তাঁহার চাচা আবু তালেব। অর্থাৎ- হযরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর পিতা।

প্রশ্ন ঃ হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে "উম্মী" বলা হয় কেন?

উত্তর ঃ "উম্মী" এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি লেখাপড়া জানেন না। রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে ঐ অবস্থাটি বিদ্যমান ছিল। এই কারণেই তাঁহার পদবী "উম্মী" হইয়াছিল।

প্রশ্ন ঃ তিনি কি কারণে "উম্মী" ছিলেন এবং দৃশ্যতঃ উহাতে আল্লাহ পাকের কি হেকমত ছিল?

উত্তর ঃ প্রথমতঃ সেই যুগে আরবে লেখাপড়ার চর্চাই ছিল না। মক্কার মত এত বড় শহরেও সর্বমোট পাঁচ-সাত জন মানুষই লেখাপড়া জানিত। তা ছাড়া হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিপালকগণ একে একে ইন্তেকাল করিতে লাগিলেন। ফলে তিনি এতীম অবস্থায়ই প্রতিপালিত হন, এই কারণেই তিনি "উম্মী" ছিলেন। এই বিষয়টির ছহী এলেম এবং উহার আসল রহস্য আল্লাহ্ পাকেরই জানা আছে। তবে দৃশ্যতঃ উহার কয়েকটি ফায়দা ও তাৎপর্য জানা যায়-

১। গোটা পৃথিবীর আদব-আখলাক ও সভ্যতা শিক্ষাদানকারী হইবেন তিনি এবং তাঁহার শিক্ষক হইবেন একমাত্র আল্লাহ। কোন মানুষই যেন তাঁহার শিক্ষক হইয়া এই কথা বলিতে না পারে যে, তিনি আমার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত।

২। রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লালন-পালনের ব্যাপারেও যেমন তাঁহার মাতাপিতার অনুগ্রহ হইতে মুক্ত রাখা হইয়াছে,

...তাঁহার শিক্ষা ও রূহানী তরবিয়তের ব্যাপারেও যেন তাঁহার ... কাহারো অনুগ্রহ না হয়।

... কথাও যেন মনে করার সুযোগ না থাকে যে, অমুক ব্যক্তি নবী ...াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষক ছিল। কেননা, সেই ক্ষেত্রে ... (আল্লাহ এমন না করুণ) তাঁহার তুলনায় বড় আলেম মনে করা ...

... যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কোরআন ...হবে, তখন আর কেহ এই কথা কল্পনাও করিতে পারিবে না যে, ... বানানো।

... নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই যখন গোটা ...কে বিদ্যা-বুদ্ধি ও আদব-তাহজীব শিক্ষা দিবেন, তখন আর কেহ ... ধারণা করিতে পারিবে না যে, তিনি পূর্ববর্তী কিতাব সমূহ দেখিয়া ... সকল শিক্ষা দিতেছেন।

...: নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কি কারণে বিভিন্ন মুসীবতে লিপ্ত করানো হইয়াছে?

...: নিয়ম হইল- আল্লাহ পাকের বিশিষ্ট বান্দাদের উপর অধিক কঠোরতা আরোপ করা হয়, যেন এই বিষয়ে পরীক্ষা হইয়া যায় যে, বিপদের সময় তাহারা আল্লাহ পাকের রেজামন্দি ও সন্তুষ্টির প্রতি কতটুকু লক্ষ্য রাখেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু নিজের সৃষ্টিকর্তার সবচাইতে উত্তম ও বিশিষ্ট বান্দা ছিলেন, এই কারণেই তাঁহাকে অধিক মুসীবত ও কষ্ট বরদাস্ত করিতে হইয়াছে। ফলে তিনি যেন বিভিন্ন পরীক্ষায় বহু সনদ ও সার্টিফিকেট হাসিল করিলেন। আর সাধারণ নিয়ম হইল, যেই ব্যক্তির অধিক সার্টিফিকেট থাকে তাহাকেই বেশী ইজ্জত করা হয়।

সারাংশ

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের পূর্বেই তাঁহার পিতা মদীনায় ইন্তেকাল করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার বয়স যখন চার কিংবা ছয় বছর হইল, তখন তাঁহার মাতাও দুনিয়া হইতে চির বিদায় গ্রহণ করেন। এই পরিস্থিতিতে দাসী উম্মে য়ামন এবং দাদা আব্দুল মোত্তালিবের উপর তাঁহার প্রতিপালনের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। পরবর্তীতে তাঁহার বয়স যখন আট বছর দুই মাস দশ দিন পূর্ণ হয় তখন তাঁহার দাদাও একশত চল্লিশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। এইবার চাচা আবু তালেবের উপর তাঁহার লালন-পালনের দায়িত্ব অর্পিত হয়।

শব্দার্থঃ

پرورش - প্রতিপালন, লালন-পালন, শিক্ষাদান। عمر - বয়স। تجارت - ব্যবসা। شام - সিরিয়া দেশ। اتفاق سے - ঘটনাচক্রে, ঘটনাক্রমে, হঠাৎ। ترکہ - মৃতব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পদ। رشتہ دار - আত্মীয়-স্বজন। ولی - অভিভাবক। ذمہ دار - দায়িত্বপ্রাপ্ত, দায়ী (এখানে অভিভাবক)। عرصہ - কাল, সময়, মধ্যবর্তী সময়। تقریبًا - আনুমানিক। حیثیت - মর্যাদা, পদমর্যাদা, পজিশন। معزز - সম্মানিত, মহান, ইজ্জতওয়ালা। امی - যে কাহারো নিকট লেখাপড়া শিখে নাই, নিরক্ষর, অশিক্ষিত। واقف - জ্ঞাত, পরিচিত, পরিজ্ঞাত। چونکہ - যেহেতু, কাজেই। لقب - পদবী, উপাধি, জাতি-বংশ-বিদ্যা-সম্মান-প্রভৃতির পরিচায়ক নামবিশেষ। ظاہر - প্রকাশিত, স্পষ্ট, দৃষ্ট। حکمت - রহস্য, জ্ঞান, বিজ্ঞতা, নিপুণতা, দর্শনশাস্ত্র। کل - সকল, সম্পূর্ণ, সর্বমোট। علاوہ - ব্যতীত, ছাড়া। تربیت - শিক্ষা, উপদেশ, লালন-পালন, প্রতিপালন। تہذیب - সভ্যতা, ভদ্রতা, শিষ্টাচার।

احسان। উপকার, অনুগ্রহ। آزاد – মুক্ত, যে কাহারো অধিন নহে, স্বাধীন। روحانی – আধ্যাত্মিক, আত্মিক। فلاں – অমুক, অনির্দিষ্টভাবে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত। معاذ الله – আল্লাহ রক্ষা করুন। وهم – সন্দেহ, কল্পনা, ধারণা, অনুমান, চিন্তা। عقلمندی– বুদ্ধিমত্তা। دانائی– বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা। مبتلا – লিপ্ত, পতিত, সমাবৃত, জড়িত। سختی– কঠোরতা, নির্মমতা, কর্কশতা। آزمانا– পরীক্ষা করা, প্রমাণ করা। افضل– উত্তম, উৎকৃষ্ট, পরমোৎকৃষ্ট। رب – প্রতিপালক, পালনেওয়ালা, রক্ষক, আল্লাহ। خاص– খাস, বিশেষ, বিশিষ্ট, প্রধান। رضامندی– সন্তুষ্টি।

নবী করীম (সঃ)—এর দুগ্ধপানের জমানা

প্রশ্ন ঃ রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম কার দুধ পান করেন এবং পরবর্তীতে তিনি কার কার দুধ পান করেন উহার বিস্তারিত বিবরণ দাও।

উত্তর ঃ সর্বপ্রথম তাঁহার জননী হযরত আমেনা তাঁহাকে দুধ পান করাইবার পর আবু লাহাবের দাসী ছুআইবা তাঁহাকে দুধ পান করান। অতঃপর হযরত হালিমা ছা'দিয়া এই সম্পদ লাভ করেন।

প্রশ্ন ঃ ছুআইবা যখন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুধ পান করান তখন তিনি আজাদ ছিলেন, না দাসী ছিলেন?

উত্তর ঃ আজাদ ছিলেন।

প্রশ্ন ঃ তিনি কখন (কিভাবে) আজাদ হইলেন?

উত্তর ঃ দাসী ছুআইবা যখন নিজের মনিবকে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের সংবাদ দিল, তখন তিনি

ভ্রাতুষ্পুত্রের (ভাতিজার) জন্মের সংবাদে খুশী হইয়া ছুআইবাকে আজাদ করিয়া দিয়াছিলেন।

প্রশ্ন ঃ হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কি কারণে অন্যান্য মহিলাদের দুধ পান করানো হইয়াছিল?

উত্তর ঃ আরবের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সাধারণ নিয়ম ছিল, তাহাদের সন্তানদিগকে দুধ পান করানোর জন্য আশেপাশের গ্রামে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। উহার ফলে শিশুদের শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতির সাথে সাথে তাহাদের ভাষাও সুন্দর হইত। কেননা, শহরে বাহিরের বিভিন্ন ধরনের মানুষের সংমিশ্রণের ফলে সেখানকার ভাষা সুন্দর থাকিত না।

প্রশ্ন ঃ হযরত হালিমা ছা'দিয়া (রাঃ) কেমন করিয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছাইলেন?

উত্তর ঃ হযরত হালিমা ছা'দিয়ার (রাঃ) গোত্রের মহিলাগণ ব্যাপকভাবে কোরাইশ গোত্রের শিশুদিগকে দুধ পান করাইত। এই উদ্দেশ্যে বছরে তাহারা দুইবার মক্কায় আগমন করিত; যেন ঐ সময়ে সেখানে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগকে দুধ পান করানোর জন্য সংগ্রহ করা যায়। সুতরাং এই সূত্রে হযরত হালিমাও নিজের গোত্রের মহিলাদের সঙ্গে তায়েফ হইতে যাত্রা করিয়া মক্কায় আগমন করিয়াছিলেন।

এদিকে (শারীরিক দুর্বলতার কারণে) হযরত হালিমা (রাঃ)–এর বুকে দুধ ছিল কম। এই কারণে তিনি সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের সন্তান সংগ্রহ করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুধ পান করাইবার সৌভাগ্য তাহার হস্তগত হইল। কেননা, (হযরত হালিমা যেমন

শারীরিক ভাবে দুর্বল ছিলেন, ঠিক তেমনি) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ছিলেন এতীম এবং তাঁহার পক্ষ হইতেও বিশেষ কোন সম্মানী ও পুরস্কার পাওয়ার আশা ছিল না।

প্রশ্ন ঃ এই এতীম মাণিক্য হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদম মোবারকের বরকতে হযরত হালিমা এবং তাহার কবীলায় কি কি বরকত প্রকাশ পাইয়াছিল?

উত্তর ঃ হযরতের উছিলায় বহু বরকত প্রকাশ পাইয়াছিল। এখানে উহার কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হইতেছেঃ

১। হযরত হালিমা ছা'দিয়ার দুধ এত বৃদ্ধি পাইল যে, ইতিপূর্বে তাহার যেই সন্তানটি অভুক্ত থাকিত এখন হযরতের সঙ্গে সেও পেট ভরিয়া পান করিতে লাগিল।

২। হযরত হালিমার যেই উটনীর দুধ শুকাইয়া গিয়াছিল, আল্লাহর হুকুমে সেই উটনী এখন এত দুধ দিতে লাগিল যে, সকলের জন্য উহা যথেষ্ট হইতেছিল।

৩। হযরত হালিমা (রাঃ) একটি গাধার উপর সওয়ার হইয়া মক্কায় আসিয়াছিলেন। তাহার দুর্বল ও শীর্ণদেহী গাধাটি সকলের পিছনে পিছনে চলিতেছিল। কিন্তু মক্কা হইতে ফিরিবার সময় রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উছিলায় আল্লাহর হুকুমে সেই গাধাটি এত দ্রুতগামী হইয়া গেল যে, এইবার উহা সকলের আগে আগে চলিতে লাগিল।

৪। বাড়ীতে আসিয়া তাহারা দেখিতে পাইলেন, (ইতিপূর্বে) দুর্ভিক্ষের কারণে তাহাদের যেই বকরীগুলি এবং উহাদের দুধ শুকাইয়া গিয়াছিল; কিন্তু রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (আগমনের) বদৌলতে উহাতে বরকত দেখা দিল এবং উহারা পরিপূর্ণ দুধ দিতে লাগিল।

প্রশ্ন ঃ এই সময় কোন বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছিল কি?

উত্তর ঃ দুই বছর পর দুধ ছাড়াইয়া দিয়া হযরত হালিমা (রাঃ) রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার মাতার নিকট ফিরাইয়া দিয়া আসিতে মক্কায় লইয়া গেলেন। কিন্তু মক্কায় তখন প্লেগ ছড়াইয়া গিয়াছিল। এদিকে হযরত হালিমা ছা'দিয়া (রাঃ) ইতিপূর্বেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকত ও স্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষনে তিনি মক্কার আবহাওয়া দুষণের উছিলা দিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া আসিলেন। কিন্তু মক্কা হইতে তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া আসিবার অল্প কিছুদিন পরই এক বিস্ময়কর ঘটনা দেখা দিল।

একদিন দুইজন ফেরেস্তা মানুষের ছুরত ধারণ করিয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে আসিয়া হাজির হইলেন। অতঃপর তাহারা হুজুরের কচি সীনা মোবারক চিরিয়া হৃদপিণ্ড বাহির করিয়া উহা নূর দ্বারা ভরিয়া দিলেন। এই সময় রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় দুধভ্রাতার সঙ্গে ছাগল চরাইতে মাঠে তাশরীফ আনিয়াছিলেন। তাঁহার দুধভ্রাতা হযরত হালিমাকে এই ঘটনা অবহিত করিলেন। আর তিনি নিজে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ পেশ করিলেন।

উপরোক্ত ঘটনা শুনিবার পর হযরত হালিমার মনে ভয় সৃষ্টি হইল এবং তিনি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার বাড়ীতে ফেরৎ দিয়া আসিলেন।

সারাংশ

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রথমে তাঁহার মাতা অতঃপর হযরত ছুআইবা দুধ পান করান। পরে স্থায়ীভাবে হযরত হালিমা

...দিয়ার নিকট এই খেদমত সোপর্দ হয়। সেখানে দুই বছর দুধ পান ...ানো হইল। এই সময়ে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উছিলায় ...হু বরকত প্রকাশ পায়। উপরে উহার তিন–চারিটি ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে।

শব্দার্থঃ

زمانه– সময়, কাল, যুগ, জমানা। تفصيل– বিস্তারিত বিবরণ, ...াখ্যা। باندى– দাসী। آقا– মালিক, মনিব, প্রভু। قاعده– নিয়ম, পদ্ধতি, বিধান। قرب– নিকট, নৈকট্য। جوار– আশপাশ, প্রতিবেশ, নিকট। ديهات– গ্রাম, পল্লী। جسمانى– দৈহিক, শারীরিক। زبان– ভাষা, জিহবা, রসনা, প্রতিজ্ঞা, (এখানে ভাষা)। كيونكه– কেননা, এই জন্য যে, এইভাবে যে,। عام– (খাস এর বিপরীত), সাধারণ, ব্যাপক। لهذا– সুতরাং, অতএব, এই কারণে। سعادت– সৌভাগ্য। شكم سير– উদরপূর্তি, পেটপুরিয়া আহার, তৃপ্ত হওয়া। كافى– যথেষ্ট। خچر– গাধা, ভারবাহী পশুবিশেষ, খচ্চর। دبلا– শীর্ণ, ক্ষীণ, পাতলা। چست– চালাক, দ্রুত, হুশিয়ার, ফুর্তিবাজ। قحط– দুর্ভিক্ষ, অভাব, দুর্মূল্যতা। باعث– কারণ। خشك– শুষ্ক, শুকনা। طاعون– প্লেগ। شكل– আকার, আকৃতি, ছুরত। قلب– হৃদপিণ্ড, হার্ট, মন। جنگل– মাঠ, বন, জঙ্গল, বনভূমি। خوف– ভয়, আতঙ্ক, ভীতি। مستقل– স্থায়ী, দৃঢ়, অটল।

নবুয়্যতের পূর্বে হযরতের জীবন

প্রশ্ন ঃ শৈশবে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র কেমন ছিল?

উত্তর ঃ তিনি অত্যন্ত মেধাবী, বুদ্ধিমান, সৎস্বভাব, ধৈর্যশীল এবং

স্বাবলম্বী ছিলেন। ভাব-গাম্ভীর্য ও শিষ্টাচারের তিনি যেন এক মূর্তিমান পুরুষ ছিলেন। খেলাধুলার প্রতি তাঁহার মোটেও আকর্ষণ ছিল না। তাঁহার লজ্জা-শরমের এমন অবস্থা ছিল যে, উহার কারণে কখনো তাঁহার ছতর খুলিতে পরিত না। ঘটনাক্রমে একবার তাঁহার ছতর খুলিয়া গেলে তিনি অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলেন।* খানা খাওয়ার সময় শিশুরা হৈ চৈ করিত, কিন্তু তিনি নীরবে বসিয়া থাকিতেন। চাচা আবু তালেব যখন তাঁহাকে আহবান করিতেন তখন তিনি দস্তরখানে তাশরীফ আনিয়া খাবার গ্রহণ করিতেন। যেইরূপ খাবারই যোগাড় হইত উহাতে তিনি কখনো নাক সিটকাইতেন না।

সততা, আমানতদারী, আদব, মান্যতা ও সভ্যতা যেন তাঁহার স্বভাবে পরিণত হইয়াছিল। অথবা এইরূপ বল যে, আল্লাহ পাক যেন স্বীয় কুদরতী হাতে তাঁহার সত্তাকে সকল ভাল কাজের প্রতিচ্ছবি বানাইয়া দিয়াছিলেন।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বুদ্ধিমান হইলেন তখন হইতেই তাঁহার মধ্যে নিজের হাতে উপার্জন করিয়া জীবন-যাপনের আগ্রহ সৃষ্টি হইয়াছিল। অপর কাহারো উপর নিজের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া তিনি কখনো পছন্দ করিতেন না। সুতরাং তোমাদের কর্তব্য, তোমরাও এই নীতি অনুসরণ কর।

টীকা

* ইহা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শৈশবের ঘটনা। তখন বাইতুল্লাহ শরীফের সংস্কার কাজ চলিতেছিল। এই সময় তিনি ছোট চাচা হযরত আব্বাসের সঙ্গে পাথর বহন করিয়া সামনে আগাইয়া দিতেছিলেন। মাথা অথবা-

প্রশ্ন ঃ সমঝদার ও বুদ্ধিমান হওয়ার পর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিকা উপার্জনের কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন?

উত্তর ঃ তিনি শ্রমের বিনিময়ে বকরী চরাইতেন এবং ব্যবসাও করিতেন।

প্রশ্ন ঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়্যত লাভের পূর্বে কোন ছফর করিয়াছিলেন কি?

উত্তর ঃ ব্যাপকভাবে দুইটি ছফরের কথা উল্লেখ করা হয়।

প্রশ্ন ঃ তিনি কোথায় এবং কি উদ্দেশ্যে ছফর করিয়াছিলেন?

উত্তর ঃ দুইবারই তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া ছফর করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন ঃ সিরিয়ার প্রথম ছফর কবে এবং কিরূপে হইয়াছিল?

উত্তর ঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন বার বছর দুই মাস দশ দিন পূর্ণ হয় তখন তাঁহার চাচা আবু তালেব ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া ছফর করেন এবং হুজুরকেও সঙ্গে লইয়া যান।

প্রশ্ন ঃ এই ছফরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা কি বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ আবু তালেবের কাফেলা যখন "বুসরা" নামক স্থানে আসিল তখন জনৈক রাহেব (খৃষ্ট ধর্মযাজক) কাফেলায় আসিলেন এবং পূর্ববর্তী

পূর্বের পৃষ্ঠার টীকাংশ

কাঁধের উপর পাথর রাখা কষ্টকর ছিল, এই কারণে হযরত আব্বাস মনে করিলেন, তাঁহার কাঁধের উপর যদি কোন কাপড় রাখিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে পাথরের কারণে কাঁধ ছিলিয়া যাইবে না। এই মনে করিয়া তিনি হযরতের লুঙ্গিটি খুলিয়া তাঁহার কাঁধে রাখিতে চাহিলেন। কিন্তু হযরতের ছতর খুলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন এবং আকাশের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে তাকাইয়া আমার লুঙ্গি! আমার লুঙ্গি!! বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। অতঃপর সঙ্গে সঙ্গে লুঙ্গি পরাইয়া দিলে তিনি শান্ত হইলেন। (বোখারী শরীফ- ১ম খণ্ড, ৫৪০ পৃঃ)

কিতাব সমূহের বিবরণ অনুযায়ী হুজুরের (সঃ) চেহারায় আখেরী জমানার নবীর সকল আলামত হুবহু দেখিতে পাইয়া আবু তালেবকে বলিলেন, তোমার ভাতিজা সেই আখেরী নবী; যাঁহার আলোচনা তাওরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদি আসমানী কিতাবে করা হইয়াছে। তাঁহার ধর্ম দুনিয়ার সকল ধর্মকে বিলুপ্ত করিয়া দিবে। আল্লাহ পাক গোটা পৃথিবীর জন্য তাঁহাকে "রহমত" বানাইবেন। তুমি তাঁহার প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখিবে এবং কস্মিনকালেও তাঁহাকে সিরিয়ায় লইয়া যাইবে না। কেননা, এই বিষয়ে আশঙ্কা আছে যে, তথাকার ইহুদীরা তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে শহীদ করিয়া ফেলিবে।

প্রশ্ন ঃ খৃষ্ট ধর্মযাজকের পরামর্শের পর আবু তালেব কি করিলেন?

উত্তর ঃ রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কায় ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন।

সারাংশ

হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শৈশব হইতেই যেন উন্নত চরিত্রের প্রতিমূর্তি ছিলেন। জীবনের শুরু হইতেই নিজের হাতে উপার্জন করিয়া জীবন-যাপনের প্রতি তাঁহার আগ্রহ জন্মিয়াছিল। বার বছর বয়সে চাচা আবু তালেব তাঁহাকে সিরিয়ার দিকে লইয়া যান। পথে এক রাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত হইলে তিনি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনিতে পারিয়া মক্কায় ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন।

শব্দার্থঃ

زندگی - জীবন, প্রাণ, হায়াত। لڑکپن - শৈশব, বাল্যকাল। اخلاق - চরিত্র, আচার-ব্যবহার, স্বভাব। ذہین - ঐ ব্যক্তি যাহার বুদ্ধি প্রখর, বুদ্ধিমান, হুশিয়ার। سمجھدار - বুদ্ধিমান। نیک طبیعت -

[illegible]। صابر – ধৈর্যশীল। سنجيدگى – গাম্ভীর্য। توجه – মনোযোগ, [illegible]। ستر – লজ্জাস্থান, শরীরের যেই অংশ ঢাকিয়া রাখিতে শরীয়ত [illegible] করিয়াছে। بلكه – বরং। اتفاقا – ঘটনাক্রমে, ঘটনাচক্রে, হঠাৎ। [illegible] شور – হৈ চৈ, শোরগোল, গোলমাল। خاموش – নীরব, নিশ্চুপ। [illegible] সংস্কার, মেরামত। مونڈها – কাঁধ, স্কন্ধ। هرگز – কখনো, [illegible]কালেও, কোন সময়ও। گوارا – পছন্দ, মনোমত, সহনযোগ্য। [illegible] – আলোচনা, উল্লেখ। راهب – খৃষ্ট ধর্মযাজক, সাধু, সন্ন্যাসী। [illegible] – বিলুপ্ত, রহিত। مشوره – পরামর্শ, আলোচনা, উপদেশ। [illegible] – মূর্তি, প্রতিকৃতি, প্রতিমূর্তি। واپس – ফেরৎ, আবার।

সিরিয়ার দ্বিতীয় ছফর

প্রশ্ন ঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবে (কত বয়সে) সিরিয়ার দ্বিতীয় ছফর করেন?

উত্তর ঃ আনুমানিক পঁচিশ বছর বয়সে।

প্রশ্ন ঃ কি উদ্দেশ্যে এই ছফর করেন?

উত্তর ঃ হযরত খাদিজা (রাঃ) নিজের তেজারতী কাফেলার ম্যানেজার বা পরিচালক বানাইয়া পাঠাইয়াছিলেন।

প্রশ্ন ঃ হযরত খাদিজা (রাঃ)কে ছিলেন এবং তিনি কি কারণে রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (নিজের ব্যবসার পরিচালক) নির্বাচন করিলেন?

উত্তর ঃ হযরত খাদিজা (রাঃ) মক্কার একজন ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত মহিলা ছিলেন। আরবের ভিতরে ও বাহিরে তাহার বিরাট ব্যবসা বিস্তৃত ছিল। এদিকে ইতিপূর্বেই তাহার স্বামী ইন্তেকাল করিয়াছিলেন।

(সুতরাং তাহার এই ব্যবসা পরিচালনার জন্য) একজন সৎ, আমানতদার ও বুদ্ধিমান মানুষের প্রয়োজন ছিল। এই সময় তিনি হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু প্রশংসা শুনিতে পাইয়াছিলেন। এই কারণেই তিনি হুজুরকে নিজের ব্যবসার জন্য উত্তম পাত্র মনে করিলেন। সুতরাং তাঁহার জন্য ব্যবসার একটি নির্দিষ্ট লভ্যাংশ নির্ধারণপূর্বক নিজের ব্যবসার জিম্মাদার বানাইয়া সিরিয়ার পথে রওনা করাইয়া দিলেন। হযরত খাদিজা (রাঃ) নিজের খাস গোলাম মাইসারাকেও হুজুরের সঙ্গে দিয়াদিলেন, যেন পথে তাঁহার কোন প্রকার কষ্ট না হয় এবং প্রয়োজনে দেখমত করিতে পারে।

প্রশ্ন ঃ এই ছফরের প্রসিদ্ধ ও বড় ঘটনা কি বল।

উত্তর ঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিরিয়া পৌঁছাইবার পর সেখানে একটি বৃক্ষের নীচে অবস্থান লইলেন (উপবেশন করিলেন)। এই সময় নাছতুরা নামে এক রাহেব (খৃষ্টধর্মের সাধক) তথায় আসিয়া বুহাইরা রাহেবের মতই হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুওয়্যতের সুসংবাদ দিয়া বলিলেন, আমি আপনাকে এই কারণে চিনিতে পারিয়াছি যে, আজ পর্যন্ত এই বৃক্ষের নীচে নবী ব্যতীত অপর কেহই উপবেশন করেন নাই।

প্রশ্ন ঃ এই ছফরে আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আরামের কি ব্যবস্থা করা হইয়াছিল?

উত্তর ঃ হুজুরের সঙ্গী মাইসারা বর্ণনা করেন, দুপুরের গরম ও রোদ যখন উত্যপ্ত হইয়া উঠিত তখন দুইজন ফেরেস্তা আসিয়া তাঁহাকে ছায়া দিত।

প্রশ্ন ঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যবসায় কি সাফল্য অর্জন করিলেন?

উত্তর ঃ তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সহিত স্বল্প সময়ের ভিতর প্রচুর মোনাফায় সমুদয় পণ্য ভালভাবে বিক্রয় করিয়া সিরিয়া হইতে অন্য মাল লইয়া মক্কায় ফিরিয়া আসিলেন। সিরিয়ার মালামাল মক্কায় বিক্রয়ের পর প্রায় দ্বিগুণ লাভ হইল।

প্রশ্ন ঃ রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত কার্যক্রম দ্বারা কি জানা গেল?

উত্তর ঃ ইহা জানা গেল যে, নিজের হাতের শক্তি দ্বারা (অর্থাৎ– নিজ হাতে) কামাই করিয়া জীবন–যাপন করা আবশ্যক এবং ইহা ছাওয়াবের কাজ।

প্রশ্ন ঃ তিনি তাওয়াক্কুল করিলেন না কেন?

উত্তর ঃ আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো তাওয়াক্কুল ত্যাগ করেন নাই। তবে তাওয়াক্কুলের অর্থ ইহা নহে যে, নিজের পরিবার পরিজনের ব্যাপারে উদাসীন ও বে–ফিকির হইয়া হাতের উপর হাত রাখিয়া (অর্থাৎ– নিষ্কর্মা হইয়া) বসিয়া থাকিবে; কিংবা বাপ দাদার বিষয়–সম্পদের উপর ভরসা করিয়া নিজেকে বিকলাঙ্গ বানাইয়া রাখিবে। বরং তাওয়াক্কুলের অর্থ হইল– নিজের উন্নতি ও কামাই–রোজগারের জন্য পরিপূর্ণ চেষ্টা–তদ্বির চালাইয়া যাওয়া। তবে হাঁ, এই কথা বিশ্বাস রাখিবে যে, (সকল চেষ্টা–তদ্বিরের) নতিজা ও ফলাফল আল্লাহ পাকের আয়ত্বে। কখনো এইরূপ অহংকার করিবে না যে, আমি নিজে ইহা করিয়াছি এবং আমার কর্মের এইরূপ ফল হইবে। বরং এইরূপ বিশ্বাস রাখিবে যে, কর্মের ফল ও বিনিময় দেওয়া ইহা একমাত্র

আল্লাহ পাকের কাজ, কিন্তু চেষ্টা করা নিজেদের কাজ। সেই সঙ্গে এই কথাও মনে রাখিবে যে, চেষ্টা–তদ্বিরও কেবল আল্লাহ পাকের সাহায্য দ্বারাই হওয়া সম্ভব।

সারাংশ

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স মোবারক যখন পঁচিশ বছর, তখন তিনি হযরত খাদিজার পক্ষ হইতে তাহার ব্যবসার প্রতিনিধি হইয়া সিরিয়া গমন করেন। সেখানে নাসতুরা নামে এক রাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত হইলে তিনি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুওয়্যতের সুসংবাদ দেন। এই ছফরে গরমের সময় আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে তাঁহাকে বরাবর ছায়া প্রদান করা হইত। সিরিয়া গমনের পর সেখানে অতি অল্প সময়ে ব্যবসার সমুদয় পণ্য বিক্রয় করিয়া তথা হইতে অন্য মাল ক্রয়পূর্বক মক্কায় ফিরিয়া আসেন। পরে মক্কায় সেই মাল বিক্রয় করিলে দ্বিগুণ মোনাফা অর্জিত হয়। হযরত খাদিজার গোলাম মাইসারা এই ছফরে হুজুরের সঙ্গী ছিলেন।

শব্দার্থঃ

سفر – ভ্রমণ, যাত্রা। منیجر– কার্যসম্পাদক, পরিচালক, প্রধান কর্মচারী, ম্যানেজার। دولتمند – বিত্তবান, বিত্তশালী, ধনী। لهذا – সুতরাং, এতএব, এই কারণে। مشهور– প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত, প্রখ্যাত। بشارت – সুসংবাদ। دهوپ – রোদ। فروخت – বিক্রয়। دوگنے – দ্বিগুণ। کارنامه– কার্যক্রম, অস্বাভাবিক কাজ। مزدوری– পারিশ্রমিক, শ্রমের বিনিময়ে কাজ। قوت– শক্তি, বল, সামর্থ্য। بازو– বাহু, হাত, হস্ত। توکل– আল্লাহর উপর ভরসা। مطلب– উদ্দেশ্য, অর্থ, লক্ষ্য, মনোভাব। هاتھ پر هاتھ رکهکر بیٹھ جانا – হাতের উপর হাত

...বসিয়া থাকা (প্রবাদ), নিস্কর্মা, বেকার। اپاهج– পঙ্গু, বিকলাঙ্গ। ... – চেষ্টা, উপায়, তদ্বির। البته– নিঃসন্দেহে, তবে, কিন্তু, হাঁ। ... পরিণামফল, ফল। نتیجه– ফলাফল, পরিণামফল। غرور– ...কার। کئے– কৃতকর্ম। وکیل– প্রতিনিধি, নায়েব, স্থলাভিষিক্ত, ঐ ... যাহার উপর কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, ওকীল।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)—এর বৈবাহিক জীবন

প্রশ্ন ঃ রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম কাহাকে বিবাহ করেন?

উত্তর ঃ বিধবা হযরত খাদিজাকে।

প্রশ্ন ঃ সিরিয়ার ছফর হইতে ফিরিয়া আসার কত দিন পর এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর ঃ দুই মাস পর।

প্রশ্ন ঃ হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স তখন কত ছিল?

উত্তর ঃ পঁচিশ বছর দুই মাস দশ দিন।

প্রশ্ন ঃ হযরত খাদিজার বয়স ছিল কত?

উত্তর ঃ চল্লিশ বছর।

প্রশ্ন ঃ হযরত খাদিজার পিতামাতার নাম এবং তাহার বংশ পরম্পরা কি ছিল?

উত্তর ঃ তাহার পিতার নাম ছিল খোয়াইলেদ এবং মাতার নাম ফাতেমা। বংশ পরম্পরা এইরূপ– দাদার নাম আসাদ, দাদার পিতার নাম আব্দুল উজ্জা, উজ্জার পিতা কুসাই। কুসাই—এর আলোচনা রাসূলে

আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ তালিকায় করা হইয়াছে।

প্রশ্ন ঃ হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ কি ছুরতে হইল বল।

উত্তর ঃ ইসলাম ধর্মে যেমন বিধবাদের দ্বিতীয় বিবাহ কোন দোষণীয় নহে, ঠিক তেমনি আরবে ইসলামপূর্ব যুগেও বিধবাদের বিবাহ হইত।

হযরত খাদিজা (রাঃ) পূর্বেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা শুনিয়াছিলেন। পরে নিজের খাস গোলাম মাইসারার নিকট ছফরের বিস্ময়কর অবস্থা সমূহ জানিবার পর হুজুরের প্রতি তাহার ভক্তি আরো বৃদ্ধি পাইল। হযরত খাদিজার ইহা একীন হইয়া গেল যে, শীঘ্রই হুজুরের কল্যাণ ও সৌভাগ্য পূর্ণিমার রাতের চাঁদ হইয়া স্থায়ীভাবে চমকাইতে থাকিবে। সুতরাং কোন এক মাধ্যম দ্বারা এই বৈবাহিক সূত্রের তৎপরতা শুরু হইল এবং রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রস্তাব মঞ্জুর করিলেন। পরে তাঁহার সকল চাচা এবং অন্যান্য আত্মীয়বর্গের উপস্থিতিতে এক বড় মজলিশে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়।

প্রশ্ন ঃ হযরত খাদিজা (রাঃ) নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেকাহে কত দিন ছিলেন এবং তাঁহার বয়স মোট কত হইয়াছিল?

উত্তর ঃ হযরত খাদিজা (রাঃ) হুজুরের নেকাহে আনুমানিক পঁচিশ বছর পৌনে দশ মাস ছিলেন। চৌদ্দ বছর নবুয়্যতের পূর্বে এবং দশ বছর নবুওয়্যতের পরে। তাহার মোট বয়স হইয়াছিল চৌষট্টী ও পঁয়ষট্টী বছরের মাঝামাঝি।

প্রশ্ন ঃ হযরত খাদিজার জীবদ্দশায় নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কোন বিবাহ করিয়াছিলেন কি?

উত্তর ঃ না, এই সময়ে তাঁহার বিবাহের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তিনি অন্য কোন বিবাহ করেন নাই। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়টি ছিল শুরু বয়সের, আর হযরত খাদিজা (রাঃ) ছিলেন চল্লিশোর্দ্ধ বৃদ্ধা।

প্রশ্ন ঃ হযরত খাদিজার গর্ভে রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়জন সন্তান হইয়াছিল?

উত্তর ঃ দুই ছেলে ও চার মেয়ে।

প্রশ্ন ঃ তাহাদের নাম কি ছিল এবং তাহারা কবে ওফাত প্রাপ্ত হন?

উত্তর ঃ ছেলেদের নাম ছিল কাসেম ও তাহের। হযরত তাহেরের নাম আব্দুল্লাহ বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে। উভয় ছেলেই শৈশবে ইন্তেকাল করেন। কন্যাদের নাম হইল– জয়নব, উম্মে কুলছুম, রোকাইয়া এবং ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু আনহুম আজমায়ীন।

প্রশ্ন ঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যাদের বিবাহ কার কার সঙ্গে হইয়াছিল এবং কন্যাদের মধ্যে কার কার সন্তান হইয়াছিল?

উত্তর ঃ হযরত জয়নবের বিবাহ হইয়াছিল আবুল আস বিন রবী'র সঙ্গে এবং তাহার এক ছেলে ও এক মেয়ে হইয়াছিল। ছেলের নাম ছিল আলী এবং মেয়ের নাম ছিল উমামা। মেয়ে বড় হইলে হযরত ফাতেমার ইন্তেকালের পর খালু হযরত আলীর সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়। কিন্তু তাহার কোন সন্তানাদি হয় নাই।

হযরত উম্মে কুলসুমের বিবাহ হয় হযরত ওসমা (রাঃ)–এর সঙ্গে। পরে হযরত উম্মে কুলসুম ইন্তেকাল করিলে হযরত

রোকাইয়াকেও হযরত ওসমানের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। এই কারণেই হযরত ওসমান (রাঃ)–কে "জিন্নুরাইন" বা দুই নূরের অধিকারী বলা হয়। কিন্তু এই পক্ষেও বংশ জারী হয় নাই।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)–এর বিবাহ হয় হযরত আলী (রাঃ)–এর সঙ্গে এবং তাঁহার সন্তানাদি হইয়া বংশের ছেলছেলা জারী হয়।

প্রশ্ন ঃ হযরত খাদিজা (রাঃ) ব্যতীত অপর কোন স্ত্রীর গর্ভে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সন্তান হইয়াছিল কি?

উত্তর ঃ শুধু হযরত মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে একজন ছেলে হইয়াছিল।

প্রশ্ন ঃ তাহার নাম কি ছিল এবং সে কত বয়স পাইয়াছিল?

উত্তর ঃ তাহার নাম ছিল ইব্রাহীম এবং শৈশবেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

সারাংশ

সিরিয়ার ছফর হইতে প্রত্যাবর্তনের দুই মাস পর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চল্লিশ বছর বয়স্কা বিধবা হযরত খাদিজাকে বিবাহ করেন। তখন রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল পঁচিশ বছর দুই মাস দশ দিন। তাঁহার সঙ্গে বিবাহের পর হযরত খাদিজা (রাঃ) পঁচিশ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁহার গর্ভে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছয় সন্তান জন্মগ্রহণ করেন এবং শুধু হযরত ফাতেমা (রাঃ) হইতেই বংশ পরম্পরা জারী হয়। আর রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সপ্তম সন্তান ইব্রাহীম জন্মগ্রহণ করেন হযরত মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে।

শব্দার্থঃ

ازدواجی – বৈবাহিক, বিবাহ–সম্পর্কিত। بیوہ – বিধবা, যাহার

স্বামী ইন্তেকাল করিয়াছে, স্বামীহীনা। معيوب - দোষণীয়, মন্দ, ত্রুটিপূর্ণ, কুৎসিত। اعتقاد- বিশ্বাস, প্রত্যয়, আস্থা। اقبال- সৌভাগ্য, কৃতকার্যতা। همايون - ভাগ্যবান, মঙ্গলজনক। جنبانی - স্পন্ধন, কম্পন, হরকত (এখানে তৎপরতা)। مجمع - লোকসমাগম, সভা, সমাবেশ, সমাগম। بوڑھی- বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া। فرزند - ছেলে, পুত্র। صاحب زاده- ছেলে, পুত্র (সম্মানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত)। صاحب زادی- মেয়ে, কন্যা (সম্মানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত)। بچپن - শৈশব। ذی النورین - দুই নূর বিশিষ্ট। ساتوی - সপ্তম। بطن - পেট, উদর (এখানে গর্ভ)।

নবী করীম (সঃ)—এর চরিত্র ও সুসম্পর্ক

প্রশ্ন ঃ নবুওয়্যতের পূর্বে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিত্রিক অবস্থা এবং জীবিকা উপার্জনের কি উপায় ছিল?

উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোটা জীবনটাই উন্নত চরিত্রের ভাণ্ডার ছিল। সততা বিশ্বস্ততা, অনুকম্পা, দানশীলতা, আনুগত্য, ওয়াদা রক্ষা, বড়দের প্রতি সম্মান ও ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন, আত্মীয়দের প্রতি ভালবাসা, স্বজনদের প্রতি সহানুভূতি, প্রিয়জনদের প্রতি সমবেদনা, আল্লাহর মাখলুকদের কল্যাণ কামনা- মোটকথা, সমস্ত ভাল কাজে রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঐ মরতবা দান করা হইয়াছিল যাহার ধারেকাছে যাওয়াও অপর কাহারো পক্ষে সম্ভব নহে।

তাঁহার উত্তম চরিত্রের এমনই প্রভাব ছিল যে, লোকেরা আদবের কারণেই তাঁহার নাম উচ্চারণ করিত না। "ছাদেক" ও

"আমীন" তাঁহার পদবী নির্ধারণ করা হইয়াছিল। স্বভাবে গাম্ভীর্যতা, কম কথা বলা, অর্থহীন কথাবার্তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করা, মানুষের সঙ্গে হাসিখুশি ও প্রফুল্ল মুখে মেলামেশা করা এবং সরল স্বাভাবিক ও পরিচ্ছন্ন কথাবার্তা বলা তাঁহার অন্যতম স্বভাব ছিল।

আল্লাহ পাক নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শৈশব হইতেই এমনসব মন্দ কাজ হইতে হেফাজত করিয়াছিলেন যাহা সেই যুগে সাধারণ রেওয়াজে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। লোভ-লালসা, ধোঁকা, প্রতারণা, মিথ্যা, মদ, ব্যভিচার, নাচ-গান, চুরি-ডাকাতি, প্রতিমাপূজা, মূর্তির নামে উৎসর্গকৃত দ্রব্য খাওয়া কিংবা উহাদের নামে কিছু উৎসর্গ করা, কবিতা আবৃত্তি, প্রেম করা- ইত্যাদি অপকর্ম সমূহ যেন সেই যুগের প্রতিটি শিশুর জন্মগত স্বভাব ছিল। কিন্তু রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তা এই সকল বিষয় হইতে সম্পূর্ণ পাক-ছাফ ছিল। এই কারণেই তাঁহাকে মাছুম (নিষ্পাপ) বলা হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হইল, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না কোন কিতাব পাঠ করিয়াছেন, না কাহারো মুরীদ হইয়াছেন, আর না কাহারো নিকট নিয়মিত শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রের যাবতীয় সৌন্দর্য ছিল আল্লাহ প্রদত্ত।

আমাদের নেতা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা হস্তশক্তি দ্বারা (অর্থাৎ- নিজ হাতে) উপার্জন করিয়া জীবন যাপন করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল। হযরত খাদিজা (রাঃ) সেই সমুদয় সম্পদ ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যে নিঃশেষ করিয়া দিয়াছেন। অথচ

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো নিজের খরচপত্রে স্ত্রীর অনুগ্রহ মাথা পাতিয়া লন নাই। লাকড়ি সংগ্রহ করিয়া, কোদাল চালাইয়া এবং বকরী চরাইয়া কালযাপন করা তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল, কিন্তু অপরের অনুগ্রহ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে ছিল কঠিন।

আল্লাহ না করুণ– রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি কোন সময় স্ত্রীর সম্পদ হইতে খরচ করিতেন, তবে কোরাইশরা গোটা আকাশ মাথায় তুলিয়া লইত (অর্থাৎ– হৈ চৈ বাঁধাইয়া দিত)। তাহারা তো সর্বদা ইহাই সন্ধান করিয়া ফিরিত যে, আল্লাহর রাসূলের নামে দুর্ণাম রটাইবার কোন বস্তু যেন তাহাদের হস্তগত হয়। স্ত্রীর সম্পদ খরচ করা আরবে বড় দোষণীয় মনে করা হইত।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা আল্লাহর সৃষ্টির মঙ্গল কামনা, জাতির খেদমত এবং তাহাদের কল্যানের ফিকির করিতেন। অধিকাংশ সময় তিনি সমসাময়িক কালের মানুষের হালাতের উপর চিন্তা–ফিকির করিতেন। তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী সেই জমানাতেই একটি সংগঠন কায়েম করা হইয়াছিল। ঐ সংগঠনে বনু হাশেম, বুন আব্দুল মোত্তালেব, বনু আসাদ, বনু জোহরা এবং বনু তামীম অংশগ্রহণ করিয়াছিল। সংগঠনের সদস্যগণ পরস্পর এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিল–

আমরা দেশ হইতে অশান্তি দূর করিব। মুছাফিরদিগকে হেফাজত করিব এবং দরিদ্রদিগকে সাহায্য করিব। আমরা বড়দিগকে ছোটদের উপর জুলুম করা হইতে বাধা প্রদান করিব।

প্রশ্ন ঃ রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কোরাইশদের আস্থা ও সম্পর্ক কেমন ছিল?

উত্তর ঃ রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কোরাইশদের এমন আস্থা ও ভরসা ছিল যে, নবুওয়্যত লাভের পর যখন মক্কার কাফেরগণ তাঁহার প্রাণের শত্রু হইয়া গেল, তখনো তাহারা নিজেদের আমানত সমূহ হুজুরের নিকট রাখিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিত।

একটি আশ্চর্য ঘটনাঃ এই ঘটনা দ্বারাই অনুমান করা যাইবে যে, কোরাইশদের সঙ্গে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতটুকু সুসম্পর্ক ছিল। ঘটনাটি এই–

মক্কায় একবার বন্যা হইলে খানায়ে কা'বা ধ্বসিয়া গেল। পরে কোরাইশ গোত্রের লোকেরা পুনরায় উহা নির্মাণ করার ইচ্ছা করিল। যেহেতু (খানায়ে কা'বা নির্মাণকাজে অংশগ্রহনের) বিষয়টির সহিত সুনাম–সুখ্যাতি জড়িত ছিল এই কারণেই সকল গোত্রের লোকেরা উহাতে অংশ গ্রহণ করিল। হজরে আসওয়াদ স্থাপনের বিষয়টিকে বড় সম্মানের কাজ মনে করা হইত। সুতরাং যখন উহা দেয়ালে স্থাপনের পর্যায় আসিল তখন সকল গোত্রের লোকেরাই দাবী করিতে লাগিল যে, এই সম্মান আমাদের প্রাপ্য, আমরাই উহার যোগ্য।

পরে বিষয়টি এমন প্রলম্বিত হইল যে, নিয়মিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি শুরু হইয়া গেল। কোরাইশ গোত্রের সৎ ও সাঞ্জিদাহ লোকেরা (বিশেষতঃ আবু উমাইয়া ইবনে মুগীরাহ যিনি সবচাইতে বয়োবৃদ্ধ ছিলেন) চেষ্টা করিলেন, যেন বিষয়টি ভালয়–ভালয় মীমাংসা হইয়া যায় এবং আপসে খুনাখুনির মত পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়। সুতরাং পরামর্শের জন্য খানায়ে কা'বার চত্বরে (বর্তমান যাহাকে মসজিদে হারাম বলা হয়) জড়ো হইয়া চিন্তা–ভাবনার

পর এই সিদ্ধান্ত হইল যে, (আগামীকাল সকালে) যেই ব্যক্তি সর্বপ্রথম মসজিদের এই দরজা দিয়া প্রবেশ করিবে সেই ব্যক্তি এই বিষয়ে ফায়সালা করিবে।

ঘটনাক্রমে (পরদিন) সকলের দৃষ্টি যাহার উপর পতিত হইল, উহা ছিল সারওয়ারে আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরাণী চেহারা। সকলে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল, ইনি বিশ্বাসী, সত্যবাদী এবং আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁহার আগমন শুভ হউক, তিনিই উত্তম ফায়সালা করিতে পারিবেন।

অবশেষে এইরূপই হইল। বিষয়টি তাঁহার সম্মুখে পেশ করা হইলে তিনি একটি চাদর বিছাইয়া নিজ হাতে হজরে আসওয়াদ আনিয়া উহাতে রাখিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, এইবার সকল গোত্রের নির্বাচিত ব্যক্তিগণ চাদরের প্রান্ত ধরিয়া উহা উত্তোলন করুন। পরে উহা ভিত্তি পর্যন্ত উঠানো হইলে তিনি স্বীয় হস্ত মোবারক দ্বারা পাথরটি তুলিয়া দেয়ালে স্থাপন করিয়া দিলেন।

প্রশ্ন ঃ এই ঘটনার সময় নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স কত ছিল?

উত্তর ঃ পঁয়ত্রিশ বছর।

শব্দার্থঃ

كيفيت - অবস্থা, গুণ। كسب معاش - জীবিকা উপার্জন। خزانه - ভাণ্ডার, ধনাগার, কোষাগার। ديانتدارى - ঈমানদারী, সততা। سخاوت - দানশীলতা। شفقت - স্নেহ, মোহাব্বত, দয়া। همدردى - সহানুভূতি। غمخوارى - সমবেদনা, সহানুভূতিশীলতা। خيرخواهى - কল্যাণ কামনা, মঙ্গল কামনা। گرد - আশপাশ, চারিপাশ। باعث - কারণ, ভিত্তি। صادق - সত্যবাদী, অকপট। امين - বিশ্বাসী। نفرت - ঘৃণা, বিমুখতা।

خنده پیشانی - উৎফুল্ল চেহারা, প্রফুল্য মুখ। سادگی - সরলতা, অনাড়ম্বর। صفائی - পরিচ্ছন্নতা, পরিষ্কার, মীমাংসা। شیوه - অভ্যাস, স্বভাব, চালচলন, নীতি। محفوظ - যাহা হেফাজত করা হইয়াছে, সংরক্ষিত, নিরাপদ। رواج - সাধারণ নিয়ম, প্রচলিত রীতিনীতি, রেওয়াজ। لوٹ - লুণ্ঠন, ডাকাতি। معصوم - নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, যাহার পাপ নাই। لطف - মজা, স্বাদ, শোভা, করুণা, (এখানে মজার ব্যাপার)। مرید - শিষ্য, অনুসারী, মুরীদ। آقا - মালিক, মনিব, স্বামী, কর্তা, (এখানে নেতা)। اهلیه - স্ত্রী, পত্নী। صرف - খরচ, মূল্য। عیب - দোষ, ত্রুটি, অন্যায়, পাপ, কলঙ্ক। انجمن - সংস্থা, সংগঠন, আসর। بموجب - অনুযায়ী, এই কারণে, এই মত। معاهده - অঙ্গীকার, চুক্তি, সন্ধি। بے امنی - অশান্তি, নিরাপত্তাহীনতা। مسافر - পথিক, পথচারী, ভ্রমণকারী, পর্যটক, মুসাফির। امداد - সাহায্য, দান, সহায়তা। اعتبار - আস্থা, বিশ্বাস, নিশ্চয়তা। مطمئن - নিশ্চিন্ত, শান্ত, নিরাপদ। سیلاب - বন্যা, প্লাবন, স্রোত। تعمیر - নির্মাণ, সংস্কার, গঠন। ناموری - প্রসিদ্ধি, সুনাম, সুখ্যাতি। نوبت - পর্যায়, কাল, সুযোগ, উপলক্ষ। حجر اسود - কৃষ্ণপাথর। مستحق - যোগ্য, উপযুক্ত, দাবীদার। جنگ - লড়াই, যুদ্ধ, সংঘাত, সংঘর্ষ। آمادگی - প্রস্তুতি, তৈরি, সন্তুষ্টি। طے - ফায়সালা, সিদ্ধান্ত, মীমাংসা। احاطه - বেড়া, ঘেড়াও, সীমান্ত, আঙ্গিনা, কম্পাউণ্ড। سرور - প্রধান, সেরা, দলপতি। عالم - পৃথিবী, দুনিয়া, জাহান, বিশ্ব। نصب - স্থাপন করা, রোপন করা, দণ্ডায়মান করা, প্রতিষ্ঠিত করা।

রেসালাত, নবুওয়্যত, রাসূলের সংজ্ঞা এবং উহার প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন ঃ রেসালাত ও নবুয়্যতের অর্থ কি?

উত্তর ঃ রেসালাত অর্থ রাসূল হওয়া এবং নবুয়্যত অর্থ নবী হওয়া।

প্রশ্ন ঃ রাসূল বা নবী কাহাকে বলা হয়?

উত্তর ঃ নবী-রাসূলগণ আল্লাহর বান্দা এবং মানুষ। আল্লাহ পাক নিজের আহকাম বান্দাদের নিকট পৌঁছাইবার জন্য তাঁহাদিগকে নির্ধারণ করেন। তাঁহারা সত্যবাদী হন, কখনো মিথ্যা কথা বলেন না এবং যাবতীয় গোনাহ হইতে পবিত্র থাকেন। আল্লাহ পাকের হুকুমে তাঁহারা অলৌকিক ঘটনা সমূহ প্রদর্শন করেন। নবী-রাসূলগণ আল্লাহ পাকের বিধান (বান্দাদের নিকট) পরিপূর্ণভাবে পৌঁছাইয়া দেন এবং কখনো উহাতে কম-বেশী করেন না।

প্রশ্ন ঃ নবী ও রাসূলের মধ্যে কি পার্থক্য?

উত্তর ঃ নবী ও রাসূলের মধ্যে সামান্য পার্থক্য হইল, রাসূল ঐ পয়গম্বরকে বলা হয় যাহাকে নূতন শরীয়ত ও কিতাব প্রদান করা হইয়াছে। আর নবী বলা হয় এমন পয়গম্বরকে যাহাকে নূতন শরীয়ত দেওয়া হইয়াছে এবং এমন পয়গম্বরকেও বলা হয় যাহাকে নূতন শরীয়ত ও কিতাব প্রদান করা হয় নাই; বরং তিনি পূর্ববর্তী কিতাবেরই অনুগত।

প্রশ্ন ঃ মানুষ নিজের চেষ্টা ও এবাদতের মাধ্যমে নবী হইতে পারে কি?

উত্তর ঃ না, আল্লাহ পাক যাহাকে বানান কেবল সেই ব্যক্তিই নবী ও রাসূল হইতে পারেন। অর্থাৎ নবী-রাসূল হওয়ার ব্যাপারে মানুষের

চেষ্টার কোন দখল নাই। আল্লাহ পাক যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকেই এই মরতবা দান করেন।

প্রশ্ন ঃ নবী–রাসূলগণের সংখ্যা কত এবং তাঁহাদের মধ্যে সবচাইতে উত্তম রাসূল কে?

উত্তর ঃ দুনিয়াতে বহু নবী–রাসূল আগমন করিয়াছেন। তাঁহাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ পাকেরই জানা আছে। আমাদের কর্তব্য হইল– আল্লাহ পাক যত নবী–রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকে হক ও সত্য মনে করা। তবে আমাদের পয়গম্বর হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল নবী–রাসূলগণের মধ্যে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। তিনিও আল্লাহ পাকের বান্দা এবং তাঁহার অনুগত। তবে আল্লাহর পরে তাঁহার মরতবা সকলের তুলনায় শ্রেষ্ঠ।

প্রশ্ন ঃ নবী–রাসূলগণ (দুনিয়াতে) কেন আগমন করেন?

উত্তর ঃ নিয়ম হইল– কোন মানুষ কাহারো ইচ্ছা ও মর্জি ততক্ষণ পর্যন্ত জানিতে পারিবে না যতক্ষণ না সে নিজে উহা বলিবে কিংবা তাহার নিয়ম–তরীকা ও স্বভাব সম্পর্কে অবগত হওয়া যাইবে। মানুষ আল্লাহর বান্দা, আল্লাহ তাহাকে সৃষ্টি করিয়া হুশ–জ্ঞান দান করিয়াছেন, তিনিই তাহাকে রিজিক দান করেন এবং তাহার সকল জরুরত পূরণ করেন। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হইল সে যেন আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জির অনুগত থাকে। কিন্তু মানুষের এমন জ্ঞান নাই যে, সে আল্লাহর ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত হইবে। না তাহার চক্ষুতে এমন শক্তি আছে যাহা দ্বারা সে আল্লাহর নূর দেখিতে পাইবে, না তাঁহার তাজাল্লীর দীপ্তি সহ্য করিতে পারিবে, আর না তাহার কানে এমন শক্তি আছে যাহা দ্বারা সে আল্লাহ পাকের ঐ

কালাম শুনিতে পারিবে যাহা সকল মানবীয় সম্পর্কের উর্ধ্বে ও পবিত্র।

মানবীয় জ্ঞানের দৈন্যদশার এমন অবস্থা যে, মানুষ খোদ নিজের খবরই বলিতে পারে না যে, তাহার পরিচয় কি? মানুষ ইহা তো জানে যে, তাহার মধ্যে একটি প্রাণ আছে; কিন্তু আজ পর্যন্ত সে ইহা জানিতে পারে নাই যে, এই প্রানের হাকীকত ও রহস্য কি? আগামী কল্য কি হইবে এই বিষয়েও তাহার কিছুমাত্র খবর নাই। আগামীকাল তো দূরের কথা, সে এই কথাও বলিতে পারে না যে, এই সেকেণ্ডের পরবর্তী সেকেণ্ডে কি হইবে।

আকলের এই দীনতা ও দুর্বলতার কারণেই মানুষ অনেক সময় মন্দ বস্তুকে ভাল মনে করিয়া সরল পথ হইতে সরিয়া যায়। আবার কখনো শয়তানী কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া বরবাদ হইতে থাকে। এই অবস্থা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এমনই পরিণতি সৃষ্টি হয় যে, সমগ্র পৃথিবীতে জুলুম ও অপরাধ ছড়াইয়া পড়ে এবং এই সময় আল্লাহর শিক্ষা ভুলাইয়া দেওয়া হয়।

মোটকথা, চতুর্দিকে গোমরাহী ছড়াইয়া পড়ে, জুলুম ও ফাসাদের অন্ধকার সকল দিক বেষ্টন করিয়া লয় এবং আদম সন্তানগণ ধ্বংস ও বরবাদ হইতে থাকে। এই সময় আল্লাহর রহমত মানুষকে সাহায্য করে এবং তিনি এমন এক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করেন যাহাকে শৈশব হইতেই সকল গোনাহ্ হইতে রক্ষা করা হয়। তাঁহার দামানকে (আঁচলকে) গোনাহের যাবতীয় আবর্জনা হইতে পবিত্র রাখা হয় এবং ক্রমে তাহাকে এমন শক্তি প্রদান করা হয়, যেন তিনি আল্লাহর পয়গাম শ্রবণ করিতে পারেন, তাঁহার কালাম বুঝিয়া উহা মানুষের নিকট পৌঁছাইতে পারেন,

উহার ফলে যেন আল্লাহর মাখলুক আল্লাহর আজাব হইতে রক্ষা পায় এবং দ্বীন-দুনিয়ার উন্নতি ও মঙ্গল হাসিল করিতে পারে।

প্রশ্ন ঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (দুনিয়াতে) আগমন করেন তখন আরবদের ধর্ম কি ছিল এবং গোটা পৃথিবীর ধর্মীয় অবস্থা কেমন ছিল?

উত্তর ঃ সেই যুগের আরব বিশেষ কোন ধর্মের অনুসারী ছিল না; বরং নাস্তিক্যবাদ, খৃষ্টবাদ, ইহুদীবাদ এবং শির্ক- ইত্যাদি মিথ্যা ধর্ম সমূহ আরবের সাধারণ নীতিতে পরিণত হইয়াছিল। প্রতিমাপূজা ও মূর্তিপূজা এমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, কুদরতের (আল্লাহ পাকের) যে কোন আশ্চর্য বস্তুকে পূজা করা হইত। এক আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া অসংখ্য আল্লাহ বানাইয়া রাখার মত চরম অবস্থা সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। মিষ্টির মূর্তি (খোদা) বানাইয়া উহাকে পূজা করিবার পর সেই খোদাকে ভাঙ্গিয়া খাইয়া ফেলিত।

অন্যায় প্রবণতা এই পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, মনে চাহিলে সৎ মাতাকে পর্যন্ত স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়া লইত। মানুষের মন এমন পাষাণ হইয়া গিয়াছিল যে, যখন মনে চাইত সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া মানুষকে প্রাণে মারিয়া ফেলিত। কচি শিশুদিগকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতিয়া রাখা হইত। খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর বেটা (পুত্র) মনে করিত। ইহুদীদের মধ্যে ঘুষ, সুদ, জুলুম এবং লোভ-লালসা ছিল ব্যাপক। তাহারা হযরত উজাইর (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র এবং নিজদিগকে আল্লাহর সন্তান বলিত। তাহারা একেবারেই নিকৃষ্ট কাজ করিত আর ধারণা করিত- বেহেস্ত আমাদের। কেননা, আমরা আল্লাহর প্রিয় এবং তাঁহার আদরের পাত্র (আল্লাহ ক্ষমা করুন)।

ভারতে কোটি কোটি মূর্তির পূজা করা হইত। কেমন লজ্জার কথা যে, দেহের অপবিত্র অঙ্গেরও পূজা করা হইত। প্রতিটি শহরে পৃথক পৃথক হুকুমত কায়েম ছিল। ডাকাতি, মারামারি ও ঝগড়া–ফাসাদ ছিল ব্যাপক। ইউরূপে গৃহযুদ্ধ এবং প্রতিমাপূজার রাজত্ব ছিল।

মোটকথা, সারা পৃথিবীরই এইরূপ অবস্থা ছিল। গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকার ঘনঘটা সমগ্র পৃথিবীতে ছাইয়া গিয়াছিল। পৃথিবীর জন্য তখন এমন একজন সত্য পথপ্রদর্শক আবশ্যক ছিল, যেমন পানিহীন মৎস্যের (জীবন ধারণের) জন্য পানি আবশ্যক। (আল্লাহ ভাল জানেন।)

শব্দার্থঃ

تعريف – সংজ্ঞা, বর্ণনা, লক্ষণ, প্রশংসা, (এখানে সংজ্ঞা)। لازم – ...শ্যক, অবশ্য কর্তব্য, প্রয়োজনীয়, জরুরী, সংযুক্ত। مرضى – ইচ্ছা, ... অনুমতি, খুশী। تاب – ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি, তাপ, জ্বলন্ত, শক্তি। ... – রহস্য, ভেদ, মূল–তত্ত্ব, সত্য, যথার্থতা, বাস্তবতা, হাকীকত ... পথভ্রষ্টতা। مختصر – সংক্ষিপ্ত, সংক্ষেপ। دامن – জামার ঝুল, ... আঁচল, অঞ্চল, (শব্দটি বাক্যে যেইভাবে ব্যবহার হইয়াছে বাংলায় ... ব্যবহার বিরল)। رفته رفته – ক্রমে, ধীরে ধীরে। پيغام – ... বার্তা, বিবাহের প্রস্তাব, সংবাদ। ننهى ننهى – কচি শিশু। ... প্রিয়, আদরণীয়।

হুজুর (সঃ)–কে নবী বানানো

প্রশ্ন ঃ বাতেনীভাবে তো (অদৃশ্য ব্যবস্থাপনায় তো) রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সকল নবীগণের পূর্বেই

নবুওয়্যত দান করা হইয়াছিল, কিন্তু জাহেরীভাবে তাঁহাকে কবে নবুওয়্যত দান করা হয়?

উত্তর ঃ তাঁহার বয়স যখন চান্দ্র মাসের হিসাবে চল্লিশ বছর একদিন হয়।

প্রশ্ন ঃ সেই দিবস ও তারিখ কি ছিল?

উত্তর ঃ সোমবার (এবং ইহা নিশ্চিত যে,) ৯ই রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১২ই ফেব্রুয়ারী ৬১০ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন ঃ রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন কোথায় ছিলেন?

উত্তর ঃ মক্কা শরীফের নিকটবর্তী হেরা পাহাড়ের গুহায়, যাহাকে "হেরা গুহা" বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কারণে সেখানে তাশরীফ লইয়া গিয়াছিলেন?

উত্তর ঃ রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাকীত্ব পছন্দ করিতেন। তাঁহার নিয়ম ছিল, কিছু দিনের জন্য হেরা গুহায় গিয়া একাকী আল্লাহ পাকের এবাদত করিতেন এবং রাতদিন সেখানেই পড়িয়া থাকিতেন। অনেক সময় এমনও হইত, যেই খাবার তিনি সঙ্গে লইয়া যাইতেন উহা এত দিনের জন্য যথেষ্ট হইত না, তখন তাঁহার সহানুভূতিশীলা স্ত্রী হযরত খাদিজা (রাঃ) সুযোগ মত নিজেই তাঁহার খাবার পৌঁছাইয়া দিতেন।

প্রশ্ন ঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ ধর্ম অনুযায়ী এবাদত করিতেন?

উত্তর ঃ ইহাই প্রসিদ্ধ যে, তিনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্ম অনুযায়ী এবাদত করিতেন।

প্রশ্ন : রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়্যতের কিছু দিন পূর্বে কি দেখিতে পাইলেন?

উত্তর : তাঁহাকে একটি নূর দেখানো হইত। ছয় মাস পূর্ব হইতেই তিনি এমন বহু সত্য স্বপ্ন দেখিতেন যেইগুলির তা'বীর ও ব্যাখ্যা প্রভাতের সূর্য উদয়ের মতই সুস্পষ্ট ও সত্য হইত।

প্রশ্ন : রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেমন করিয়া নবুওয়্যত দান করা হয়?

উত্তর : নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, হযরত জিব্রাইল (আঃ) হেরা গুহায় আসিয়া আমাকে বলিলেন, পড়ুন। আমি বলিলাম, আমি পড়িতে জানি না। জিব্রাইল (আঃ) আমাকে নিজের বক্ষে এমন সজোরে জড়াইয়া ধরিলেন, যেন আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইল। পরে আমাকে ছাড়িয়া দিয়া আবার বলিলেন, পড়ুন। আমার জবাব আগের মতই ছিল যে, আমি পড়িতে জানি না। জিব্রাইল (আঃ) পুনরায় এইরূপ করিলেন। অতঃপর তৃতীয়বার আগের মতই সজোরে বক্ষে ধারণ করিবার পর আমাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, পড়ুন। তখন আমি বলিলাম, কি পড়িব? এইবার তিনি কয়েকটি আয়াত পাঠ করিলেন–

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ হইতে عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত।

সারাংশ

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের একচল্লিশতম ... ৯ই রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১২ই ফেব্রুয়ারী ৬১০ খৃষ্টাব্দ ... হেরা পর্বতের এক গুহায় তাঁহাকে নবুওয়্যতের আজমতপূর্ণ ... প্রদান করা হয়। সেই সময় তাঁহার বয়স ছিল চল্লিশ বছর একদিন।

শব্দার্থঃ

باطنی - গোপনীয়, আধ্যাত্মিক, আভ্যন্তরিণ, যাহা দৃশ্যমান নহে এইরূপ, জাহেরীর বিপরীত। ظاهری- প্রকাশ্য, স্পষ্টতঃ বাহ্যতঃ যাহা দৃশ্যমান এইরূপ। تنهائی - একাকীত্ব, নির্জনতা, বিজনতা। مدت - সময়, সময়ের দৈর্ঘ, অবকাশ, দীর্ঘকাল। موافق- অনুযায়ী, অনুরূপ, উপযোগী, অনুকুল, উপযুক্ত। همراه- সঙ্গে, সঙ্গী, সাথে, সাথী, যে সঙ্গে গমন করে, পথের সাথী। پیشتر - পূর্বে, আগে। آغوش - কোল, বক্ষ, বাহুবন্ধন, আলিঙ্গন। باعظمت - আজমতপূর্ণ, সম্মানজনক। خلعت - এমন পোশাক যাহা রাজা বা মান্যবর ব্যক্তি কর্তৃক উপহার দেওয়া হয়, উপহার, উত্তম দানবিশেষ।

তাবলীগ এবং ইসলামের দাওয়াত

প্রশ্ন ঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাথমিক অবস্থায় কেমন করিয়া মুসলমান বানাইতে শুরু করিলেন?

উত্তর ঃ যাহাদের মধ্যে (ইসলাম কবুল করার) যোগ্যতা দেখিতে পাইতেন তাহাদিগকে গোপনে সমমনা বানাইয়া মুসলমান হওয়ার জন্য উৎসাহিত করিতেন।

প্রশ্ন ঃ সর্বপ্রথম কাহারা মুসলমান হইলেন?

উত্তর ঃ আজাদ পুরুষদের মধ্যে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণোৎসর্গী বন্ধু হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ), আজাদ মহিলাদের মধ্যে বিশ্ব সম্রাটের পবিত্র সম্রাজ্ঞী হযরত খাদিজাতুল কোবরা (রাঃ) , আজাদ ছেলেদের মধ্যে হুজুরের চাচাতো ভাই হযরত আলী (রাঃ), গোলামদের মধ্যে হুজুরের আজাদকৃত গোলাম হযরত জায়েদ বিন হারেছাহ্ এবং দাসীদের

মধ্যে রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজাদকৃত দাসী উম্মে য়ামন সর্বপ্রথম মুসলমান হন।

প্রশ্ন ঃ সর্বপ্রথম ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও ঘরের খাস মানুষদের ইসলাম গ্রহণ দ্বারা কি প্রমাণিত হয়?

উত্তর ঃ উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গ ইসলামের প্রথম আওয়াজেই সর্বপ্রথম ঈমান আনা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতা এবং উত্তম পবিত্রতারই প্রকৃষ্ট প্রমান। কেননা, এই সকল ব্যক্তিবর্গ তাঁহার চল্লিশ বছরের জীবনের খুঁটিনাটি অবস্থা সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবগত ছিলেন এবং শৈশব হইতেই হুজুরের খোদাভক্তিসুলভ আচার আচরণ দেখিয়া আসিতেছিলেন।

প্রশ্ন ঃ এই সকল লোকেরা শুধু অজিফা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন, না অন্য কোন কাজও করিতেন?

উত্তর ঃ তাঁহারা মুসলমান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে নিজেদের মতামত প্রচার শুরু করিলেন। সুতরাং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই হযরত বিলাল (রাঃ), [১] আমর ইবনে আম্বাছাহ্, হযরত খালেদ [২] প্রমুখ ইসলামের অনুগত হইয়া গেলেন। পরে হযরত আবু বকর

টীকা

১। এখানে স্মরণ রাখিবার বিষয় হইল, উর্দূতে ওমর (عمر) লিখিবার পর শেষে যদি ওয়াও (و) লেখা হয় যেমন- عمرو তবে উহাকে "আমর" পড়িতে [illegible]। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে শেষের ওয়াও উচ্চারণ হইবে না। আর শেষে যদি [illegible] না থাকে যেমন- عمر তবে উহাকে "ওমর" পড়িতে হইবে।

২। ইনি ইসলামী ইতিহাসের প্রসিদ্ধ খালেদ (খালেদ বিন ওলীদ) নহেন। ইনি [illegible] খালেদ। এই খালেদের পিতার নাম ছাআদ বিন আস।

ছিদ্দিক (রাঃ)-এর তাবলীগের ফলে অল্প কিছু দিন পর হযরত ওসমানগণী (রাঃ), হযরত জোবায়ের (রাঃ), হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), হযরত ছায়াদ ইবনে ওয়াক্কাস (রাঃ), হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ (রাঃ), হযরত আব্দুল আসাদ বিন হেলাল (রাঃ), হযরত ওসমান ইবনে মাজউন (রাঃ) এবং হযরত আমের বিন ফুহাইরাহ-এর মত মান্যবর ব্যক্তিগণ মুসলমান হইয়া গেলেন। তাহাদিগকে যদি ইসলামের শিকড় বলা হয় তবে যথার্থ বলা হইবে।

এমনিভাবে মহিলাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচী অর্থাৎ হযরত আব্বাসের (রাঃ) স্ত্রী হযরত উম্মুল ফজল, হযরত আসমা বিনতে উমাইস্‌, হযরত আসমা বিনতে আবী বকর এবং হযরত ওমরের ভগ্নি ফাতেমা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ঃ এইভাবে গোপনে গোপনে ইসলাম প্রচার এবং হযরত আবু বকর ছিদ্দিকসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের তাবলীগী মেহনত দ্বারা তোমরা কি বুঝিতেছ?

উত্তর ঃ ইহা জানা গেল যে, তলোয়ারের জোরে ইসলাম প্রচার হয় নাই; বরং সততা, নৈতিকতা এবং ঈমানদারীর প্রভাবেই ইসলাম প্রচারিত হইয়াছে। অন্যথায় এক দুইজন মানুষের এমন কি হিম্মত ছিল যে, অন্যান্য মানুষকে জবরদস্তী ইসলাম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিবে, বিশেষতঃ উহা এমন সময়ে যখন গোটা পৃথিবী তাহাদের দুশমন ছিল?

এমন বিপদের সময়ও হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) এবং অপরাপর ব্যক্তিবর্গের মেহনত করা দ্বারা ইহা জানা যায় যে

মুসলমানদের প্রথম কর্তব্য হইল, সকল বালা–মুসীবত উপেক্ষা করিয়া ইসলামের উন্নতির জন্য হামেশা প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকা।

প্রশ্ন ঃ কতদিন পর্যন্ত ইসলাম গোপনে প্রচার হইতেছিল?

উত্তর ঃ আনুমানিক তিন বছর পর্যন্ত।

প্রশ্ন ঃ এই সময়ের মধ্যে কতজন মুসলমান হইয়াছেন?

উত্তর ঃ আনুমানিক ত্রিশজন।

প্রশ্ন ঃ সেই সময় মুসলমানগণ কোথায় অবস্থান করিতেন?

উত্তর ঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার এক প্রান্তে একটি ঘরের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। সাধারণতঃ মুসলমানগণ সেখানে থাকিয়াই এবাদত করিতেন এবং রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে গিয়া তাহাদিগকে ইসলামের তা'লীম দ্বারা সৌভাগ্যবান করিতেন।

সারাংশ

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুরু অবস্থায় গোপনে মুসলমান বানাইতে শুরু করিলেন। আনুমানিক তিন বছর এইভাবে ইসলামের তাবলীগ চলিল। যেই সকল ব্যক্তি মুসলমান হইলেন তাহারা নিজেদের দায়িত্ব অনুধাবন করিতে পারিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের মধ্যেও তাবলীগ শুরু করিয়া দিলেন।

এইভাবে ধীর ধীরে তিন বছরের মধ্যে প্রায় ত্রিশজন মুসলমান হইলেন। ইহারাই ঐ সকল ব্যক্তি যাহাদের দ্বারা ইসলামের শিকড় মজবুত হইয়াছিল। এইভাবে তাহাদের ইসলাম গ্রহণই উজ্জ্বল প্রমাণ যে, ইসলাম তলোয়ারের জোরে বিস্তার লাভ করে নাই; বরং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক

শক্তিই মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। সেই যুগে মুসলমানদের এমন সাহস ছিল না যে, প্রকাশ্যে ইসলামের বিধান অনুযায়ী এবাদত করিবে। ফলে লুকাইয়া লুকাইয়া শরীয়তের বিধানের উপর আমল করা হইত।

শব্দার্থঃ

تبليغ - প্রচার, ইসলাম প্রচার। دعوت - আহবান, আমন্ত্রণ, দ্বীনের প্রতি মানুষকে আহবান করা, ভোজ, আহারের নিমন্ত্রণ। صلاحيت - গ্রহণসামর্থ্য, যোগ্যতা, কর্ম-দক্ষতা। قابليت - যোগ্যতা, দক্ষতা, উপযুক্ততা, কার্যক্ষমতা। قريب - নিকটবর্তী। قوى - শক্তিশালী, মজবুত, বলবান, তেজস্বী, (এখানে প্রকৃষ্ট)। دليل - প্রমাণ, যুক্তি, কারণ, দলীল। ذرا ذرا - অল্প অল্প, সামান্য, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। وظيفه - বৃত্তি, পেন্সন, বেতন, জনকল্যাণে দানকৃত জমি, এমন দোয়া যাহা দৈনিক আদায় করা হয়, দৈনিক প্রার্থনা। جڑ - শিকড়, মূল, গাছের মূল, ভিত্তি। پهيلنا - প্রচার করা, প্রকাশ করা, বিস্তার লাভ করা বিকাশ ঘটা। زبردستى - জোরপূর্বক, জোর করিয়া, বাধ্য করিয়া অত্যাচার। خطرناك - বিপদসঙ্কুল, বিপদজনক, ভয়াবহ, ভীতিকর। بے پروا - ভয়হীন, নির্বিঘ্ন, বেপরওয়া, উপেক্ষা। جان توڑ - প্রাণপণ, অক্লান্ত শ্রম। كوشش - চেষ্টা, প্রয়াস, তৎপরতা, কোশেশ। تجويز - মত, ধারণা, সুবিবেচনা, ব্যবস্থা। عموماً - সাধারণতঃ। محسوس - অনুধাবন, অনুভূত, দৃষ্ট, বুঝিতে পারা। عاشق - প্রেমিক, উপপতি, যে আকৃষ্ট হইয়াছে এমন, আশিক। همّت - সাহস, ক্ষমতা, প্রাণ। تعميل - পালন, সম্পাদন, নির্বাহ, মান্য করা।

প্রকাশ্যে ইসলামের তাবলীগ এবং সত্য আওয়াজের বিরোধিতা

প্রশ্ন ঃ প্রকাশ্যে ইসলামের তাবলীগ কিভাবে শুরু করা হয়?

উত্তর ঃ একদা রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার সাফা নামক পাহাড়ে তাশরীফ লইয়া গেলেন। অতঃপর কোরাইশ গোত্রের লোকদিগকে নাম ধরিয়া ধরিয়া আহবান করিলেন। যখন সকলে আসিয়া সমবেত হইল তখন তিনি বলিলেন, আমি যদি তোমাদিগকে এই সংবাদ দেই যে, এই পাহাড়ের পিছনে শত্রুবাহিনী মোতায়েন হইয়াছে এবং শীঘ্রই তাহারা তোমাদের উপর হামলা করিবে, তবেকি তোমরা আমার এই সংবাদ সত্য বলিয়া মনে করিবে?

উপস্থিত সকলে সমস্বরে জবাব দিলঃ আপনার সততার উপর আমাদের আস্থা আছে। আজ পর্যন্ত আপনার দ্বারা কোন ব্যতিক্রম কথা প্রকাশ পায় নাই। এই কারণেই সমগ্র আরব আপনাকে "সত্যবাদী" ও "বিশ্বাসী" উপাধী দ্বারা সম্বোধন করে। ইহা কেমন করিয়া সম্ভব যে, এত বড় একটা খবরকে আমরা সত্য বলিয়া মানিয়া লইব না?

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তোমরা যদি তোমাদের অপবিত্র ধ্যান–ধারণা এবং ভুল আকীদা সমূহ ত্যাগ না কর তবে নিশ্চিত জানিও যে, আল্লাহর কঠিন আজাবের লশকর তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবে। আমি তোমাদিগকে (এই বিষয়ে) সতর্ক করিতেছি।

প্রশ্ন ঃ যখন আল্লাহ পাকের এই হুকুম নাজিল হইলঃ

وَ اَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الاقربين *

"আপনি নিকটতম আত্মীয়দিগকে সতর্ক করিয়া দিন"।

তখন রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে এই আদেশ পালন করিলেন?

উত্তর ঃ তিনি নিজের প্রপিতামহ আবদে মানাফের বংশ হইতে আনুমানিক চল্লিশ ব্যক্তিকে জড়ো করিয়া (এক আবেগপূর্ণ ভাষণে) বলিলেন, আমি তোমাদের জন্য এমন উপঢৌকন লইয়া আসিয়াছি যে, দুনিয়ার কোন মানুষই নিজের কওম ও দলের জন্য উহা অপেক্ষা উত্তম উপঢৌকন আনিতে পারে নাই। আমি তোমাদের জন্য দীন-দুনিয়ার উন্নতি ও কামিয়াবী লইয়া আসিয়াছি। আল্লাহ পাকের হুকুম হইল, আমি যেন তোমাদিগকে তাঁহার দিকে আহবান করি।

আল্লাহর শপথ! আমি যদি পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গে মিথ্যা কথা বলিতাম, তবে সেই ক্ষেত্রেও কোন অবস্থাতেই তোমাদের সঙ্গে মিথ্যা বলিতাম না। দুনিয়ার সকল মানুষকে যদি আমি ধোঁকা দিতাম, তবুও আমার অন্তর ইহা সহ্য করিত না যে, আমি তোমাদিগকে ধোঁকা দেই। ঐ পরওয়ারদিগারের শপথ, যিনি একক! আমি তোমাদের নিকট রাসূল ও পয়গম্বর হিসাবে প্রেরীত হইয়াছি।

প্রশ্ন ঃ কোরাইশগণ এই সত্যের আহবানের কি জবাব দিল?

উত্তর ঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু লাহাব দাঁড়াইয়া উঠিয়া চিৎকার করিয়া বলিল-

تَبًّا لَكَ أ لِهذا جَمَعْتَنا ..

– তুমি বরবাদ হইয়া গিয়াছ, এই কারণেই কি আমাদিগকে একত্রিত করিয়াছিলে?

"আল্লাহ'র পানাহ" কালামে পাকের "তাব্বাত ইয়াদা" সুরায় আল্লাহ পাক উহার জবাবে বলিলেন– "আবু লাহাবই বরবাদ হইয়াছে।"

উপরোক্ত ঘটনার পর কাফেরগণ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার সঙ্গী ও সহযোগীদিগকে এমন জ্বালাতন করিয়াছে যে, উহা শুনিলেও দেহের পশম দাঁড়াইয়া ওঠে। পৃথিবীতে (সেই অত্যাচারের) অপর কোন দৃষ্টান্ত নাই।

আল্লাহর পানাহ! কোন কোন সময় নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথে কাঁটা বিছাইয়া রাখা হইত। কখনো প্রাসাদের উপর হইতে ময়লা-আবর্জনার টুকরী তাঁহার দেহ মোবারকে নিক্ষেপ করা হইত। আবার কখনো সেই পবিত্র দেহকে (আল্লাহ ক্ষমা করুন) প্রহার করার মত বেআদবীও করা হইত এবং জখমের রক্ত দ্বারা সমস্ত দেহকে যেন গোসল করাইয়া দেওয়া হইত।

আল্লাহর কুদরত দৃশ্যমান। আল্লাহর সেই ঘর; যেখানে কোন প্রাণীকেও কষ্ট দেওয়া হারাম মনে করা হইত; সেই ঘরে স্বয়ং রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনরা বিবিধ উপায়ে কষ্ট দিত।

সেই কা'বা– যাহা আল্লাহর ঘর এবং গোটা মাখলুকাতের জন্য নিরাপদ স্থান; সেই ঘরে যখন আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় ও পবিত্র বান্দা আল্লাহর সম্মুখে সেজদা করিত তখন তাঁহার গলায় কাপড় জড়াইয়া এমনভাবে টানা হইত যে, উহার ফলে তাঁহার

দম বন্ধ হইয়া আসার উপক্রম হইত এবং চক্ষু বাহির হইয়া আসিত।

কখনো মাথার উপর উটের নাড়ী–ভুঁড়ি আনিয়া রাখিয়া দেওয়া হইত, উহাতে মনকে মন ময়লা থাকিত। আবার কখনো ঐ পবিত্র মস্তক পিষিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইত যাহা আল্লাহর পবিত্র ঘরে আল্লাহর সম্মুখে জমিনের উপর রক্ষিত থাকিত। কখনোবা আল্লাহর সেই পবিত্র ও প্রিয় বান্দাকে শহীদ করিয়া দেওয়ার পরিকল্পনা করা হইত।

এমনও হইয়াছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গীদিগকে উত্তপ্ত কয়লার উপর শোয়াইয়া দেওয়া হইত। মক্কার ঐ পাথরময় জমিন যাহা তন্দুরের গরম ছাইয়ের মতই উত্তপ্ত হইয়া ওঠে; দ্বিপহরের অগ্নিবর্ষক রোদের সময় সেই জমিনকে হযরত বেলালের বিছানা বানানো হইত। অতঃপর উহাতে তাহাকে খালি গায়ে শয়ন করাইয়া বুকের উপর পাথর চাপা দিয়া রাখা হইত, যেন একটুও নড়াচড়া করিতে না পারেন।

হযরত বেলালের গলায় রশি লাগাইয়া বালকদের নিকট সোপর্দ করিয়া দেওয়া হইত, যেন পাহাড়ের পাথরের উপর দিয়া হেঁচড়াইয়া টানা হয়।

অনেক সময় এমনও হইয়াছে যে, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গীদিগকে উভয় হাত বাঁধিয়া শুধু এই অপরাধে বেত্র লাগানো হইয়াছে যে, তাহারা মূর্তি পূজা ত্যাগ করিল কেন? কাহারো ঘাড় মট্‌কাইয়া দেওয়া হইত. আবার কাহারো মাথার চুল টানিয়া ধরা হইত। ধুঁয়ার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া হযরত ওসমানগণীর শ্বাস বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত। আবার

কাহাকেও গরু বা উটের কাঁচা চামড়ার মধ্যে জড়াইয়া রোদে ফেলিয়া রাখা হইত, কাহাকেও লৌহবর্ম পরাইয়া উত্তপ্ত পাথরের উপর নিক্ষেপ করা হইত।

রে আবু জাহেল! তোর সেই অত্যাচারের কথা চিরদিন স্মরণ থাকিবে যে, তুই বিবি সুমাইয়া (রাঃ)–এর নাজুক অঙ্গে বল্লমের আঘাত করিয়া তাহাকে শহীদ করিয়াছিলি।

পৃথিবী কোন দিন ইহা ভুলিতে পারিবে না যে, ঐ হতভাগারা তিন বছর পর্যন্ত রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার সঙ্গীদিগকে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারা এমন চেষ্টা করিয়াছিল, যেন এক ফোটা পানি কিংবা এক লোকমা আহারও আল্লাহর অনুসারীদের নিকট পৌছাইতে না পারে। শিশুরা রাতভর ক্ষুধার তাড়নায় কান্নাকাটি করিত।

তাহাদের ঐ সকল আত্মীয়–স্বজন যাহারা এই সকল শিশুদের গায়ে একটি মাছি বসিলেও উহা সহ্য করিতে পারিত না; আজ তাহারা শিশুদের কান্না শুনিতেছে। পাথরের যদি কান থাকিত তবে নিশ্চয়ই উহা ফাটিয়া যাইত, কিন্তু তাহাদের অন্তর এক মুহূর্তের জন্যও নরম হইত না। আবার কিছুটা প্রভাবিত হইলেও অঙ্গীকারের পাবন্দি ও বাধ্যবাধকতার কারণে অপারগ হইয়া যাইত।

তাহাদের অপরাধ ছিল এইটুকু যে, তোমরা আল্লাহকে এক বল কেন এবং প্রস্তর সমূহকে পূজা কর না কেন? ডাকাতি, মারামারি, মদ্যপান, জুয়াখেলা, অশ্লীলতা এবং হাজারো কিসিমের অপরাধকর্মে আমাদের সঙ্গ দাও না কেন?

তিনিই আল্লাহর একমাত্র বান্দা, যিনি গোটা পৃথিবীর জন্য

"রহমত" হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি যখন মানুষকে কল্যাণের কথা শোনাইতেন তখন তাহারা শোরগোল জুড়িয়া দিত, যেন কেহ তাঁহার কথা শুনিতে না পায়। তাঁহাকে (আল্লাহ ক্ষমা করুন) পাগল বলা হইত, যেন লোকেরা তাঁহার কথায় কান না দেয়। মেলা ও বাজারের অবস্থান সমূহের পথ রোধ করিয়া রাখা হইত, যেন হুজুরের নিকট কেহ গমন করিতে না পারে। তাহারা পাথর বর্ষণ করিত এবং পিছনে লাগিয়া থাকিত, যেন আল্লাহর প্রেরীত প্রিয় রাসূল পথ চলিতে না পারেন।

তারেক বিন আব্দুল্লাহ মোহারেবী একজন ছাহাবী। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি জিল মোজায বাজারে (মেলায়) গিয়া দেখিতে পাইলেন, লাল ডোরাওয়ালা চাদর গায়ে এক ব্যক্তি বলিতেছেন, হে লোকসকল! তোমরা বল "আল্লাহ এক, তিনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই" তাহা হইলে তোমরা সফলকাম হইবে। অপর এক ব্যক্তি পাথর লইয়া তাঁহার পিছনে লাগিয়া আছে। পাথরের আঘাতে তাঁহার উভয় পায়ের টাখনু রক্তাক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। লোকটি চিৎকার করিয়া বলিতেছে, এই লোকটির কথা শুনিবে না, সে মিথ্যুক (আল্লাহর ক্ষমা করুন)।

হযরত তারেক বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? লোকেরা বলিল, ইনি আব্দুল মোত্তালিবের খান্দানের এক যুবক। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, পাথর নিক্ষেপকারী লোকটি কে? আমাকে জবাব দেওয়া হইল, তাঁহার চাচা আব্দুল উজ্জা, তাহাকে আবু লাহাব ডাকা হয়।

মোটকথা, উহা ছিল সত্যের এক আহবান যাহা পাহাড়ের ঘাটী, শহর, অলিগলি,হাট ও মেলার বাজার সমূহ, বিবাহ ও

আনন্দের অনুষ্ঠান, দুঃখ-কষ্টের মাতমস্থল, খানায়ে কা'বার হেরেম এবং মিনা ও আরাফাতের উপত্যকা সমূহে অত্যন্ত নিরীহ ও নিপীড়িত অবস্থায় সততার সহিত ধ্বনিত হইতেছিল। জালেমদের জুলুম উহাকে দমাইয়া রাখিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু নিপীড়নের স্ফুলিঙ্গ দিন দিন উহাকে প্রজ্জ্বলিত করিতেছিল।

কোন জুলুম-অত্যাচারই যখন কার্যকর মনে করা হইল না, তখন লোভ-লালসাও দেখানো হইল। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করা হইল, আপনার যদি সুন্দরী নারীর সন্ধান চাই; তবে আরবের নারীকুল প্রস্তুত, যাহাকে ইচ্ছা গ্রহন করিতে পারেন। যদি অর্থের প্রয়োজন থাকে তবে আরবের ধনাগার মওজুদ। যদি বাদশাহীর অভিলাষ থাকে তবে গোলামীর জন্য আমাদের মাথা হাজির, আমরা প্রজা হইয়া আপনাকে বাদশাহ বানাইতেছি।

কিন্তু নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একমাত্র জবাব ছিল- দুনিয়ার মানুষ যদি আমার এক হাতে চন্দ্র এবং অপর হাতে সূর্য আনিয়াও রাখিয়া দেয়; তবুও আল্লাহর শপথ! আমি ঐ অবস্থান হইতে একটুও সরিয়া আসিব না, আল্লাহ পাক আমাকে যেখানে জমাইয়া দিয়াছেন।

মোটকথা, উহা এমন এক আহবান ছিল যাহা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবান হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল। নাফরমান লোকেরা উহাকে দমাইয়া রাখিতে হাজারো চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু উহা ছিল আল্লাহর আহবান, আল্লাহর যেই আহবান বুলন্দ ও সমুন্নত হইবার ছিল উহা বুলন্দ হইয়াছে এবং এখনো বুলন্দ আছে। এখন ভবিষ্যতে উহাকে সমুন্নত রাখা তোমাদের কর্তব্য।

প্রশ্ন ঃ মক্কাতে সবচাইতে বড় দুশমন কে কে ছিল যাহারা সর্বাধিক কষ্ট দিত?

উত্তর ঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু লাহাব, আবু জাহেল এবং তাহার ভাই আসী, ওলীদ বিন ওৎবা, হিশামের পুত্র আবুল বোহ্‌তারী এবং রবীআর পুত্র ওৎবা ও শাইবাহ্।

প্রশ্ন ঃ দুনিয়াতে তাহাদের পরিণতি কি হইয়াছে?

উত্তর ঃ বদরের যুদ্ধে তাহারা নিহত হইয়াছে। আবু লাহাব বদরের যুদ্ধে আসে নাই। সে ঐ সময় রক্ষা পাইয়াছে বটে; কিন্তু বদরের যুদ্ধের এক সপ্তাহ পর গুটিবসন্তে আক্রান্ত হইয়া সে মৃত্যুবরণ করে। তিন দিন পর্যন্ত তাহার লাশ পড়িয়া ছিল। বসন্তের ভয়ে কেহ তাহার লাশের নিকটে আসিত না। পরে লোকেরা যখন তাহার ওয়ারিশদিগকে অভিশাপ ও তিরস্কার করিল, তখন তাহারা একটি গর্ত করিয়া উহাতে তাহার লাশ ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। অতঃপর দুর হইতে পাথর নিক্ষেপ করিয়া তাহার কবর ঢাকিয়া দেওয়া হইল।

শব্দার্থঃ

کھلم کھلا - প্রকাশ্য, খোলাখুলি, নির্ভিকভাবে, যাহা সকলে দেখিতে পায় এমন। مخالفت - বিরোধিতা, শত্রুতা, বিরুদ্ধাচরণ, প্রতিদ্বন্দ্বীতা। لشکر - সৈন্য, ফৌজ, লশ্‌কর। حملہ - আক্রমণ, আঘাত, চড়াও। ایک زبان - এক আওয়াজ, সমস্বর, এক কথা। سرزد ہونا - প্রকাশ হওয়া, জাহের হওয়া, অনুষ্ঠিত হওয়া, কার্যকর হওয়া। پردادا - প্রপিতামহ, দাদার পিতা। تحفہ - উপহার, উপঢৌকন,

সাধনা। ضمیر- হৃদয়, মন, অন্তকরণ, দিল, বিবেক। رونگٹے- দেহের পশম, লোম। کوڑے کرکٹ - ময়লা, আবর্জনা। جسد - দেহ, শরীর, গতর। غلاظت- ময়লা, আবর্জনা, মালিন্য, কলুষ। امن - নিরাপত্তা, শান্তি, বিপদমুক্ত। حواله- সোপর্দ, জিম্মা, তত্ত্বাবধান, অর্পণ, ন্যস্ত। زره - লৌহবর্ম, যুদ্ধের পোশাকবিশেষ। مقاطعه - অবরোধ, বয়কট। بلبلانا - কান্না করা, উচ্চস্বরে ক্রন্দন। لمحه - মুহূর্ত, চোখের পলক, পল, সময়ের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ। پسیجنا - সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া, নরম হওয়া, অনুগ্রহ করা, মজলুমের ফরিয়াদ শুনিতে প্রস্তুত হওয়া, ঘর্মাক্ত হওয়া। معاهده - চুক্তি, সন্ধি, অঙ্গীকার, মৈত্রী। پابندی - বাধ্যতা, বন্ধন, নিয়মানুবর্তীতা। مجبوری - অপারগতা, বাধ্যতা। قصور- অন্যায়, অপরাধ, ভুল, ত্রুটি, পাপ, দোষ, অশুদ্ধতা, অপূর্ণতা। یکتا - একক, একাকী, উপমাহীন, একমাত্র। مجنون - উম্মাদ পাগল। ناکه بندی - অবরোধ, পথ রোধ করা, গতি রোধ করা, প্রতিরোধ করা। دهاری - ডোরা, সমান্তরাল রেখাবিশেষ। لہولہان - রক্তাক্ত, রক্ত-রঞ্জিত। پینٹھو- হাট, সাপ্তাহিক বাজার। رنج - দুঃখ, কষ্ট, বেদনা, মনোকষ্ট। وادی - উপত্যকা, পাহাড়ের পাদদেশ, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী সমতল ভূমি। تمنا - ইচ্ছা, আকাঙ্খা, অভিলাষ, অভিপ্রায়, প্রার্থনা। بلند- উচ্চ, সমুন্নত। انجام- পরিণতি, পরিণামফল, ফলাফল, সমাপ্তি, শেষ।

হিজরত বা নির্বাসন

প্রশ্ন ঃ হিজরতের অর্থ কি?

উত্তর ঃ কোন কারণে বাধ্য হইয়া নিজের আসল দেশ ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে চলিয়া যাওয়াকে হিজরত বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কয়টি হিজরত হইয়াছে?

উত্তর ঃ তিনটি।

প্রশ্ন ঃ ঐ সকল হিজরতের নাম কি কি?

উত্তর ঃ (১) আবিসিনিয়ার প্রথম হিজরত। (২) আবিসিনিয়ার দ্বিতীয় হিজরত। (৩) মদীনার হিজরত।

প্রশ্ন ঃ প্রথমবার মক্কা ত্যাগ করিয়া লোকেরা কোথায় গেল?

উত্তর ঃ আবিসিনিয়াতে।

প্রশ্ন ঃ আবিসিনিয়ার বাদশার নাম এবং তাহার পদবী ও ধর্ম কি ছিল?

উত্তর ঃ বাদশার নাম আসহামা। ধর্ম– ঈসায়ী। পদবী– নাজ্জাশী। আবিসিনিয়ার সকল বাদশার পদবীই নাজ্জাশী ছিল।

প্রশ্ন ঃ ঐ হিজরতে লোকসংখ্যা কত ছিল?

উত্তর ঃ সর্বমোট পনের বা ষোলজন। দশ বা এগারজন পুরুষ এবং চার বা পাঁচজন মহিলা।

প্রশ্ন ঃ তাহাদের মধ্যে রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন কি–না এবং তাহাদের দলপতি কে ছিলেন?

উত্তর ঃ তাহাদের মধ্যে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন না। আর প্রসিদ্ধ মত এই যে, হযরত আলী (রাঃ)–এর আপন ভাই হযরত জাফর বিন আবু তালেব তাহাদের দলপতি ছিলেন। আবার অনেকের ধারণা হইল, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতা হযরত ওসমানগণী (রাঃ) দলপতি ছিলেন এবং তিনি হুজুরের কন্যাকে সঙ্গে লইয়া ছফর করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন ঃ তাহারা কি কারণে হিজরত করিয়াছিলেন?

উত্তর ঃ কোরাইশরা যখন তাহাদের জীবন দুর্বিসহ করিয়া তুলিল তখন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন মনে করিয়া আবিসিনিয়া চলিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন।

প্রশ্ন ঃ কোরাইশরা উহার মোকাবেলায় কি করিল?

উত্তর ঃ কোরাইশরা আমর ইবনুল আস এবং আব্দুল্লাহ বিন উমাইয়াহ্‌কে বহু উপঢৌকন দিয়া আবিসিনিয়ার বাদশার নিকট পাঠাইল। তাহারা বাদশার নিকট সেই উপঢৌকন পেশ করিয়া আবেদন করিল, যেন সেই লোকগুলিকে তাহাদের নিকট সোপর্দ করিয়া দেওয়া হয়। কেননা, তাহারা জাতিদ্রোহী এবং ধর্মদ্রোহী।

প্রশ্ন ঃ নাজ্জাশী কি জবাব দিলেন?

উত্তর ঃ তিনি বলিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহাদের সঙ্গে আলোচনা না করিব এবং ইসলামের হাকীকত সম্পর্কে অবগত না হইব ততক্ষণ আমি তাহাদিগকে তোমাদের নিকট সোপর্দ করিতে পারি না।

প্রশ্ন ঃ নাজ্জাশীর সঙ্গে (মুসলমানদের পক্ষ হইতে) কে কথা বলিলেন?

উত্তর ঃ হযরত জাফর বিন আবি তালেব (রাঃ)।

প্রশ্ন ঃ সেই আলোচনা কি ছিল সংক্ষেপে বল।

উত্তর ঃ আবিসিনিয়ার বাদশাহ বলিলেন, তোমাদের ধর্ম এবং তথাকার সত্য সত্য ঘটনা কি বল। তখন হযরত জাফর (রাঃ) অগ্রসর হইয়া বলিলেন–

হে বাদশাহ! আমরা পথভ্রষ্টতা ও মুর্খতার এক ক্রান্তিলগ্নে আক্রান্ত ছিলাম। আমরা মাটি ও পাথরের অথর্ব মূর্তি সমূহ পূজা করিতাম। হারাম ও মুরদার প্রানী ছিল আমাদের আহার। হাজারো কিসিমের অপকর্ম ছিল আমাদের স্বভাব। আত্মীয়দের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, প্রতিবেশীদের উপর অত্যাচার এবং শাসকদের সঙ্গে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা আমাদের স্বভাবে পরিণত হইয়াছিল। আমাদের শক্তিশালীগণ দুর্বলদের উপর অত্যাচার করিত। ইহা আল্লাহর শান যে, তিনি আমাদের সংশোধনের জন্য একজন সত্য নবী প্রেরণ করিলেন, যাহার পিতৃকুল ও মাতৃকুল সম্পর্কে আমরা অবগত। তাঁহার সততা, দিয়ানতদারী ও পরহেজগারী গোটা আরবে প্রসিদ্ধ।

তিনি আমাদিগকে এক আল্লাহর দিকে আহবান করিয়া বলিলেন, আমরা যেন অপর কাহাকেও আল্লাহর শরীক এবং তাঁহার সাহায্যকারী না বানাই। মাটি ও পাথরের কুৎসিত মূর্তির সম্মুখ হইতে যেন আমাদের মাথা সরাইয়া লই, যাহা তাহাদের পায়ের উপর নিরর্থক পড়িয়া থাকিত।

তিনি আমাদিগকে হুকুম করিলেন– সর্বদা সত্য কথা বল।

আপনজন ও আত্মীয়দের সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর। প্রতিবেশীদের উপর অনুগ্রহ কর এবং হারাম হইতে বাঁচিয়া থাক। নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা হইতে নিজের হাতকে বিরত রাখ। অন্যায়কে ঘৃণা কর। মিথ্যা বিষয়ের উপর অভিশাপ বর্ষণ কর এবং কখনো এতীমের সম্পদ খাইবে না (আত্মসাৎ করিবে না)। নামাজ পড়, হজ্ব কর এবং জাকাত আদায় কর।

হে মান্যবর! আমরা শতপ্রাণে তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছি এবং আন্তরিকতার সহিত তাঁহার সত্যতা স্বীকার করিয়া লইয়াছি।

অতঃপর হযরত জাফর (রাঃ) সুরা মরিয়ম তেলাওয়াত করিয়া হযরত ঈসা ও মরিয়ম (আঃ) সম্পর্কে ইসলামের আকীদা ও দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করিলেন।

প্রশ্ন ঃ বাদশার উপর উহার কি প্রভাব পড়িল?

উত্তর ঃ এই আবেগপূর্ণ সত্য ভাষণ শুনিয়া তিনি নিজেই ঈমান আনিয়া ফেলিলেন এবং মুসলমানদিগকে কোরাইশদের নিকট সোপর্দ করিতে অস্বীকার করিয়া দিলেন।

প্রশ্ন ঃ নবুওয়্যত প্রাপ্তির কোন্ বছর এই হিজরত হইয়াছিল?

উত্তর ঃ পঞ্চম বছর।

প্রশ্ন ঃ আবিসিনিয়া হইতে কতদিন পর তাহারা প্রত্যাবর্তন করিলেন?

উত্তর ঃ দুই বা তিন মাস পর।

প্রশ্ন ঃ এত তাড়াতাড়ি কেন ফিরিয়া আসিলেন?

উত্তর ঃ একটি মিথ্যা সংবাদ রটিয়া গিয়াছিল যে, মক্কার কাফেররা মুসলমান হইয়া গিয়াছে।

প্রশ্ন ঃ প্রত্যাবর্তনের পর মক্কার কাফেররা তাহাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করিল?

উত্তর ঃ সেই আগের মতই জুলুম, অত্যাচার ও নির্যাতন চালাইল।

সারাংশ

কোরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া কিছু মানুষকে মক্কা ত্যাগ করার অনুমতি দেওয়া হইল। প্রথমবার ১৫/১৬ জন মক্কা ত্যাগ করিয়া আবিসিনিয়া গমন করেন। হযরত জাফর কিংবা হযরত ওসমান (রাঃ) তাহাদের দলপতি ছিলেন। কোরাইশগণ তাহাদের পিছনে লাগিল এবং দুই ব্যক্তিকে বহু উপঢৌকন দিয়া আবিসিনিয়ার বাদশার নিকট পাঠাইল, যেন মুসলমানদিগকে তাহাদের নিকট সোপর্দ করিয়া দেওয়া হয়। বাদশাহ মুসলমানদের নিকট বিস্তারিত ঘটনা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং উহা শুনিবার পর তিনি নিজেই ঈমান আনিয়া ফেলিলেন। অতঃপর তিনি মুসলমানদিগকে তাহাদের হাতে সোপর্দ করিতে অস্বীকার করিলেন।

এদিকে মুসলমানগণ একটি মিথ্যা খবরের ভিত্তিতে (আবিসিনিয়া হইতে মক্কায়) ফিরিয়া আসিলেন। স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার পর মক্কার কাফেররা আগের তুলনায় আরো বেশী অত্যাচার করিল। বাদশার নাম ছিল আসহামা, পদবী নাজ্জাশী এবং তাহার পূর্বধর্ম ছিল ঈসায়ী।

শব্দার্থঃ

هجرت - স্থায়ীভাবে দেশত্যাগ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা হইতে মদীনা গমন। جلاوطنی - দেশত্যাগ, নির্বাসন, দেশ হইতে বহিস্করণ। حبشه - আবিসিনিয়া, ইথিওপিয়া আরবের একটি দেশের নাম। سردار- দলপতি, প্রধান ব্যক্তি, পরিচালক,

নায়ক। سمیت – সহ, সঙ্গে, একত্রে, একসঙ্গে। دوبھر – দুর্বিসহ, বিপন্ন, ব্যর্থ, কষ্টকর। باغی – বিদ্রোহী, বিপ্লবী, বিশ্বাসঘাতক। گفتگو – আলাপ–আলোচনা, কথাবার্তা, মতবিনিময়। بےحس – অনুভূতিহীন। بدسلوکی – দুর্ব্যবহার, অন্যায় আচরণ, খারাপ ব্যবহার, অসৌজন্যমূলক আচরণ। بدعہدی – অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, ওয়াদা ভঙ্গ করা, কথা রক্ষা না করা। پاکدامنی – পরহেজগারী, সততা, সাধুতা। تہ دل سے – আন্তরিকতার সহিত, এখলাসের সহিত। سلوک – আচরণ, ব্যবহার, কর্মপদ্ধতি, মোহাব্বত, ভালবাসা, সাহায্য, মঙ্গল, নেক, নেক নজর, আল্লাহর নৈকট্য কামনা, আল্লাহর সন্ধান। تنگ آنا – অতিষ্ঠ হওয়া, অসন্তুষ্ট হওয়া, বিরক্ত হওয়া, বাধ্য হওয়া, ক্লান্ত হওয়া, ভয় পাওয়া। تعاقب – অনুসরণ, পশ্চাদ্ধাবন, নির্যাতন।

ইসলামের উন্নতি এবং হুজুর (সঃ)–এর অবরোধ

প্রশ্ন ঃ নবুওয়্যতের কোন্ বছর প্রথম হিজরত হইতে প্রত্যাবর্তন করা হয়?

উত্তর ঃ পঞ্চম বছর।

প্রশ্ন ঃ ঐ বছর মুসলমানদের সংখ্যা কত হইয়াছিল?

উত্তর ঃ চল্লিশজন পুরুষ এবং এগারজন মহিলা।

প্রশ্ন ঃ ঐ বছরের বড় ঘটনা কি?

উত্তর ঃ রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত হামজা এবং তিন দিন পর হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) মুসলমান হওয়া।

প্রশ্ন ঃ ঐ বছর পর্যন্ত মুসলমানদের কি অবস্থা ছিল এবং এই দুই বুজুর্গ ঈমান আনার পর পরিস্থিতির উপর কি প্রভাব পড়িল?

উত্তর ঃ ঐ সময় পর্যন্ত যেই সকল ব্যক্তিবর্গ মুসলমান হইয়াছিলেন তাহারা যদিও বুদ্ধিমত্তা, ভাবগাম্ভীর্যতা এবং নেক স্বভাবে তুলনাহীন ও প্রসিদ্ধ ছিলেন; যেমন হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) মামলা-মোকদ্দমার সুষ্ঠু ফায়সালার ব্যাপারে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তবুও তাহারা প্রভাবশালী ও ভয় পাওয়ার মত মানুষ ছিলেন না। এই কারণেই ইসলামের যাবতীয় আহকাম লুকাইয়া লুকাইয়া পালন করা হইত এবং ঐ বছর পর্যন্ত ইসলাম যেন একটি গোপন রহস্য ছিল।

উপরোক্ত বুজুর্গদ্বয় যেহেতু নির্ভিক, বাহাদুর এবং প্রভাবশালী ছিলেন, সুতরাং এই দুই ব্যক্তি বিশেষতঃ হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) ইসলামের এই পলায়নপর অবস্থা একেবারেই উঠাইয়া দিলেন। ধারণা করা হয় যে, এই আশাতেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়াও করিয়াছিলেন যে, আয় আল্লাহ! ওমর ইবনে খাত্তাব কিংবা আবু জাহেল বিন হিশামের দ্বারা তুমি ইসলামকে শক্তি দান কর। আর ইহাই প্রত্যাশা ছিল। তিনি মুসলমানদিগকে এমন উৎফুল্ল করিয়া দিলেন যে, তাহারা সহসা এমন জোরে নারায়ে তাকবীরের ধ্বনি তুলিল, যাহার ফলে মক্কার অলিগলি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সুতরাং হযরত ওমর ফারূকও মুসলমানদের প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করিলেন।

প্রশ্ন ঃ ইসলাম গ্রহণের পর হযরত ওমর ফারূকের প্রথম কাজ কি ছিল?

উত্তর ঃ হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) ইসলাম গ্রহণে সৌভাগ্যবান হওয়ার

পর আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যদি হকের উপর থাকি, তবে এই গোপনীয়তার আর কোন কারণ নাই। অতঃপর তিনি মুসলমানদিগকে সঙ্গে লইয়া হেরেম শরীফে গমন পূর্বক এক আল্লাহর এবাদত পালন করিলেন।

প্রশ্ন ঃ কাফেররা মুসলমানদের এই সাহসিকতাকে কোন্ দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করিল?

উত্তর ঃ ক্রমবর্দ্ধমান ইসলামের উন্নতি তাহাদের অন্তরে ভয় সৃষ্টি করিয়া দিল। তাহারা নিজেদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখিতে পাইল এবং তাৎক্ষণিকভাবে দাঙ্গা–হাঙ্গামা দ্বারা মুসলমানদের এই শৌর্য বীর্যের জবাব দিল। কিন্তু পরবর্তীতে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া মুসলমানদিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রশ্ন ঃ মুসলমানদিগকে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার কি পন্থা অবলম্বন করিল?

উত্তর ঃ এই ব্যবস্থা তো পূর্ব হইতেই ছিল যে, কোন মানুষ যেন রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে পৌঁছাইতে না পারে। রাস্তায় লোক বসাইয়া দেওয়া হইত, যেন আগেই পথচারীদিগকে বাধা প্রদান করা হয়। আর বিভিন্ন প্রকার মিথ্যা অপবাদ দ্বারা তাহাদের কান ভরিয়া দেওয়া হইত যেন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাহাদের ঘৃণা জন্মিয়া যায় (আল্লহর পানাহ) এবং তাহারা এদিকে আসিবার চিন্তাও না করে। কিন্তু এখন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শহীদ করিয়া দেওয়ার পরিকল্পনা শুরু হইল। কিন্তু তাহাদের ভয় শুধু একটাই ছিল যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের লোকেরা রক্তের প্রতিশোধ লওয়ার জন্য দাঁড়াইয়া যাইবে এবং যুদ্ধ বাঁধিয়া যাইবে। এই

কারণেই পরবর্তীতে এই চেষ্টা করা হইল যেন রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহযোগীদিগকে হুজুর হইতে পৃথক করিয়া দেওয়া যায়।

অতএব, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে বয়কট করা হইল এবং তাঁহার খান্দানের যেই সকল লোক এখনো মুসলমান হয় নাই কিন্তু হুজুরকে সহযোগিতা করিতেছিল, তাহাদের নিকট এই দাবী করা হইল যে, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের নিকট সোপর্দ করিয়া দাও; আমরা তাহাকে শহীদ করিয়া ফেলিব। যদি এইরূপ না কর, তবে তোমাদের খানাপিনাও বন্ধ। অর্থাৎ– তোমাদিগকেও বয়কট করা হইবে।

প্রশ্ন ঃ বয়কটের ধরন কি ছিল এবং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গীগণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ছিল কি–না?

উত্তর ঃ মুসলমান তো দূরের কথা, যেই সকল কাফের নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহযোগী ছিল তাহারাও তাঁহার সহযোগিতা ত্যাগ করে নাই। ফলে তাহাদিগকে মক্কার ঐ স্থানে আবদ্ধ করা হইল যাহা "শো'বে আবী তালেব" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সেখানে ব্যাপকভাবে এই প্রতিবন্ধক আরোপ করা হইল যে, না নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কেহ সাক্ষাত করিতে পারিবে, না কোন প্রকার পানাহার সামগ্রী বা প্রয়োজনীয় বস্তু তাঁহার নিকট পৌছাইতে পারিবে। এই বিষয়ে কাফেরদের বড় বড় সরদারগণ একটি চুক্তিনামা লিখিয়া কা'বা ঘরে রাখিয়া দিল।

প্রশ্ন ঃ এই বয়কট কবে শুরু হয়?

উত্তর ঃ নবুওয়্যাতের সপ্তম বছর মোহররম মাসে।

প্রশ্ন ঃ এই বয়কট–অবরোধ বা নজরবন্দির সময় মুসলমানদের কি অবস্থা হইয়াছিল?

উত্তর ঃ খাবার ও পানি পৌঁছানো বন্ধ ছিল এবং ক্ষুধার কারণে শিশুরা চিৎকার করিত। ঐ সকল কাফের যাহারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিল তাহারা ঐ ক্রন্দন শুনিতে পাইত বটে, কিন্তু তখন আত্মীয়তার রক্ত সাদা হইয়া গিয়াছিল (অর্থাৎ- সম্পর্ক শিথিল হইয়া গিয়াছিল)। হয় তাহাদের অন্তরে কোন প্রকার দয়া–মায়া আসিত না অথবা চুক্তির পাবন্দি অন্তর হইতে দয়া–মায়া বাহির করিয়া দিয়াছিল। বয়কটের সময় গাছের পাতা এবং ঘাসের শিকড় খাইয়া জীবন ধারণ করা হইত।

প্রশ্ন ঃ সকল ছাহাবী অবরোধের মধ্যে ছিলেন, না অবরোধ ব্যতীত অন্য কোন হুকুমও ছিল?

উত্তর ঃ রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবীগণকে হিজরতের অনুমতি দিয়াছিলেন। সুতরাং মুসলমানগণ দ্বিতীয়বার আবিসিনিয়ায় হিজরত করিলেন।

সারাংশ

নবুওয়্যাতের পঞ্চম বছর হযরত হামজা (রাঃ) এবং উহার তিন দিন পর হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) ইসলামে প্রবেশ করিলেন। এই দুই মান্যবর ব্যক্তি অত্যন্ত প্রভাবশালী মানুষ ছিলেন। মুসলমানগণ পাহাড়ের অবস্থান হইতে বাহির হইয়া বাইতুল্লাহ শরীফে (প্রকাশ্যে) এবাদত করিলেন।

কাফেররা পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করিয়া ইসলামের মুলোৎপাটনের আয়োজন করিল। সুতরাং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার সঙ্গীদিগকে মক্কার নিকটবর্তী "শো'বে আবী তালেব" নামক স্থানে আবদ্ধ করিয়া বয়কট করা হইল। রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহযোগীগণ ধর্মীয় ভেদাভেদ না করিয়া তাঁহার সঙ্গ দান করিলেন। তাহারা গাছের পাতা এবং ঘাযের শিকর খাইয়া জীবন ধারণ করিল। এই সময় নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করারও অনুমতি দান করেন।

শব্দার্থঃ

ترقى - উন্নতি, অগ্রগতি, উন্নয়ন। مقاطعه - কর্তন, কাটা, সম্পর্কচ্ছেদ করা, পৃথক করিয়া দেওয়া, বয়কট করা। بےنظیر - অদ্বিতীয়, উপমাহীন, তুলনাহীন, বেনজীর। دهاك - প্রসিদ্ধি, খ্যাতি, ভয়, জাঁকজমক, প্রভাব-প্রতিপত্তি, শান-শওকত। جرى - নির্ভীক, সাহসী, বাহাদুর, যে কাহাকেও ভয় করে না এমন। شجاع - সাহসী, বীরত্বপূর্ণ। توقع - আশা, প্রত্যাশা, ভরসা, বিশ্বাস। بےاختیار - অনিচ্ছাকৃত, নিজে নিজে, হঠাৎ, সহসা, অপারগতা, অনেক বেশী। وجه - কারণ, যুক্তি, পদ্ধতি, তরীকা, ঢং, দলীল। سهم - ডর, ভয়। فوری طور پر - তাৎক্ষণিকভাবে, সঙ্গে সঙ্গে, অনতিবিলম্বে। فنا - ধ্বংস, বরবাদ, নিঃশেষ, মৃত্যু। شکل - ছুরত, আকৃতি, ধরন, প্রকরণ, নকশা। مطالبه - দাবী, অধিকার, নালিশ, নিজের হক চাওয়া, তাগাদা করা। حمايت - সহযোগিতা, পৃষ্ঠপোষকতা, রক্ষণ। بندش - বন্ধন, গ্রন্থি, অপবাদ, অবরোধ, পরিকল্পনা, ষড়যন্ত্র। معاهده - চুক্তি, সন্ধি, মৈত্রী। محاصره - অবরোধ, বেষ্টন, চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া রাখা। تهيه - ব্যবস্থা, আয়োজন, প্রস্তুতি, বিন্যাস, ছামান।

আবিসিনিয়ার দ্বিতীয় হিজরত এবং বয়কট বা অবরোধের অবশিষ্ট অবস্থা

প্রশ্ন ঃ আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরত কবে হইয়াছে, উহার নাম কি এবং এই হিজরতে কতজন মানুষ অংশগ্রহণ করিয়া ছিলেন?

উত্তর ঃ এই হিজরতের ঘটনা নবুওয়্যতের সপ্তম বছর অনুষ্ঠিত হয় এবং এই বছরই বয়কট শুরু হয়। এই হিজরতকে আবিসিনিয়ার দ্বিতীয় হিজরত বলা হয়। ইহাতে ৮৩ জন পুরুষ এবং ১৮ জন মহিলা ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইয়ামানের আবু মুসা আশআরীর কওমের কতিপয় ব্যক্তিকেও তাহাদের সঙ্গে শামিল করা হইয়াছিল।

প্রশ্ন ঃ এই অবরোধ কত বছর স্থায়ী ছিল এবং কোন্ বছর উহা শেষ হয়?

উত্তর ঃ এই অবরোধ বরাবর তিন বছর স্থায়ী ছিল এবং নবুওয়্যতের দশম বছর ইহার সমাপ্তি ঘটে। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল পঞ্চাশ।

প্রশ্ন ঃ কেমন করিয়া এই বয়কট বা অবরোধের অবসান ঘটিল?

উত্তর ঃ কোরাইশ কাফেরগণ যখন দেখিল যে, তাহাদের চরম নির্যাতনও ব্যর্থ হইতেছে, ইসলামের পায়ে বেড়ী লাগানো যাইতেছে না এবং আল্লাহর আওয়াজকে প্রতিরোধ করা যাইতেছে না; বরং মুসলমানদের উপর নির্যাতনের বিষয়টি ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তখন তাহারা আশঙ্কা বোধ করিল যে,

আরবের সাধারণ মানুষের অন্তরে যদি আমাদের (কাফেরদের) ব্যাপারে ঘৃণা বসিয়া যায় তবে সেই ক্ষেত্রে ইসলামের উন্নতি হইবে এবং আমাদের ইজ্জত-সম্মান হ্রাস পাইতে থাকিবে। এই পর্যায়ে খোদ কোরাইশের কয়েকজন কাফের বয়কটের বিরুদ্ধে সোচ্চার হইতে শুরু করিল।

ঘটনাক্রমে এই সময় বয়কটের সেই চুক্তিনামার অক্ষরগুলি উঁইপোকায় খাইয়া ফেলিয়াছিল, যাহা বয়কট করার সময় লেখা হইয়াছিল। অবশেষে নবুওয়্যতের দশম বছর এই অবৈধ অবরোধের অবসান ঘটিল।

প্রশ্ন ঃ রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বছরের কি নাম রাখিলেন?

উত্তর ঃ শোকের বছর।

প্রশ্ন ঃ কি কারণে এই বছরকে "শোকের বছর" বলা হইয়াছিল?

উত্তর ঃ এই কারণে যে, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহানুভূতিশীলা, প্রাণোৎসর্গী ও সারা জীবনের সমবেদনাশীলা স্ত্রী হযরত খাদিজা (রাঃ) এই বছর ইন্তেকাল করেন, যিনি নিজের জীবনের সকল আরাম-আয়েশ ও ধন-সম্পদ ইসলামের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন এবং সমস্ত আপদ-বিপদে অত্যন্ত সহানুভূতি ও দরদের সহিত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ দান করিতেন। তা ছাড়া ঐ বছরই হুজুরের চাচা আবু তালেবও ইন্তেকাল করেন। তিনি যদিও কাফের হালাতেই মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, কিন্তু এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সহযোগিতায় তিনি কোন ত্রুটি করেন নাই। অবরোধের সময়ও বরাবর তিন বছর হুজুরের সঙ্গেই ছিলেন। কাফেররা যেহেতু তাহাকে সমীহ করিয়া চলিত, এই কারণেই অধিকাংশ মানুষ রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রকাশ্যে কষ্ট দিতে পারিত না, একটু তোয়াক্কা করিয়াই চলিত।

প্রশ্ন ঃ হযরত খাদিজার ইন্তেকাল আগে হইয়াছিল, না আবু তালেবের এবং তাহাদের ইন্তেকালে কত দিনের ব্যবধান ছিল?

উত্তর ঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচার ইন্তেকালের তিন দিন পর হযরত খাদিজা ইন্তেকাল করেন।

প্রশ্ন ঃ হযরত খাদিজা (রাঃ) কোন্ মাসে ইন্তেকাল করেন? তাঁহাকে কোথায় দাফন করা হয় এবং অবরোধের পরে এই ঘটনা ঘটে, না আগে?

উত্তর ঃ হযরত খাদিজা (রাঃ) রমজান শরীফে ইন্তেকাল করেন এবং হাজুন নামক স্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়। আর অবরোধ হইতে মুক্তির কিছু দিন পর এই ঘটনা ঘটে।

প্রশ্ন ঃ কাফেরদের নির্যাতনের পাশাপাশি আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কি প্রকারে সান্ত্বনা দেওয়া হইল এবং তাঁহার জন্য কি কি পুরস্কার নাজিল হইল?

উত্তর ঃ এই সময়ই রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেরাজের সম্পদ দান করা হয়। ইহা এমন এক সম্পদ যাহা ঐ সময় পর্যন্ত গোটা পৃথিবীর সৃষ্টিকুলের মধ্যে না অপর কাহাকেও দান করা হইয়াছে, না ভবিষ্যতে দান করা হইবে।

মেরাজ উপলক্ষেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমস্ত আম্বিয়াগণের ইমাম বানানো হয় এবং সশরীরে বা দেহ মোবারক সহই এমনসব স্থানে পৌছানো হয় যে, আল্লাহ পাকের অপর কোন বান্দা রূহানীভাবেও সেই সকল স্থানে পৌছাইতে পারে নাই এবং পারিবেও না।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেরাজ শরীফের পূর্বে পৃথিবী শুধু এই কথা শুনিত যে, জান্নাত-জাহান্নাম আছে এবং পরকালের সকল লেন-দেন সত্য। কিন্তু কোন মানুষ না দোজখ-বেহেস্ত দেখিয়াছিল, না আখেরাতের ছাওয়াব ও আজাব দেখিয়াছিল। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জান্নাত-জাহান্নাম ভ্রমণ করাইয়া এবং আখেরাতের আজাব ও ছাওয়াবের দৃশ্য দেখাইয়া পৃথিবীকে উহার একজন প্রত্যক্ষদর্শী ও সত্য সাক্ষী দান করা হইল।

মেরাজ উপলক্ষেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীদের উপর আল্লাহর ছালাম নাজিল হয় এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ দান করা হয়। এই সংক্ষিপ্ত এবাদতের মাধ্যমেই বান্দা আহ্‌কামুল হাকেমীনের সঙ্গে কথা বলে।

প্রশ্ন ঃ আবু তালেব কেন মুসলমান হন নাই?

উত্তর ঃ নাসিকা কর্তন হওয়া (মানক্ষুণ্ন হওয়া) এবং বংশ ও জাতির তিরস্কারের ভয় মানুষকে হাজারো নেয়মত হইতে বঞ্চিত করিয়া দেয়। মুমূর্ষু অবস্থায়ও যখন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে কালেমা পাঠ করিতে বলিলেন, তখন তিনি তাঁহার সত্যতা সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও এই জবাব দিলেন যে, খান্দানের লোকেরা আমাকে এই বলিয়া তিরস্কার করিবে যে,

এমন বৃদ্ধ মানুষও বাপদাদার ধর্ম ত্যাগ করিয়া স্বীয় পালিত বালকের ধর্মে প্রবেশ করিল।

যাহারা দুনিয়ার রুছম মানিয়া চলাকে আবশ্যক মনে করে, তাহারা যেন আবু তালেবের ঘটনা স্মরণ রাখে এবং এই কথা চিন্তা করে যে, খান্দান ও সমাজের ভয় মানুষকে কেমন করিয়া বেহেস্তের নেয়মত হইতে বঞ্চিত করিয়া দেয়।

প্রশ্ন ঃ আবু তালেব কত বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন এবং তিনি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কত বছর বড় ছিলেন?

উত্তর ঃ আবু তালেব হুজুরের ৩৫ বছর বড় ছিলেন। সেই হিসাবে তিনি ৮৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

প্রশ্ন ঃ হযরত খাদিজা (রাঃ) ইন্তেকালের সময় কয়জন সন্তান রাখিয়া যান?

উত্তর ঃ চার কন্যা এবং প্রথম স্বামীর পক্ষের এক ছেলে। ঐ ছেলের নাম ছিল হিন্দ।

প্রশ্ন ঃ কন্যাদের মধ্যে কার কার বিবাহ হইয়াছিল?

উত্তর ঃ হযরত জয়নব ও হযরত রোকাইয়া (রাঃ)-এর বিবাহ হইয়াছিল। অপর দুই কন্যা হররত ফাতেমা ও উম্মে কুলছুম (রাঃ) কুমারী ছিলেন।

প্রশ্ন ঃ হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পর রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই কন্যার দেখাশোনা এবং তাহাদের প্রতিপালনের কি ব্যবস্থা করিলেন?

উত্তর ঃ কিছুদিন পর্যন্ত তিনি নিজেই লক্ষ্য রাখিতেছিলেন। কিন্তু উহাতে

ইসলামের প্রচারকার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি হইতেছিল। এদিকে আল্লাহ পাকের এই হুকুম ছিল যে, আল্লাহ পাকের বিধান সমূহ নির্বিঘ্নে ও প্রকাশ্যে মানুষকে শোনাইতে থাকুন, অপর দিকে কাফেরদের ক্রমবর্ধমান শত্রুতার কারণে এই আশঙ্কা ছিল যে, সুযোগ পাইয়া তাহারা বাল–বাচ্চাদিগকে শত্রুতার শিকার বানাইয়া না ফেলে। সুতরাং তিনি একজন বিধবা মহিলাকে বিবাহ করিলেন। তাহার সম্মানিত নাম ছিল হযরত সাওদা (রাঃ)।

প্রশ্ন ঃ আবু তালেবের ওফাতের পর কোরাইশরা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কি আচরণ করিল?

উত্তর ঃ কোরাইশদের সম্মুখে অল্প–বিস্তর যাহাকিছু প্রতিবন্ধক ছিল আবু তালেবের ইন্তেকালের পর উহাও উঠিয়া গেল। এখন তাহারা রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে একেবারেই স্বাধীন হইয়া গেল।

প্রশ্ন ঃ এই সময় নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবলীগ বা দ্বীন প্রচারের কি পন্থা অবলম্বন করিলেন?

উত্তর ঃ মক্কার মানুষদের মধ্যে যখন তিনি কোন ফল দেখিতে পাইলেন না, তখন মনে করিলেন, পার্শ্ববর্তী অপর কোন জনপদে কাজ করিলে হয়ত কিছু ফল হইতে পারে। অতএব, তিনি তায়েফ তাশরীফ লইয়া গেলেন এবং তথাকার লোকজনকে বুঝাইতে শুরু করিলেন। কিন্তু ঐ হতভাগ্যরা মক্কাবাসীদের তুলনায় রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরো বেশী কষ্ট দিল।

একদিন দুর্বৃত্তদিগকে ইশারা করিয়া দেওয়া হইল। তাহারা

ঝোলার মধ্যে পাথর লইয়া বাজারের দুই পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিকে যাইতেন তাঁহার উপর পাথর বর্ষণ করিত। উহার ফলে তাঁহার দেহ মোবারক যেন রক্তে গোসল হইয়া গিয়াছিল। উভয় জুতার ভিতর রক্ত পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এই পর্যায়ে বার বার তাঁহার মাথায় চক্কর আসিতে লাগিল এবং আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় বান্দা মাটিতে বসিয়া পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ হতভাগ্যরা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই বাহু ধরিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়া পুনরায় ঐভাবে বেআদবী করিত। অবশেষে পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাধ্য হইয়া মক্কায় ফেরত চলিয়া আসিলেন।

প্রশ্ন ঃ এই ছফরে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কে ছিলেন এবং তিনি কতদিন তায়েফ অবস্থান করেন?

উত্তর ঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফে এক মাস অবস্থান করেন এবং হযরত জায়েদ বিন হারেছাহ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

প্রশ্ন ঃ এই মুসীবতের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর জাহেরীভাবে কি অনুগ্রহ করিলেন?

উত্তর ঃ তায়েফ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নাখলা নামক স্থানে ফজরের নামাজ পড়িতেছিলেন তখন জ্বীন সম্প্রদায় তাঁহার তেলাওয়াত শুনিয়া ইসলাম গ্রহণ করিল।

এদিকে পাহাড়ের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেস্তা হুজুরের নিকট

আসিয়া আরজ করিল, হে আল্লাহর রাসূল! যদি অনুমতি করেন তবে আল্লাহর হুকুমে ঐ সমস্ত বেআদবদিগকে দুই পাহাড়ের মধ্যখানে আনিয়া ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবাব ছিল এই–

কস্মিনকালেও এইরূপ করিবে না। যদিও তাহারা ঈমান আনে নাই; কিন্তু সম্ভাবনা আছে, তাহাদের বংশধরদের মধ্যে হয়ত কেহ ঈমান আনিতে পারে। কিন্তু আল্লাহ পাক খুব শীঘ্রই তাহাদের সকলকে ঈমান আনার তাওফীক দান করিলেন।

সারাংশ

নবুওয়্যতের সপ্তম বছর আনুমানিক একশত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার হিজরত করিয়া আবিসিনিয়া চলিয়া গেলেন। তাহাদের মধ্যে ৮৩ জন ছিল মক্কার এবং কিছু ছিল ইয়ামানের অধিবাসী। ঐ বছর মোহররম মাসে রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সামাজিক বয়কট শুরু হয়। ঐ বয়কট বরাবর তিন বছর স্থায়ী ছিল।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার সহযোগীগণ ক্ষুৎপিপাসাসহ হাজারো কিসিমের মুসীবত ও পেরেশানী বরদাস্ত করেন। শিশুরা ক্ষুধার তাড়নায় চিৎকার করিত এবং বড়রা গাছের পাতা ও শিকড় খাইয়া জীবন ধারণ করিত। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন পঞ্চাশ বছর হয় তখন ঐ অবরোধ বা বয়কট তিন বছর স্থায়ী থাকার পর শেষ হয়। কিন্তু অবরোধ হইতে মুক্ত হওয়ার অল্প কিছুদিন পর আবু তালেব এবং উহার তিন দিন পর হযরত খাদিজা (রাঃ) ইন্তেকাল করেন। এই কারণেই তিনি ঐ বছরের নাম রাখেন শোকের বছর।

এই অবরোধের জমানাতেই রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেরাজ দান করা হয়। আবু তালেব ৮৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। এদিকে হযরত খাদিজা (রাঃ) চার কন্যা এবং প্রথম স্বামীর পক্ষের 'হিন্দ' নামে এক ছেলে রাখিয়া যান। কন্যাদের মধ্যে দুই জনের বিবাহ হইয়াছিল। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপর দুই কন্যার দেখাশোনা এবং খেদমতের উদ্দেশ্যে হযরত সাওদাকে বিবাহ করেন। হযরত সাওদা (রাঃ) ছিলেন একজন বিধবা মুসলিম রমণী। অতঃপর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে তায়েফ গমন করেন। কিন্তু সেখানে তাঁহাকে বহু কষ্ট–মুসীবত বরদাস্ত করিতে হয়।

শব্দার্থঃ

انتہائی – চূড়ান্ত, "যার পর নাই"। دیمك – উঁই পোকা, সাদা পিপিলিকাবিশেষ। بالآخر – শেষ পর্যন্ত, অবশেষে, শেষ পর্যায়ে। ثروت – ধন–সম্পদ, প্রাচুর্য, অর্থ–বিত্ত, সামর্থ্য, প্রভাব। ستانا – অত্যাচার করা, কষ্ট দেওয়া, বিরক্ত করা, জ্বালাতন করা। فاصلہ – দুরত্ব, ব্যবধান, স্থান, মধ্যবর্তী স্থান বা কাল, ময়দান, মাঠ। رہائی – মুক্তি, অব্যাহতি, পরিত্রাণ। معراج – সিঁড়ি, সোপান, উপরে আরোহণ, আরোহনের মাধ্যম, উচ্চ মর্যাদা, এমন সম্মান ও মর্যাদা যাহার অধিক কল্পনাও করা যায় না। হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঊর্ধ্বাকাশ ভ্রমণ এবং জান্নাত–জাহান্নাম ও আল্লাহর নূর দর্শন। محض – শুধু, কেবল, মাত্র, সম্পূর্ণ, খাঁটি। نام لیوا – সন্তান, উত্তরাধিকারী, স্মরণকারী, নাম লইয়া গর্ববোধকারী (এখানে "অনুসারী")। طعن – ঠাট্টা, বিদ্রূপ, তিরস্কার, ভর্ৎসনা। حرج – ক্ষতি, সংকীর্ণতা, কঠোরতা। بے دھڑك – নির্ভয়, নির্ভাবনা, নির্বিঘ্ন, বাহাদুর, বিনা কষ্টে, নির্বাক, ঐ ব্যক্তি যে কথা বলিতে পারে না। ڈنکے کي چوٹ کہنا –

ঘোষনা করা, প্রকাশ্যে বলা, সাফ সাফ বলিয়া দেওয়া। رکاوت- বাধা, প্রতিবন্ধক, আটকানো, বিলম্ব। اثر- ক্রিয়া, ফল, চিহ্ন, কার্যকারীতা, ইঙ্গিত, ধারণা। آبادی- বসতি, জনপদ, লোকালয়, বস্তি, জনসংখ্যা, আরাম, সুখ, শান্তি, উজালা, আলো। تباہ- ধ্বংস, বরবাদ, বিধ্বস্ত, উজার, খারাপ, মন্দ, দুস্কর্ম। پنچایتی- পঞ্চায়েতকর্তৃক নির্ধারিত, সমস্ত খান্দানের, সকলের, যৌথ অংশিদারীত্বের (এখানে সামাজিক)। نگرانی- দেখাশোনা, পর্যবেক্ষণ, পাহারা, হেফাজত, ব্যবস্থা।

।। প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ।।

তারীখুল ইসলাম

দ্বিতীয় খণ্ড

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

মাদানী জীবন

মূল উর্দূ

হযরত মওলানা সৈয়্যদ মোহাম্মদ মিয়া (ভারত)

অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ খালেদ

আশরাফিয়া লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা-১২১১

তারীখুল ইসলাম

মূল উর্দূঃ হযরত মওলানা সৈয়্যদ মোহাম্মদ মিয়া (ভারত)

অনুবাদঃ মোহাম্মদ খালেদ

প্রকাশক ঃ

মোহাম্মদ ইউসুফ

আশরাফিয়া লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা- ১২১১

২য় সংস্করণঃ ২,০০২ ইং

সম্পাদনায় ঃ মোহাম্মদ ইউসুফ

প্রচ্ছদঃ বশীর মেসবাহ

মূল্য ঃ সাদা ঃ ৪০.০০ টাকা মাত্র।

TARIKHUL ISLAM : written by Hazrat Maulana sayd Mohammad Mya in urdu, translated by Mohammad Khaled in to bengali and published by Asrafia library. Chawk bazar, Dhaka, Bangladesh.

Price: Tk 40.00

অনুবাদকের আরজ

আলহামদুলিল্লাহ! গত বৎসর এই মৌসুমে উর্দু তারীখুল ইসলামের প্রথম খণ্ডের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ হইয়া পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হওয়ার পর এক্ষণে উহার দ্বিতীয় খণ্ডের বঙ্গানুবাদও পাঠকদের হাতে তুলিয়া দিতে পারিয়া আমরা আল্লাহর দরবারে অশেষ শোকর আদায় করিতেছি।

প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের উপযোগী ইসলামী ইতিহাসের মৌলিক বিষয়ের উপর রচিত এই কিতাবটির পরিচয় নূতন করিয়া দেওয়ার কোন আবশ্যক নাই। প্রায় অর্ধশত বৎসরেরও অধিককাল যাবৎ উপমহাদেশের অধিকাংশ কওমী মাদ্রাসাসমূহ এবং সাধারণ পাঠক মহলে ইহা ব্যাপকভাবে পঠিত হইতেছে।

ঢাকার প্রাচীনতম ইসলামী প্রকাশনা সংস্থা আশরাফিয়া লাইব্রেরীর উদ্যমী প্রকাশক মোহ্‌তারাম মাওলানা ইউসুফ সাহেব এই মূল্যবাণ কিতাবটির প্রথম বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া ইতিমধ্যেই বাংলাভাষী পাঠক মহলের ভূয়সী প্রশংসা কুড়াইতে সক্ষম হইয়াছেন।

অনুবাদ কতটা সফল হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিবেন পাঠক মহল। আমি শুধু আরজ করিব, আমার অযোগ্যতা ও অসতর্কতার কারণে যদি কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি হইয়া থাকে তবে উহা সংশোধনার্থ যেন আমাকে অবহিত করা হয়। আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলের মেহনতকে কবুল করুন এবং কিতাবটিকে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য নাজাতের উছিলা করিয়া দিন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

বিনীত

মোহাম্মদ খালেদ

কুমিল্লা পাড়া, কামরাঙ্গীর চর

আশরাফাবাদ , ঢাকা- ১৩১০

অনুবাদকের অন্যান্য বই

- ✯ বিশ্ব নবীর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনশত মোজেযা
- ✯ সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
- ✯ ওসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
- ✯ খাতামুন্নাবিয়্যীন (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
- ✯ আউলিয়া কেরামের হাজার ঘটনা (দুই খণ্ড)
- ✯ হাফেজ্জী হুজুর জীবনের ধাপে ধাপে
- ✯ তারীখুল ইসলাম (১ খণ্ড)
- ✯ মেসওয়াকের ফজিলত
- ✯ ফাজায়েলে কোরআন
- ✯ আদর্শ মুসলিম নারী
- ✯ আহকামে মাইয়্যেত
- ✯ আশ্রাফুল জওয়ায়াব
- ✯ জামালুল ফোরকান
- ✯ হাশরের ময়দান
- ✯ মোনাব্বেহাত
- ✯ উম্মতের ঐক্য
- ✯ মৃত্যুর স্মরণ
- ✯ বেহেশত
- ✯ ত়ওবা

ইসলামী প্রকাশনা জগতের

অন্যতম পথিকৃত

ঢাকা আশরাফিয়া লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা,

মরহুম মওলানা আব্দুল আজীজ সাহেবের

রূহের মাগফেরাত কামনায়।

--- অনুবাদক।

সূচীপত্র

بسـم الله الرحـمن الرحيـم

الـحمـد لله ربـنا و رب الحـق - و الصـلوة علـى رسـوله الذى خلـق له الحق و على اله و اصحابه الذى هم خيـر الحـق

পবিত্র মদীনায় ইসলাম

প্রশ্ন ঃ মদীনায় ইসলামের প্রচলন কেমন করিয়া শুরু হয়?

উত্তর ঃ হজ্ব ইত্যাদির সুযোগে গোটা আরবের লোকেরা পবিত্র মক্কায় আসিয়া সমবেত হইত। এই সময় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নিকট দ্বীন প্রচার করিতেন। কিন্তু তাহারা এই কথা বলিয়া ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিত যে, আগে নিজের কওমকে মুসলমান বানাইয়া আসুন।

নবুওয়্যতের দশম বৎসর আল্লাহর রহমত হজ্বের বিশাল সমাবেশ হইতে অল্প কয়েক জনের অন্তর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাবলীগের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া দিল। তাঁহার দরদপূর্ণ ও সহানুভূতিসুলভ ওয়াজ তাহাদের অন্তরে স্থান করিয়া লইল এবং (আল্লাহর অশেষ) রহমতের শীতল বায়ু তাহাদের মধ্য হইতে দুই জনকে পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরাগী বানাইয়া দিল।

প্রশ্ন ঃ যে কোন বিষয়েরই কোন বাহ্যিক কারণ থাকে। ঐ বৎসর মদীনাবাসীদের তাওয়াজ্জুহ (বা তাহাদের অন্তর ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট) হওয়ার কোন কারণ থাকিলে উহা বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ (১) নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ এবং আভ্যন্তরিণ বিপর্যয়ের কারণেও মুক্তির কোন পথ সন্ধান করার প্রেরণা যোগাইতেছিল।

(২) মদীনাতে যেই ইহুদী সম্প্রদায় বসবাস করিত তাহারা নিজেদের ধর্মীয় গ্রন্থ অনুযায়ী এই সংবাদ প্রচার করিতেছিল যে, শীঘ্রই শেষ জমানার পয়গম্বর জন্মগ্রহণ করিবেন এবং আমরা তাঁহার অনুসরণ করিয়া সকলের উপর জয়ী হইব। পরে মদীনাবাসীরা যখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (প্রচারিত) কথা শুনিল এবং তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ সততা দেখিতে পাইল, তখন তাহারা পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া লইল যে, ইনিই সেই নবী। অতঃপর তাহারা এইরূপ চেষ্টা করিল, যেন সকলের আগে এই সম্পদ হাসিল করিয়া ইহুদীদের উপর জয়ী হইতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ঐ দুই ব্যক্তির নাম কি ছিল?

উত্তর ঃ (১) আসআ'দ বিন জারারাহ এবং (২) জাক্ওয়ান বিন আব্দে ক্বায়েস (রাঃ)।

প্রশ্ন ঃ ঐ দুই ব্যক্তি কোন গোত্রের ছিল?

উত্তর ঃ আউস গোত্রের।

প্রশ্ন ঃ ঐ দুই বুজুর্গ মুসলমান হইয়া কি করিলেন?

উত্তর ঃ প্রতিটি মুসলমানের উপর যাহা ফরজ উহা তাহারা পরিপূর্ণরূপে আদায় করিলেন। অর্থাৎ মিথ্যা লজ্জা-সম্মান এবং আত্মীয়তা, খান্দান ও বংশের ভয় ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় হইতে বে-পরওয়া ও নির্ভর হইয়া ইসলামের তাবলীগ ও প্রচার বড় জোরেশোরে শুরু করিলেন এবং সকল প্রকার মুসীবতকে অত্যন্ত বীরত্বের সহিত বরদাশ্ত করিলেন।

প্রশ্ন ঃ তাহাদের চেষ্টার ফলাফল কি হইল এবং উহার প্রথম বহিঃপ্রকাশ কি ছিল?

উত্তর ঃ এক বৎসর অতিক্রম না হইতেই সত্যের আলো তাহাদের অন্তরে উজালা পয়দা করিতে শুরু করিল। আল্লাহ পাকের অশেষ রহমত ছিল যে, ঐ দুই বুজুর্গের চেষ্টায় পরবর্তী বৎসর এই (হজ্বের) সুযোগে

মদীনার লোকেরা আসিয়া হাজির হইল এবং তাহাদের মধ্য হইতে ছয় বা আট ব্যক্তি প্রকাশ্যে মুসলমান হইয়া গেল।

প্রশ্ন ঃ যেই সকল ব্যক্তি মুসলমান হইলেন তাহাদের চেষ্টায় পরবর্তী বৎসর কি ফলাফল প্রকাশ হইল?

উত্তর ঃ তৃতীয় বৎসর মদীনার বারজন ব্যক্তি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া বাইআত গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করিল।

প্রশ্ন ঃ বাইআত অর্থ কি?

উত্তর ঃ বাইআত অর্থ অঙ্গীকার করা। উহার আসল অর্থ হইল বিক্রয় করিয়া দেওয়া। অর্থাৎ বাইআত গ্রহণকারী যাহার হাতে বাইআত হইতেছে তাহার হাতে যেন নিজেকে বিক্রয় করিয়া দিতেছে।

প্রশ্ন ঃ এই বাইআতের নাম কি এবং এই নাম কেন রাখা হইয়াছে?

উত্তর ঃ এই বাইআতকে বাইআতে "আকাবায়ে উলা" বলা হয়। বাইআতের অর্থ পূর্বেই জানা হইয়াছে। আকাবা অর্থ পাহাড়ের উপত্যকা, আর উলা অর্থ প্রথম। যেহেতু একটি বিশেষ উপত্যকার নিকট সর্বপ্রথম এই বাইআত হইয়াছিল, এই কারণেই এই বাইআতকে "বাইআতে আকাবায়ে উলা" বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ এই বারজন মানুষ কোন্ কোন্ গোত্রের ছিল বিস্তারিত বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ দশজন আউস গোত্রের এবং দুইজন খাযরাজ গোত্রের।

প্রশ্ন ঃ ঐ বাইআতে কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছিল?

উত্তর ঃ এই সকল বিষয়ের– (১) সুখ-দুঃখ, অভাব-ঐশ্বর্য, অর্থাৎ– সকল অবস্থাতেই রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম মান্য

করিব। (২) ভাল বিষয় প্রচার করিব এবং মন্দ বিষয় হইতে মানুষকে বিরত রাখিব। (৩) আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কাহারো অন্যায়-অসন্তোষ কিংবা তিরস্কারের পরওয়া করিব না। (৪) যেইভাবে নিজের স্ত্রী, বালবাচ্চা ও নিজের জীবনের হেফাজত করা হয়, অনুরূপভাবে যখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করিবেন, তখন তাঁহার হেফাজত করিব।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে এই সকল মুসীবতের কি বিনিময় নির্ধারণ করা হইল?

উত্তর ঃ জান্নাত।

প্রশ্ন ঃ ঐসকল ব্যক্তিবর্গকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কাহাকে কাহাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল?

উত্তর ঃ হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) এবং হযরত মাস্‌আব বিন উমায়ের (রাঃ)-কে।

প্রশ্ন ঃ মদীনায় আগমনকারীদের ক্রমিক বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ প্রথমে এই দুই হযরত (অর্থাৎ হযরত উম্মে মাকতুম রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত মাস্‌আব বিন ওমায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু) পরে হযরত আম্মার (রাঃ), হযরত বেলাল (রাঃ) এবং হযরত ছাআদ (রাঃ)। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) বিশজন মানুষ সঙ্গে লইয়া এবং সবশেষে সারওয়ারে কায়েনাত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

প্রশ্ন ঃ চতুর্থ বর্ষে নূতন ও পুরাতন মুসলমানদের তাবলীগের ফলাফল কি হইল?

উত্তর ঃ মদীনাবাসীদের ৭৩ সংখ্যার একটি বড় জামায়াত এই সুযোগে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া ভাগ্যবান হইল এবং ইসলাম কবুল করিল।

প্রশ্ন ঃ এই ঘটনার নাম কি এবং এই নাম কেন রাখা হয়?

উত্তর ঃ এই ঘটনার নাম "বাইআতে আকাবায়ে ছানিয়া"। কারণ একটি বিশেষ উপত্যকার নিকটে এই দ্বিতীয় বাইআত (অনুষ্ঠিত) হইয়াছিল। ছানিয়া অর্থ দ্বিতীয়।

প্রশ্ন ঃ এই বাইআত নবুওয়্যতের কোন্ বৎসরে হইয়াছিল?

উত্তর ঃ ত্রয়োদশ বৎসরে।

প্রশ্ন ঃ এই বাইআতে কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর অঙ্গীকার হইয়াছিল?

উত্তর ঃ এই সকল বিষয়ের উপর– (১) শিরক্, চুরি এবং ব্যভিচার হইতে বাঁচিয়া থাকিব। (২) সন্তান হত্যার অপরাধে জড়িত হইব না। (৩) রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা বলিবেন, উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইব না। (৪) এবং নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানাদির মত সারওয়ারে কায়েনাত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেফাজত করিব

সারাংশ

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্বের মত সমাবেশগুলিতে তাবলীগ বা দ্বীন প্রচার করিতেন। নবুওয়্যতের দশম বর্ষে মদীনার দুই ব্যক্তি এই তাবলীগের ছেলছেলায় মুসলমান হন। একাদশ বর্ষে ৬ বা ৮ জন এবং দ্বাদশ বর্ষে ১২ জন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিয়া সৌভাগ্যবান হন। উহার নাম রাখা হয় "বাইআতে আকাবায়ে উলা"। অতঃপর নবুওয়্যতের ত্রয়োদশ বর্ষে অর্থাৎ চতুর্থ বারে ৭৩ জন মানুষ বাইআত গ্রহণ করেন। এই বাইআতের নাম রাখা হয় "বাইআতে আকাবায়ে ছানিয়া"।

শব্দার্থ ঃ

(মূল উর্দূ কিতাবের পাঠকদের জন্য)

سلسلہ – শিকল, শৃঙ্খল, পরম্পরা, পুরুষ-পরম্পরা, কাতার, লাইন, খান্দান,

বংশ, বিন্যাস. মাধ্যম, সম্পর্ক, প্রচলন। درد آمیز ব্যথা মিশ্রিত. বেদনার্ত, দরদপূর্ণ। مشفقانه – বন্ধুসুলভ. বন্ধুভাবে, সহানুভূতিসুলভ। نسیم رحمت – রহমতের শীতল বায়ু। متوالا – উন্মত্ত, অনুরাগী, কোন বিষয়ে গভীর ভাবাবেগে আকৃষ্ট হওয়া। باهمی – পরস্পর। اندرونی – ভিতরের, মধ্যের, আভ্যন্তরীণ। قبیله – গোত্র, গোষ্ঠি, সম্প্রদায়, উপজাতি, পরিবার। رشته ناته – মিলমিশ, সম্পর্ক, আত্মীয়তা, নৈকট্য। مردانه وار – পুরুষের মত, বাহাদুরের মত, বীরত্বের সহিত। تنگدستی – দারিদ্র্য, অভাব, দৈন্যদশা। فراخی – প্রাচুর্য, ঐশ্বর্য, বৃহত্ত্ব, প্রশস্ততা, স্বচ্ছলতা। رنجش – অসন্তুষ্টি, দুঃখ। زیارت – দর্শন, সাক্ষাত, কোন পুণ্যভূমি কিংবা কোন মহান ব্যক্তির কবর বা আস্তানা দর্শন।

মাতৃভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন

মক্কা হইতে হিজরত ও মদীনার দিকে যাত্রা

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কারণে মক্কা মোয়াজ্জমা হইতে হিজরত করিলেন?

উত্তর ঃ কেননা, ১৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা এই কথা বলিয়া দিয়াছিল যে, মক্কা মোয়াজ্জমায় অবস্থান করিয়া ইসলাম প্রচারে সাফল্য অর্জন দুষ্কর হইবে। আর ইসলামের উন্নতির একমাত্র পথ হইল মক্কা হইতে হিজরত করা।

প্রশ্ন ঃ মক্কা হইতে যাত্রা এবং ছফরের অবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

উত্তর ঃ আল্লাহ পাকের হুকুম অনুযায়ী রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে ছাহাবায়ে কেরামকে গোপনে রওনা হওয়ার হুকুম করিলেন। এক-দুই জন করিয়া সকলেই হিজরত করিলেন (এবং সবশেষে)

কেবল রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর ছিদ্দিক ও হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুমা এবং সেই সকল দুর্বল ব্যক্তি যাহারা হিজরত করিতে অক্ষম ছিলেন তাহারা রহিয়া গেলেন।

মক্কার কাফেররা যখন (এই হিজরতের কথা) জানিতে পারিল, তখন সঙ্গে সঙ্গে "দারুন্নাদ্ওয়া" (পরামর্শকক্ষ অর্থাৎ, যেই স্থানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ হইত উহা)-তে মক্কার বড় বড় সরদারদের সভা হইল। আবু জাহেলের প্রস্তাব অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হইল যে, আজ রাতেই রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শহীদ করিয়া ইসলামের বিবাদ শেষ করিয়া দেওয়া হউক। সিদ্ধান্ত হইল যে, সকল গোত্র হইতে এক এক ব্যক্তি গোটা গোত্রের পক্ষ হইতে এই হাঙ্গামায় (এই কাজে) অংশ লইবে। যেন পরে কোন গোত্রের পক্ষ হইতে প্রতিবাদ কিংবা বদলা গ্রহণের সুযোগ না থাকে।

আল্লাহ পাকের হুকুম অনুযায়ী রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ রাতেই হিজরতের ইচ্ছা করিলেন। ছিদ্দিকে আকবর হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহার সঙ্গে যাওয়ার আশায় অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং পূর্ব হইতেই পথ প্রদর্শক এবং দুইটি উট্নী ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছিল।

রাতের অন্ধকার (নামার) সঙ্গে সঙ্গে কাফের যুবকদের দল নবুওয়্যত-গৃহের চতুর্দিকে আত্মগোপন করিয়া বসিয়া রহিল যে, শেষ রাতের নির্জনতায় রেসালাতের আওয়াজকে চিরতরে স্তব্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। (রাতের) এই অন্ধকারের মাঝামাঝি সময়ে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহ হইতে বাহির হওয়ার এরাদা করিলেন এবং হযরত আলী (রাঃ)-কে তাঁহার বিছানায় চাদর মোড়া দিয়া শুইয়া থাকিতে হুকুম করিলেন, যেন তাঁহার অবর্তমানের কথা কেহ জানিতে না পারে।

ইসলামের জন্য আত্মত্যাগের কি চমৎকার দৃষ্টান্ত। একটি অল্পবয়স্ক যুবক, যার পার্থিব জীবনের অনেক কিছুরই বাসনা হইতে পারে এবং যার

অন্তর হাজারো আশা-আকাংখার দোলনা হইয়া থাকে; সে তাহার আধ্যাত্মিক মনীবের হুকুমে নির্দ্বিধায় তাঁহার বিছানায় শয্যা গ্রহণ করিতেছে; যেই বিছানা সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, সকাল হওয়ার পূর্বেই উহা এক বদ্ধভূমিতে পরিণত হইবে। রাতের নির্মমতায় সেখানে প্রবাহিত হইবে লাল রক্তের অশ্রু।

যাহাই হউক, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরের দরজায় তশরীফ আনিলেন। সেখানে কাফেররা জটলা করিয়া ছিল। তিনি সুরা ইয়াসীন শরীফের তেলাওয়াত শুরু করিলেন এবং فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ (অতঃপর তাহাদেরকে আবৃত করিযা দিয়াছি, ফলে তাহারা দেখে না)– আয়াতটি কয়েকবার দোহ্‌রাইলেন। আল্লাহ পাক তাহাদের চোখে পর্দা ঢালিয়া দিয়াছিলেন। অতএব, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া বাহিরে তাশরীফ লইয়া আসিলেন এবং হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) ও পথপ্রদর্শকের সঙ্গে মদীনার পথে রওনা হইলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ছুর পর্বতের এক গুহায় গিয়া অবস্থান গ্রহণ করিলেন।

কোরাইশদের সেই অসতর্ক যুবকদল এবং বৃদ্ধ পরামর্শদাতারা নিজেদের পরাজয় টের পাইয়া বড়ই পেরেশান হইল এবং চতুর্দিকে ছুটাছুটি শুরু করিয়া দিল। তাহারা ঘোষণা করিয়া দিল, যেই ব্যক্তি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধরিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকে একশত উট পুরস্কার দেওয়া হইবে। একটি দল পায়ের ছাপের উপর অনুমান করিয়া (সেই পাহাড়ের) গর্তের মুখ পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেল। তাহারা আর একটু ঝুকিলে নিশ্চিতভাবেই রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিতে পাইত।

হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) গুহার অভ্যন্তর হইতেই তাহাদের পা দেখিতে পাইতেছিলেন এবং এই মনে করিয়া ভয় পাইতেছিলেন যে,

তাহাদের মধ্যে কেহ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়া ফেলিলে তাঁহাকে কষ্ট দিবে। পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন– لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا (ভয় পাইও না; আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন)।

আল্লাহর কুদরতে এক মাকড়শা আসিয়া গুহার মুখে জাল বুনন করিয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই কবুতর আসিয়া বাসা বানাইয়া ফেলিল। ফলে কোন দর্শকের পক্ষে ভিতরে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করার কল্পনাও হইল না।

মজার ব্যাপার হইল– অনুসন্ধানকারীদের মধ্যে সবচাইতে চালাক ও ধূর্ত ছিল উমাইয়্যা বিন্ খাল্ফ, সে নিজেই মন্তব্য করিল যে, চল! এখানে তাহারা থাকিতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ গুহায় কতদিন অবস্থান করিয়াছিলেন?

উত্তর ঃ তিন দিন।

প্রশ্ন ঃ গুহা হইতে কিভাবে যাত্রা করিলেন?

উত্তর ঃ তৃতীয় দিবসে হযরত আবু বকর ছিদ্দিকের আজাদকৃত গোলাম আমের বিন ফুহাইরাহ দুইটি উটনী লইয়া তথায় হাজির হইল। অতঃপর সকলে মদীনার দিকে যাত্রা করিলেন। পথে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বহু মোজেযা প্রকাশ হইয়াছে, যাহা বড় বড় কিতাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্রশ্ন ঃ গুহা হইতে কত তারিখে এবং কবে যাত্রা করেন?

উত্তর ঃ ৪ঠা রবিউল আউয়াল, সোমবার।

প্রশ্ন ঃ হযরত আলী (রাঃ)-কে (মক্কায়) রাখিয়া আসার পিছনে কি যুক্তি ছিল?

উত্তর ঃ মক্কার কাফেররা যদিও রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রু ছিল, কিন্তু তাঁহার উপর এতটা আস্থা ও ভরসা ছিল যে, তাহারা নিজেদের সকল আমানত তাঁহার নিকটই রাখিত। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মক্কার কাফেরদের) সেইসকল আমানত তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যেই হযরত আলী (রাঃ)-কে তথায় রাখিয়া আসিয়াছিলেন।

প্রশ্ন ঃ হযরত আলী (রাঃ) কতদিন পর এবং কোথায় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন?

উত্তর ঃ কোবাতে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথায় পৌঁছাইবার তিন দিন পর।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতদিন গুহায় অবস্থান করিলেন, ততদিন তাঁহার নিকট খবরাখবর পৌঁছানো এবং তাঁহার পানাহারের কি ব্যবস্থা হইয়াছিল?

উত্তর ঃ হযরত আবু বকর ছিদ্দিকের বড় ছেলে হযরত আব্দুল্লাহ রাতে গোপনে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া সারাদিনের সকল খবরাখবর তাঁহাকে শোনাইয়া সকাল হওয়ার পূর্বেই মক্কায় ফিরিয়া যাইতেন। হযরত আবু বকর ছিদ্দিকের কন্যা হযরত আছমা রাতে খাবার পৌঁছাইয়া দিতেন।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে পথপ্রদর্শক কে ছিল?

উত্তর ঃ আব্দুল্লাহ বিন উরাইকিত। এই কাজের জন্য পারিশ্রমিক দিয়া তাহাকে সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল।

প্রশ্ন ঃ এই ছফরে মোট কতজন মানুষ ছিলেন?

উত্তর ঃ চারজন। চতুর্থজন ছিলেন হযরত আবু বকর ছিদ্দিকের

আজাদকৃত গোলাম আমের বিন ফুহাইরাহ।

প্রশ্ন ঃ পথে পানাহারের কি ব্যবস্থা ছিল?

উত্তর ঃ কোথাও হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) দুধ ইত্যাদি ক্রয় করিয়া নাস্তার ব্যবস্থা করিতেন, আবার কোথাও মো'জেযা দ্বারা আল্লাহ্ পাক নিজের প্রিয় বান্দাদের (আহারের) ব্যবস্থা করিয়াছেন।

প্রশ্ন ঃ এই ছফরে কত দিন ব্যয় হয়?

উত্তর ঃ প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী চার দিন।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা পৌঁছাইবার পূর্বে অন্য কোথাও অবস্থান করিয়াছিলেন কি?

উত্তর ঃ (হাঁ,) কোবা নামক স্থানে।

প্রশ্ন ঃ কোবা কোথায় অবস্থিত এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে কাহার নিকট অবস্থান করেন?

উত্তর ঃ কোবা মদীনা হইতে উজানের দিকের একটি বস্তি। আর প্রসিদ্ধ মত এই যে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু আমর বিন আউফের গোত্রে অবস্থান করেন।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোবায় প্রবেশের দিন-তারিখ কি ছিল?

উত্তর ঃ আল্লামা ইবনে কাইমের বর্ণনামতে ১২ রবিউল আউয়াল এবং মূসা খাওয়ার যামীর মতে ৮ রবিউল আউয়াল বৃহস্পতিবার। ফারসী মাস ক্বীর-এর চতুর্থ তারিখ, রোমান সনের এপ্রিল মাস এবং ৭৩৩ ইস্কান্দারী সনের ১০ তারিখ।

প্রশ্ন ঃ কোবায় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত দিন অবস্থান করেন?

উত্তর ঃ এই বিষয়ে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। যেমন– ৩, ৪, ৫, ১৪ কিংবা ২২ দিন।

প্রশ্ন ঃ কোবায় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করিয়াছিলেন?

উত্তর ঃ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। উহার নির্মাণ কাজে উভয় জাহানের বাদ্শাহ নিজেও অন্য সকলের সঙ্গে পাথর ও মাটি বহন করেন। সেখানে তিনি সঙ্গী-সাথীদের নামাজ পড়ান এবং বয়ান করেন।

প্রশ্ন ঃ উহার পূর্বেও কি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মসজিদ নির্মাণ করিয়াছেন?

উত্তর ঃ না, এই মসজিদটিই ছিল তাঁহার পবিত্র হাতের প্রথম মসজিদ এবং এই বয়ানটি ছিল উন্মুক্ত ইসলামী জলসার প্রথম বয়ান।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোবার কোন্ জায়গায় অবস্থান করেন?

উত্তর ঃ বনী ছালেম উপত্যকার মাঝামাঝি অংশে।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত তারিখে মদীনায় প্রবেশ করেন?

উত্তর ঃ রবিউল আউয়াল মাসের ২৭ তারিখে। এই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে বটে, তবে এই কথা ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধ যে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রবিউল আউয়াল মাসেই মদীনায় প্রবেশ করেন।

প্রশ্ন ঃ কি বারে মদীনায় তাশরীফ আনয়ন করেন?

উত্তর ঃ শুক্রবারে।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর নামাজ কোথায় পড়েন এবং ঐ সময় তাঁহার সঙ্গে কতজন মানুষ ছিল?

উত্তর ঃ বনী ছালেমের মসজিদে। তখন তাঁহার সঙ্গে একশত মানুষ ছিল।

প্রশ্ন ঃ মদীনা গমনের পর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাহার ঘরে কত দিন অবস্থান করেন?

উত্তর ঃ হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ)-এর ঘরে এক মাস অবস্থান করেন। কোন কোন বর্ণনায় ৬ বা ৭ মাসের কথাও বলা হইয়াছে।

প্রশ্ন ঃ কি পরিস্থিতিতে তথায় অবস্থান করেন?

উত্তর ঃ মদীনায় যখন পবিত্র সূর্য (রাসূল সঃ) প্রবেশ করেন, তখন সকলেই ইহা বাসনা করিতে লাগিলেন যে, আমাদের ঘরই যেন তাঁহার বাসস্থানে পরিণত হয়। সুতরাং সকলেই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনীর লাগাম ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। তিনি এরশাদ করিলেন, ছাড়িয়া দাও। ইহা যেখানে বসিয়া পড়িবে আমি সেখানেই অবস্থান করিব, (আমাকে) এইরূপই হুকুম করা হইয়াছে।

ঘটনাক্রমে উহা বনু নাজার গোত্রে আসিয়া থামিয়া গেল, যেখানে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতৃকুলও ছিল। তিনি তাহাদের মধ্য হইতে হযরত আবু আইউব আনসারীর ঘরে মুকীম (বাসিন্দা) হইলেন।

প্রশ্ন ঃ উটনী খাস কোন জায়গাটিতে বসিয়াছিল?

উত্তর ঃ যেখানে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদ অবস্থিত।

প্রশ্ন ঃ (মসজিদের) জমিনটি কাহার ছিল, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা কিভাবে গ্রহণ করেন এবং কি উপাদানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়?

উত্তর ঃ ঐ জমিনটি ছিল ছহল ও ছোহাইল নামে বনী নাজার গোত্রের দুই এতীম বালকের। তাহাদের বাসনা ছিল যেন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ জমিন বিনা মূল্যে গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে

উহার মূল্য গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। দশ দিনার মূল্য ধার্য করা হয়। পরে মসজিদে কোবার মত সকলে মিলিয়া উহা নির্মাণ করেন। উহার এক পাশে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বিবিগণের জন্য ঘর নির্মাণ করেন। এই সকল নির্মাণকাজ কাঁচা ইট ও খেজুরপত্র দ্বারা সম্পন্ন করা হয়।

প্রশ্ন ঃ ঐ ব্যক্তিটি কে যিনি সর্বপ্রথম মক্কা হইতে মদীনার পথে হিজরত করেন?

উত্তর ঃ হযরত আবু ছালামা বিন আব্দুল আশহাল মাখযুমী অথবা হযরত মাস্‌আব বিন ওমায়ের (রাঃ)।

প্রশ্ন ঃ মদীনার কোন্ মসজিদে সর্বপ্রথম কোরআন শরীফ পাঠ করা হয়?

উত্তর ঃ বনু যুরাইকের মসজিদে।

প্রশ্ন ঃ হিজরী সন কাহাকে বলা হয়?

উত্তর ঃ যেই বৎসর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় তাশরীফ আনেন সেই বৎসর হইতে একটি তারিখ গণনা শুরু করা হয়, উহাকেই হিজরী সন বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ হিজরী সন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুরু করিয়াছেন, না তাঁহার পরে অন্য কেহ শুরু করিয়াছেন?

উত্তর ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুরু করেন নাই। বরং দ্বিতীয় খলীফা ফারূকে আজম হযরত ওমর (রাঃ) নিজের শাসনামলে হিজরী সন প্রবর্তন করেন এবং হিজরতের বৎসর হইতেই উহার শুরু ধার্য করা হয়।

প্রশ্ন ঃ উহার পূর্বে কিভাবে বৎসর হিসাব করা হইত?

উত্তর ঃ আরবের নিয়ম ছিল কোন বড় ঘটনা হইতে সন শুরু করা হইত। সবশেষে আসহাবে ফীলের ঘটনা হইতে সনের সূচনা মনে করা হইত।

প্রশ্ন ঃ হিজরী সনের প্রথম তারিখ এবং প্রথম মাস কোন্‌টি?

উত্তর ঃ ১লা মোহাররামুল হারাম হিজরী সনের প্রথম তারিখ এবং মোহাররাম মাস হইল প্রথম মাস।

সারাংশ

যখন এই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ধারণা হইয়া গেল যে, মক্কায় থাকিয়া ইসলাম প্রচারে সাফল্য অর্জন কষ্টসাধ্য হইবে এবং শত্রুদের পক্ষ হইতে হত্যারও প্রস্তুতি শুরু হইল তখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার দিকে হিজরত করিলেন। প্রথমে গোপনে ছাহাবায়ে কেরাম হিজরত করেন এবং পরে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর করেন। হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাঃ) তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। হযরত আলী (রাঃ)-কে (কাফেরদের) আমানতসমূহ ফেরৎ দেওয়া এবং আরো কিছু কারণে মক্কায় রাখিয়া আসা হইয়াছিল। তিনি তিন দিন পর কোবাতে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হন।

পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা হইতে বাহির হইয়া ছুর পাহাড়ের গুহায় তিন দিন আত্মগোপন করিয়াছিলেন। পরে তথা হইতে যাত্রা করিয়া তিনি কোবায় পৌছান। তাঁহার সঙ্গে আরো তিন ব্যক্তি ছিল। কোবায় তিনি কিছুদিন অবস্থান করেন। সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, লোকসমাগমে বক্তব্য রাখেন এবং জামায়াতের সহিত নামাজ আদায় করেন। পরে কোবা হইতে মদীনায় তাশরীফ আনেন।

এখানে শুরুতে তিনি হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ)-এর ঘরে অবস্থান করেন। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর শাসনামলে হিজরতের বৎসর হইতে সূচনা ধার্য করিয়া একটি সন প্রবর্তন করা হয়। উহাকেই হিজরী সন বলা হয়। ১লা মোহাররামুল হারাম হইতে এই বর্ষ শুরু হয়।

শব্দার্থ ঃ

(মূল উর্দূ কিতাবের পাঠকদের জন্য)

وطن – দেশ, স্বদেশ, জন্মভূমি, মাতৃভূমি, বাসস্থান। جدائی - বিচ্ছিন্নতা, বিচ্ছেদ দূরত্ব। تجربه – অভিজ্ঞতা, পরীক্ষা, পরখ। مشكل – কঠিন, জটিল, শক্ত, দুষ্কর, কষ্টসাধ্য, দুরূহ। معذور – অপারগ, ক্ষমার্হ, অক্ষম। تجويز – মত, ধারণা, প্রস্তাব, সিদ্ধান্ত, ফায়সালা, সুবিবেচনা, রায়, ব্যবস্থা, চিন্তা, পরিকল্পনা। اعتراض – ওজর, আপত্তি, সমালোচনা, প্রতিবাদ, ত্রুটি অন্বেষণ, বিরুদ্ধাচরণ। بموجب – অনুযায়ী, এই কারণে, এই মত। سانڈنی – আরোহণ করার উটনী। نوجوان – যাহার যৌবন কেবল শুরু হইয়াছে, যুবক, যুবতী। خاموشی – নীরবতা, নির্জনতা, শব্দহীনতা। دولتكده – গৃহ, বাসভবন। كم سن – স্বল্প বয়স, যাহার বয়স কম এমন। روحانی – আধ্যাত্মিক, আত্মিক, আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট। بے دهڑك নির্দ্বিধা, নিশ্চিন্ত, নির্ভাবনা, নির্ভয়, বীর, বাহাদুর, অনাড়ম্বর قربانگاه – কোরবান হওয়ার স্থান, উৎসর্গ হওয়ার স্থান, জবাই হওয়ার জায়গা, হত্যা করার স্থান, বদ্ধভূমি। مدبر – পরামর্শদাতা, মন্ত্রী, বুদ্ধিমান, ব্যবস্থাপক। شكست – পরাজয়, হার, পরাভূত, ভঙ্গ, ভঙ্গুরতা, বিদায়। تسكين – সান্ত্বনা, সন্তোষ, আরাম, এত্মিনান। گهونسلا– পাখীর বাসা, কুঁড়ে ঘর, ক্ষুদ্রকুটির। وهم – কল্পনা, ধারণা, সন্দেহ, সম্ভাবনা, অনুমান, খেয়াল, চিন্তা, মনের ঐ শক্তি যাহা অপরাধ চিন্তার জন্ম দেয়। چست – চালাক, বুদ্ধিমান, উৎফুল্ল, কর্মঠ, মজবুত। معراج – সিঁড়ি, সোপান, আরোহণ, উচ্চতা, মর্যাদা, এমন মর্যাদা যাহা কল্পনাও করা যায় না। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উর্ধ্বাকাশ ভ্রমণ এবং আল্লাহ পাকের নূর দর্শন। تعمير – নির্মাণ, ভবন নির্মাণ, গঠন, সংস্কার করা, অট্টালিকা, ঘর। مهار – উটের লাগাম, উট চালনা করার জনা উহার নাসারন্ধ্রে যেই দড়ি ঢুকাইয়া দেওয়া হয়।

نانهيال – নানার বাড়ী, মাতৃগোষ্ঠি। آرزو – ইচ্ছা, বাসনা, আশা, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, অনুরোধ, প্রেম, বিশ্বাস। خليفه – রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিবর্গ, নায়েব, প্রতিনিধি, শাসক, ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনকর্তা, দর্জি, বাবুর্চী, উস্তাদের ছেলে। همراه – সঙ্গ, সঙ্গী, সাথী, যে সঙ্গে গমন করে। عهد خلافت – রাজত্বকাল, শাসনামল। آغاز – শুরু, সূচনা, আরম্ভ, উৎপত্তি।

মদীনা তাইয়্যেবা

মদীনার অধিবাসী, তাহাদের আত্মত্যাগ এবং মদীনার বিভিন্ন জামায়াত

প্রশ্ন ঃ মদীনা কোথায়, মক্কা হইতে কত দূরে (অবস্থিত) এবং প্রথমে উহার নাম কি ছিল?

উত্তর ঃ আরব দেশে মক্কা হইতে উত্তর দিকে প্রায় আড়াইশত মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি শহর। প্রথমে উহাকে য়াছরিব বলা হইত; এখন উহাকে মদীনা বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ মদীনার অধিবাসীদের কি কি ধর্ম ছিল এবং তথায় কোন্ কোন্ গোত্রের বসতী ছিল?

উত্তর ঃ মদীনা তাইয়্যেবায় এবং উহার আশেপাশে মোশরেক ও ইহুদী এই দুইটি ধর্মের মানুষ বসবাস করিত। আউস এবং খাযরাজ নামে মোশরেকদের দুইটি গোত্র ছিল। আর ইহুদীদের বড় বড় কবিলা (গোত্র) ছিল তিনটি। (১) বনু নাজির (২) বনু কাইনুকা' এবং (৩) বুন কুরাইজা।

প্রশ্ন ঃ মোহাজের এবং আনসারী কাহাদেরকে বলা হয়?

উত্তর ঃ যাহারা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া মদীনায় তাশরীফ আনিয়াছেন তাহাদিগকে মোহাজের

বলা হয় এবং মদীনায় বসবাসকারী আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদিগকে আনসারী বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ মদীনার আনসারীগণ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার সঙ্গীদের সঙ্গে কেমন আচরণ করিয়াছেন?

উত্তর ঃ প্রদীপের সঙ্গে পতঙ্গ যেইরূপ আচরণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ– সেবা-যত্ন, কল্যাণকামীতা এবং আত্মনিবেদনের যত ছুরত হইতে পারে; আনসারীগণ স্বেচ্ছায় উহার সবই প্রদর্শন করিয়াছেন।

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার সঙ্গীদের সামনে নিজেদের মাল-দৌলত, বিবি-বাচ্চা এমনকি নিজেদের প্রাণের কথাও ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাহাদের সামনে যদি কোন বস্তুর অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকিয়া থাকে, তবে উহা ছিল আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং তাঁহার সঙ্গীবৃন্দ।

জনৈক আনসারী ইহার কিছুমাত্র পরওয়া করিল না যে, তাহার ছোট ছোট শিশুরা অনাহারে আছে। তাহার বড় সাধ ছিল, যেন মোহাজের ভাই আহারে পরিতৃপ্ত হইয়া যায়। সে নিজে স্বেচ্ছায় কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত কিন্তু তাহার মোহাজের ভাই যেন আরামে থাকে। (প্রয়োজনে) নিজের জীবন উৎসর্গ করিবে কিন্তু মোহাজের ভাইয়ের যেন বিন্দুমাত্র কষ্ট না হয়।

প্রশ্ন ঃ প্রাথমিক অবস্থায় মোহাজেরদের অবস্থান এবং তাহাদের জীবন যাপনের কি ব্যবস্থা করা হইল?

উত্তর ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক একজন মোহাজেরকে এক একজন আনসারীর সঙ্গে ভ্রাতৃত্বসুলভ সম্পর্ক স্থাপন করাইয়া দিতেন। অতঃপর তাহারা পরস্পরকে আপন ভাইয়ের মতই মনে করিত। এমনকি তাহারা একে অন্যকে ওয়ারিশ পর্যন্ত মনে করিত।

প্রশ্ন ঃ একজন আনসারী যখন নিজের যাবতীয় বিষয় সম্পদ মোহাজের ভাইকে সোপর্দ করিয়া এই কামনা করিত, যেন মোহাজের ভাই আরামে

থাকে এবং আনসারী নিজে মেহনত করিয়া কামাই রোজগার করিবে, তখন তাহার মোহাজের ভাই (উহার জবাবে) কি বলিত?

উত্তর ঃ মোহাজের ভাই বলিত, আপনার সম্পদ আপনারই ধন্য হউক (উহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই), আমাকে মজদুরী কিংবা কোন ব্যবসার পথ বলিয়া দিন। অতঃপর সে নিজের হাতে কামাই করিয়া জীবন যাপন করিত।

প্রশ্ন ঃ তাহারা এইরূপ করিত কেন?

উত্তর ঃ এই কারণে যে, তাহাদের আত্মসম্মানবোধ ইহা পছন্দ করিত না যে, তাহারা পঙ্গু হইয়া আনসারী ভাইদের বিষয়-সম্পদ দখল করতঃ নিজেদের ভার তাহাদের উপর ছাড়িয়া দিবে।

প্রশ্ন ঃ ইহা দ্বার কি শিক্ষা পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য হইল নিজের হাতে উপার্জন করা এবং অন্যের উপর নিজের ভার চাপাইয়া না দেওয়া।

প্রশ্ন ঃ ছাহাবাগণ তাওয়াক্কুল করিলেন না কেন?

উত্তর ঃ ছাহাবাগণ পরিপূর্ণভাবেই তাওয়াক্কুল করিতেন। তবে তাওয়াক্কুলের অর্থ ইহা নহে যে, হাতের উপর হাত রাখিয়া (অর্থাৎ অকর্মন্য হইয়া) বাপ-দাদার সম্পদ কিংবা মানুষের দান-দক্ষিণার উপর ভরসা করিয়া বসিয়া থাকিবে। বরং তাওয়াক্কুলের প্রকৃত অর্থ হইল– নিজের পক্ষ হইতে পরিপূর্ণভাবে চেষ্টা করিয়া ফলাফল আল্লাহর উপর সোপর্দ করিবে। অর্থাৎ– ভরসা নিজের মেহনতের উপর নহে, বরং আল্লাহ পাকের মেহেরবানীর উপর।

প্রশ্ন ঃ পাম্পরিক ভ্রাতৃত্বের কারণে একে অন্যের ওয়ারিশ হওয়ার নিয়ম কতদিন অব্যাহত ছিল?

উত্তর ঃ যতদিন আত্মীয়তার ভিত্তিতে মিরাছ বন্টন হওয়ার হুকুম পবিত্র

কোরআনে নাজিল হয় নাই।

প্রশ্ন ঃ আনসারগণ যেইসকল বিষয়-সম্পদ মোহাজেরগণকে দান করিয়াছিল উহা কি তখনও তাহাদের নিকটই ছিল, না ফেরৎও দিয়াছিল? যদি ফেরৎ দিয়া থাকে তবে কবে ফেরৎ দিয়াছিল?

উত্তর ঃ খায়বর বিজয়ের পর। অর্থাৎ মোহাজেরগণ খায়বরের (যুদ্ধলব্ধ) সম্পদ লাভ করার পর আনসারদের সম্পদ ফেরৎ দেওয়া হয়।

প্রশ্ন ঃ ইসলাম প্রচার হওয়ার পর মদীনায় কয়টি দল হয়?

উত্তর ঃ তিনটি দল– (১) মুসলমান (২) ইহুদী এবং (৩) মোনাফেক।

প্রশ্ন ঃ ইহুদী কাহাদেরকে বলা হয়?

উত্তর ঃ ইহুদী হইল ঐ সকল লোকেরা যাহারা নিজেদেরকে হযরত মুছা আলাইহিস্‌সালামের উম্মত বলিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহাদের গোটা দ্বীন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাওরাত কিতাবে তাহারা বহু পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছিল। ব্যক্তিস্বার্থ, নিজের খাহেশাতের আনুগত্য, লোভ-লালসা ইত্যাদি অপকর্মসমূহ তাহাদের রগ-রেশায় ঢুকিয়া গিয়াছিল। ব্যাপকভাবে সূদ গ্রহণ করা হইত এবং এইভাবেই মদীনার অপরাপর গোত্রসমূহের যাবতীয় অর্থ-সম্পদ তাহারা হজম করিয়া ফেলিয়াছিল।

প্রশ্ন ঃ মোনাফেক ছিল কাহারা?

উত্তর ঃ মদীনায় এমন কিছু প্রতারক ও নিম্ন শ্রেণীর মানুষ ছিল, যাহারা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য প্রকাশ্যে মুসলমান হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের অন্তর কুফরীর কাঁদামাটিতেই নিমজ্জিত ছিল এবং ইসলামের সহিত নোংরা দুশমনীতে ছিল দুর্গন্ধযুক্ত। দিন-রাত কেবল মুসলমানদের মূলোৎপাটনের ফিকির করিত, এই ধরনের লোকদিগকেই মোনাফেক বলা হইত।

প্রশ্ন ঃ তাহাদের দলপতি কে ছিল?

উত্তর ঃ আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল।

প্রশ্ন ঃ মদীনার ইহুদীরা মুসলমানদের সঙ্গে কি ধরনের আচরণ করিল?

উত্তর ঃ মক্কার কাফেরদের মত তাহারাও ইসলাম এবং মুসলমানদের পিছনে পড়িয়া গেল (ক্ষতিসাধন করিতে লাগিল)।

প্রশ্ন ঃ এই দুশমনী ও বিদ্বেষের কারণ কি ছিল?

উত্তর ঃ ইসলামের উন্নতি। কারণ, এই উন্নতির ফলেই তাহাদের অবৈধ সুযোগ-সুবিধা নষ্ট হইতেছিল। সূদ গ্রহণের মাধ্যমে বিত্তহীনদিগকে দমন করিয়া রাখিয়া যেন তাহারা মদীনার মালিক সাজিয়া বসিয়াছিল। ইসলামের উন্নতির ফলে তাহাদের এইসকল অত্যাচার খতম হইতেছিল।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীদের ফেৎনা ও বিশৃংখলা দমনের উদ্দেশ্যে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা কি গ্রহণ করিলেন?

উত্তর ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি অঙ্গীকার করাইলেন। উহার সারসংক্ষেপ ছিল এই–

(১) ইহুদীরা ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করিবে।

(২) ইহুদী-মুসলমান পরস্পর বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক রাখিবে।

(৩) ইহুদী কিংবা মুসলমানগণ যদি কাহারো সঙ্গে যুদ্ধের সম্মুখিন হয়, তবে একে অন্যের সাহায্য করিবে।

(৪) মদীনাতে যদি (বহির্শত্রুর) আক্রমণ হয় তবে উভয় পক্ষ পরস্পরের সঙ্গে শরীক হইবে।

(৫) কোন শত্রুর সঙ্গে যদি এক পক্ষ সন্ধি করে তবে অপর পক্ষও ঐ সন্ধিতে শরীক হইবে।

(৬) কোন পক্ষই কোরাইশ সম্প্রদায়কে নিরাপত্তা দিবে না।

(৭) মুসলমানরা যদি (কাহারো সঙ্গে) যুদ্ধ করে তবে ইহুদীরাও ঐ

যুদ্ধের খরচে শরীক হইবে।

(৮) মজলুমের সাহায্য করা হইবে।

(৯) যদি নিজেদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ সৃষ্টি হওয়ার মত কোন অবস্থা সৃষ্টি হয় তবে উহার চূড়ান্ত ফায়সালার ভার রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ন্যস্ত হইবে।

প্রশ্ন ঃ ইহুদীরা (ঐ চুক্তি) নিয়মিত পালন করিয়াছিল কি?

উত্তর ঃ মোটেও না। বরং তাহারা মক্কার কাফের এবং ইসলামের অপরাপর শত্রুদের সঙ্গে মিশিয়া ইসলামের পিছনে ষড়যন্ত্রে লাগিয়া রহিল। সুতরাং দ্বিতীয় বৎসর বনু কাইনুকা, চতুর্থ বৎসর বনু নাজির এবং পঞ্চম বৎসর বনু কোরাইজা অত্যন্ত কদর্যভাবে চুক্তিভঙ্গ করিল। ইন্‌শাআল্লাহ পরবর্তীতে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

প্রশ্ন ঃ মক্কার অধিবাসীরা হিজরতের পর ইসলামের বিরুদ্ধে কি কৌশল অবলম্বন করিল?

উত্তর ঃ (১) আউস ও খাযরাজ গোত্রের যাহারা এখনো মুসলমান হয় নাই তাহাদিগকে যুদ্ধ করার জন্য উত্তেজিত করিল। সুতরাং তাহাদের নিকট লিখিয়া পাঠাইল– তোমরা মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আশ্রয় দিয়াছ, এখন তোমাদের অবশ্য করনীয় হইল, তোমরা তাহাকে বহিষ্কার করিয়া দাও। অন্যথায় আমরা সোজা মদীনায় আসিয়া উপস্থিত হইব। তোমাদের যুবকদিগকে হত্যা করিব এবং নারীদিগকে দাসী বানাইয়া রাখিব।

(২) বদরের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কোরাইশরা যখন ফিরিয়া আসিল, তখন তাহারা মদীনার ইহুদীদিগকে লিখিয়া পাঠাইল যে, তোমরা দূর্গের মালিক এবং বিষয়-সম্পদের অধিকারী, (সুতরাং তোমরা) মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে যুদ্ধ কর। অন্যথায় আমরা

তোমাদের নারীদের পায়ের আলঙ্কার পর্যন্ত খুলিয়া ফেলিব- ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং বনু নাজির চুক্তি ভঙ্গের প্রস্তুতি গ্রহণ করিল। (উহার বিস্তরিত বিবরণ পর আসিতেছে)।

(৩) ইতিমধ্যেই মদীনার মোনাফেক এবং ইহুদীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র শুরু করিল।

(৪) মদীনার উপর আক্রমণ শুরু করিল।

(৫) যখন এককভাবে সফলকাম হইতে পারিল না, তখন গোটা আরবের কাফের ও ইহুদীদিগকে একত্রিত করিয়া মদীনার উপর আক্রমণ করিল।

(৬) রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করিল। সুতরাং বদরের (যুদ্ধের) পর ওমায়ের নামে মক্কার এক ব্যক্তিকে এই উদ্দেশ্যে মদীনা তাইয়্যেবা প্রেরণ করিল।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার কাফেরদের দুস্কৃতি দমন করার কি উপায় অবলম্বন করিলেন?

উত্তর ঃ কোরাইশদের সকল অহংকার ও লম্ফঝম্ফের আসল চাবি ছিল সিরিয়ার ব্যবসা। আর মদীনার নিকট দিয়াই সিরিয়া যাইতে হইত। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সেই ব্যবসায়ী কাফেলাসমূহের ক্ষতিসাধন শুরু করিলেন, যেন তাহাদের শক্তি খর্ব হইয়া পেরেশানীর শিকার হয়।

প্রশ্ন ঃ কোরাইশ ব্যতীত মদীনার আশেপাশের অমুসলিম গোত্রসমূহের অপতৎপরতা কেমন করিয়া প্রতিরোধ করিলেন?

উত্তর ঃ তাহাদের সঙ্গে সন্ধির চুক্তি শুরু করিলেন। যেমন বনু হামজার সঙ্গে চুক্তি করিয়াছিলেন- যাহার বিবরণ পরে আসিতেছে।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সকল গোত্রের সঙ্গেই এইরূপ (সন্ধি-চুক্তি) করিতে পারিলেন?

উত্তর ঃ না। তাহা হইলে তো তলোয়ার ব্যবহারের সুযোগই হইত না।

প্রশ্ন ঃ উহার কারণ কি ছিল?

উত্তর ঃ কেবল দুই-একটি গোত্রের সঙ্গে চুক্তি হইতেই কোরাইশদের আক্রমণ শুরু হইয়া গেল এবং তাহারা আশেপাশের গোত্রসমূহকেও (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) উত্তেজিত করিয়া তুলিল।

সারাংশ

মদীনায় ইসলাম প্রচার শুরু হওয়ার পর তথাকার অধিবাসীরা তিন দলে বিভক্ত হইয়া গেল। অর্থাৎ– মুসলমান, ইহুদী এবং মোনাফেক। ইহুদীদের অনিষ্ট দমনের উদ্দেশ্যে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সঙ্গে চুক্তি করিয়া লইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল, তাহারা উহার পাবন্দি (বা নিয়ম পালন) করে নাই। যাহার পরিণতি ছিল স্বয়ং তাহাদের নিজেদেরই তাবাহী ও বরবাদী।

যাহারা মোহাজের ছিল তাহাদের একেক জনকে একেক জন আনসারীর সঙ্গে ভ্রাতৃত্বসুলভ সম্পর্ক স্থাপন করাইয়া দেওয়া হইল, যাহা ঐ সময় পর্যন্ত বলবৎ ছিল যতক্ষণ পবিত্র কোরআনে মিরাছ ও ত্যাজ্য সম্পদ বন্টনের আয়াত নাজিল হয় নাই।

শব্দার্থ ঃ

(মূল উর্দূ কিতাবের পাঠকদের জন্য)

برتاؤ – ব্যবহার, আচরণ, রীতিনীতি, রুসম, রেওয়াজ, তরীকা, ঢং। پروانہ – পতঙ্গ, ফড়িং, প্রজাপতি, আদেশনামা, হুকুমনামা, প্রেমিক। شمع – প্রদীপ,

মোমবাতি, চেরাগ, কুপি। خیر خواہی – মঙ্গল কামনা, কল্যাণ কামনা, হিত কামনা। تمنا – আশা, আকাঙ্খা, সাধ, ইচ্ছা, বাসনা। بھائی چارہ – ভ্রাতৃত্ব, মেলামেশা, গভীর বন্ধুত্ব, সত্যিকার বন্ধুত্ব। مواخاة ভ্রাতৃত্ব। سبیل – পথ, রাস্তা, পদ্ধতি, উপায় ব্যবস্থা। غیرت – লজ্জা, অবজ্ঞা, সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ, লজ্জাজনিত আত্মমর্যাদাবোধ। جائداد – সম্পদ, সম্পত্তি, জমিদারী, বাড়ী, জমিন, অলংকার। نفس پرستی – স্বীয় নফ্‌সের তাবেদারী, নিজের খাহেশাত অনুযায়ী চলা, স্বেচ্ছাচারী। چٹ کرنا – সকল কিছু গ্রাস করা, বরবাদ করা, ধ্বংস করা, হজম করিয়া ফেলা, দখল করিয়া ফেলা। ذلیل – অপমানিত, নিম্নশ্রেণীভুক্ত, নীচ, হীন, দুর্নাম, অপদস্থ। مکار – প্রতারক, ধোঁকাবাজ, ধূর্ত। سرغنه – দলপতি, সরদার, প্রধান ব্যক্তি। دباؤ – কঠোরতা, বল প্রয়োগ, বল, শক্তি, অত্যাচার, ভীতি, প্রভাব, ক্ষমতা, প্রতিবন্ধক, পাবন্দি। فساد – ঝগড়া বিবাদ, ফেৎনা, ষড়যন্ত্র, বিরুদ্ধাচরণ, বরবাদী, খারাবী। سازش – ষড়যন্ত্র, কাহারো বিরোধীতা করার জন্য পরসম্পর ঐক্যমত। اندر ہی اندر – ভিতরে ভিতরে, উহার মধ্যেই, ইতোমধ্যে, ইত্যবসরে। تنها – একাকী, এককভাবে, অদ্বিতীয়, বেনজির, শুধু, মাত্র, পৃথক। شرارت – দুষ্টামি, দুস্কৃতি, অন্যায় আচরণ, অনিষ্টসাধন, অসৎউদ্দেশ্য, অসদাচরণ। صلح – সন্ধি, শান্তি, নিরাপত্তা, ঐক্য, নূতনভাবে বন্ধুত্ব, পূনর্মিলন। شر – অনিষ্ট, অন্যায়, পাপ, ঝগড়া বিবাদ, ফাসাদ।

জেহাদ

প্রশ্ন ঃ জেহাদ শব্দের অর্থ বল।

উত্তর ঃ জেহাদের অর্থ হইল– সাধ্যমত সর্বশক্তি ব্যয় করা বা চূড়ান্ত চেষ্টা করা।

প্রশ্ন ঃ শরীয়তে জেহাদ কাহাকে বলা হয়?

উত্তর ঃ জেহাদের শরীয়তসম্মত অর্থও ইহাই। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, এই চেষ্টা যেন আল্লাহর পথে হয়। সত্যের বাণী সমুন্নত করার জন্য যদি (ঐ চেষ্টা করা) হয়, তবে উহা শরীয়তসম্মত জেহাদ। সুতরাং জেহাদের শরীয়তসম্মত অর্থ হইল– আল্লাহর পথে সত্যের বাণী সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে সাধ্যমত সর্বশক্তি ব্যয় করা এবং চূড়ান্ত চেষ্টা চালানো।

প্রশ্ন ঃ এই চেষ্টা কিভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয়, তলোয়ার দ্বারা, না জান-মাল দ্বারা?

উত্তর ঃ সুযোগ ও পরিবেশ অনুযায়ী যেইভাবে কল্যাণকর হয় এবং যাহা দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হয়, সেইভাবেই করা বাঞ্ছনীয়। যদি জান দিতে হয় তবে জান কোরবান করিয়া, সম্পদের প্রয়োজন হইলে সম্পদের কোরবানী করিয়া এবং কোথাও যদি সত্য কথা বলিলে ইজ্জত আব্রু ও জান-মালের আশঙ্কা হয়, আর ইনসাফ ও ন্যায় বিচার এবং সত্যের বাণী সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে সেখানে সত্য কথা বলা যদি জরুরী হইয়া পড়ে, তবে সেখানে সত্য কথা বলিয়া জেহাদের ফরজ আদায় করিতে হইবে।

প্রশ্ন ঃ জেহাদের মর্যাদা ও পর্যায় কোন্‌টি, ফরজ না ওয়াজিব? যদি ফরজ হয় তবে ফরজে আইন, না ফরজে কেফায়াহ? অর্থাৎ– ফরজ নামাজের মত প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ, না ফরজে কেফায়াহ? অর্থাৎ সম্মিলিত ফরজ, যাহার হুকুম এইরূপ যে, যদি কিছু সংখ্যক মুসলমানের দ্বারা প্রয়োজন মিটিয়া যায় তবে সকল মুসলমানের পক্ষ হইতে ঐ ফরজ আদায় হইয়া যায়, কেহই গোনাহগার হয় না, অন্যথায় গোটা জামায়াতই গোনাহগার হয়।

উত্তর ঃ ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী জেহাদ ফরজের মর্যাদা রাখে। তবে অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী কখনো ফরজে আইন হয়। আবার কখনো হয়

ফরজে কেফায়াহ। কখনো তলোয়ার দ্বারা, অবার কখনো মাল দ্বারা। আবার এইরূপও হইয়া থাকে যে, কাহারো উপর তলোয়ার দ্বারা জেহাদ করা ফরজ, আবার কাহারো উপর মাল দ্বারা। আবার যেখানে লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে সত্য প্রচার জরুরী হইবে, সেখানে ঐভাবে সত্য প্রচার করাই ফরজ হইবে এবং উহার পরিণতিতে যেই মুসীবত বরদাশ্‌ত করা হইবে, উহার বিনিময়ে জেহাদের ছাওয়াব পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ঃ জেহাদ কোন্ পর্যায়ের– উহার ফায়সালা কে করিবে?

উত্তর ঃ কোরআনের শিক্ষা হইল, এই ধরনের সকল বিষয়ের ফায়সালা করিবেন "উলিল আমর" বা যথাযথ কর্তৃপক্ষগণ।

প্রশ্ন ঃ "উলিল আম্‌র" কাহারা হইয়া থাকেন?

উত্তর ঃ যদি শরীয়ত অনুযায়ী ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়, তবে হুকুমতের জিম্মাদার (সরকার প্রধান) এবং মজলিশে শুরার সদস্যবর্গ "উলিল আম্‌র" হইবেন। যদি ইসলামী হুকুমত না থাকে, তবে এমন অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন (আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ), অভিজ্ঞ, বিষয়াভিজ্ঞ এবং আলেমগণ "উলিল আম্‌র" হইবেন– যাহারা মুসলমানদের সম্মিলিত নেতৃত্বের অধিকারী হইবেন।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তলোয়ার ব্যতীত অন্য কোন প্রকার জেহাদও করিয়াছেন কি?

উত্তর ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাথমিক অবস্থায় তলোয়ার ছাড়াই জেহাদ করিয়াছেন। অর্থাৎ নরমভাবে মানুষের নিকট ওয়াজ-নসীহত করিয়াছেন। মানুষের যাবতীয় শোবা-সন্দেহ দূর করিয়াছেন এবং এই পথে নির্যাতন এবং মার-ধর সহ্য করিয়াছেন। মজলুম হইয়া জালেমদের (অত্যাচারের) জবাব দিয়েছেন। উন্নত চরিত্র দ্বারা তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। মক্কা শরীফের গোটা পবিত্র জীবনটাই এই

ধরনের জেহাদে অতিবাহিত হইয়াছে। আর খুশির বিষয় হইল পবিত্র কোরআনে এই জেহাদকেই "বড় জেহাদ" বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর তলোয়ার দ্বারা জেহাদ করা কবে ফরজ হয়?

উত্তর ঃ মদীনা আসিবার পর যখন দেখিতে পাইলেন, নিজেদের হেফাজত এবং শত্রুদের অনিষ্ট দমন করিতে তলোয়ার ব্যতীত অন্য কিছুই কাজে আসিবে না, তখন (তলোয়ার দ্বারা জেহাদ করা ফরজ করা হয়)।

প্রশ্ন ঃ যেই জেহাদে দৃশ্যতঃ ধ্বংস, বরবাদী এবং হত্যা ও রক্তপাত হইয়া থাকে, ইসলামে কি কারণে উহার হুকুম করা হইল?

উত্তর ঃ এই হত্যা ও রক্তপাত দ্বারা যেমন জালেমদের বিনাশ অনুভূত হয়, অনুরূপভাবে উহার বহু উপকারিতাও আছে। যেমন–

(ক) অত্যাচারিত ও মজলুম গোত্রসমূহ জালেম সরকারের জুলুম হইতে মুক্তি পায়। তাহারা যেন অনাহার-শ্রম এবং পশুর মত গোলামীর জীবন হইতে মুক্তি পাইয়া মানুষের মত জীবন যাপন করিতে পারে। তাহারা যেন নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করার সুযোগ লাভ করে। দ্বীন ও দুনিয়ার উন্নতির পথ যেন তাহাদের জন্য উন্মুক্ত হয়।

(খ) যেই সকল দুর্বল মানুষ জালেমদের ভয়ে সত্য দ্বীন কবুল করিতে পরিত না, তাহাদের জন্য যেন পথ পরিষ্কার হইয়া যায়।

(গ) ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের বেষ্টনী হইতে মুক্ত হইয়া যেন দ্বীন-দুনিয়ার এছ্‌লাহ ও সংশোধন নিশ্চিন্তভাবে ও সহজ উপায়ে করিতে পারে।

(ঘ) অন্যান্য জাতির উপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করা, যেন উহার ফলে নিজেদের নিরাপত্তা (নিশ্চিত) হইয়া ইসলামের শান-শওকত অক্ষুণ্ন

থাকে এবং ইসলামী দেশসমূহ অন্যদের আক্রমণ হইতে নিরাপদ থাকে।

প্রশ্ন ঃ গাযওয়া, জায়েশ এবং সারিয়ার মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ যেই সকল যুদ্ধে স্বয়ং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অংশগ্রহণ করিয়াছেন সেইগুলিকে গাযওয়া বলা হয়। জায়েশ বলা হয় বড় লশকরকে। আর সারিয়া বলা হয় এমন ছোট সেনা দলকে যাহাতে স্বল্প সংখ্যক মুজাহিদ থাকে।

প্রশ্ন ঃ জায়েশ ও সারিয়ার জন্য কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা আছে কি?

উত্তর ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ছফর-সঙ্গীদের উত্তম সংখ্যা হইল চার জন। সারিয়ার সৈন্যসংখ্যা চারশত হওয়া এবং লশরের সংখ্যা চার হাজার হওয়া ভাল।

কিন্তু স্মরণ রাখিবে যে, আলেমগণ ছোট ছোট সেনাদলকেও সারিয়া বলিয়া থাকেন এবং ইহাও জরুরী মনে করেন না যে, তাহারা যুদ্ধ করার জন্য গিয়াছে কি-না; বরং নবুওয়্যতের যুগে এক-দুই ব্যক্তিকে কোন ঘটনার অনুসন্ধান কিংবা কোন বিষয়ে আলোচনা বা কাহাকেও গ্রেফ্তার করার জন্য প্রেরণ করা হইলে উহাকেও তাহারা সারিয়া বলিয়াছেন।

প্রশ্ন ঃ ইসলামের সর্বপ্রথম লশকর (সেনা দল) ছিল কোন্টি।

উত্তর ঃ হিজরতের প্রথম বৎসর অর্থাৎ হিজরতের মাত্র সাত মাস পর রমজানে যেই সেনা দলটি গঠন হয়।

প্রশ্ন ঃ উহার নেসাপতি কে ছিলেন?

উত্তর ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত চাচা হযরত হামজা (রাঃ)।

প্রশ্ন ঃ উহার গোটা সৈন্যসংখ্যা কত ছিল এবং তাহারা মোহাজের ছিল না আনসারী?

উত্তর ঃ গোটা সৈন্যসংখ্যা ছিল ত্রিশজন, তাহারা সকলে মোহাজের ছিল।

প্রশ্ন ঃ ঐ সেনা দলের পতাকা কেমন ছিল?

উত্তর ঃ সাদা।

প্রশ্ন ঃ পতাকা কাহার হাতে ছিল?

উত্তর ঃ হযরত আবু মারছাদ গানবী (রাঃ)-এর নিকট পতাকা ছিল।

প্রশ্ন ঃ এই সেনা দল কাহার মোকাবেলায় প্রেরণ করা হয়?

উত্তর ঃ কোরাইশদের একটি সশস্ত্র কাফেলার মোকাবেলায়। উহার সরদার ছিল আবু জাহেল। তাহারা সিরিয়া হইতে ব্যবসার পণ্য লইয়া ফিরিতেছিল।

প্রশ্ন ঃ কাফেরদের মোকাবেলায় কতজন মানুষ ছিল?

উত্তর ঃ তিনশত।

প্রশ্ন ঃ এইবার যুদ্ধ হইয়াছিল কি?

উত্তর ঃ মাজদী বিন আমর নামে জুহাইনা গোত্রের একজন বড় ব্যক্তি মীমাংসা করাইয়া দেয় এবং যুদ্ধ হয় নাই।

প্রশ্ন ঃ ইসলামের সর্বপ্রথম তীর কোন্ সেনা দল হইতে এবং কে নিক্ষেপ করে?

উত্তর ঃ ঐ বৎসরেরেই পরবর্তী মাস শাওয়ালে বাত্নে রাবেগ নামক স্থানে আবু সুফিয়ানের মোকাবেলায় একটি দল পাঠানো হয়। ঐ সেনাদল হইতেই হযরত ছাআদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) কাফেরদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করেন। ইসলামের ইতিহাসে ইহাই প্রথম তীর যাহা কাফেরদের উপর নিক্ষেপ করা হয়।

প্রশ্ন ঃ এই সেনা দলের নাম কি, সৈন্যসংখ্যা ও সেনাপতির নাম কি এবং জয় হয়, নাকি পরাজয়?

উত্তর ঃ এই সেনা দলের প্রধান ছিলেন ওবায়দা বিন হারেছ, সুতরাং উহাকে বলা হয় সারিয়ায়ে ওবায়দাহ্ বিন হারেছ। উহার মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল ষাট। আল্লাহ পাক মুসলমানদিগকে বিজয় দান করেন।

প্রশ্ন ঃ সর্বপ্রথম ঐ লশকর কোন্‌টি ছিল যাহার সেনাপতি ছিলেন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম?

উত্তর ঃ যেই লশকরটি ওয়াদ্দান এবং বনী জামরাহ-এর সঙ্গে লড়াই করিতে গিয়াছিল, যাহাকে গাযওয়ায়ে আব্ওয়া অথবা গাযওয়ায়ে ওয়াদ্দান নামে ডাকা হয়।

প্রশ্ন ঃ এই ঘটনা কোন সনে সংঘঠিত হয়, উহার সৈন্যসংখ্যা কত এবং ফলাফল কি দাঁড়ায়?

উত্তর ঃ এই ঘটনা দ্বিতীয় হিজরীতে অনুষ্ঠিত হয়। উহার সৈন্য সংখ্যা ছিল যাট জন এবং পরস্পর সন্ধি হওয়ার ফলে যুদ্ধ হয় নাই।

প্রশ্ন ঃ এই সকল লশকরের সিপাহী কাহারা হইতেন?

উত্তর ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ সকল ছাহাবী যাহারা ঈমান আনিতেন। অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমান যেমন নামাজ-রোজার পাবন্দ হইত, অনুরূপভাবে তাহারা জেহাদের ফরজ আদায় করাকেও জরুরী মনে করিতেন।

মোটকথা, ঐসকল ছাহাবী– যাহারা নিশীতে ওলী ও সাধুজনদের মত আল্লাহর এবাদত করিতেন এবং নামাজের সময় যথার্থ যাহেদদের মত নামাজের জামায়াতে শরীক হইতেন। যাহাদের অন্তর ও মুখে সর্বদা আল্লাহর নাম জারী থাকিত– তাঁহারাই ঐসকল লশকরের সিপাহী হইতেন।

প্রশ্ন ঃ এই সিপাহীদিগকে কি পরিমাণ বেতন দেওয়া হইত এবং হাতিয়ার ও সামরিক পোশাক কোথা হইতে পাইতেন?

উত্তর ঃ বেতনের নামে তাহারা একটি কড়িও পাইতেন না। বরং বেতন

গ্রহণ করা যেন নিজের খেদমতকে বিক্রয় করিয়া দেওয়া (মনে করা হইতে)। তাঁহারা ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক। নিজ নিজ পেশার মাধ্যমেই তাহারা জীবিকার ব্যবস্থা করিতেন এবং তাহাদের সেই পুরাতন ছিন্ন কাপড়ই যুদ্ধের সময় ওরদী ও সামরিক পোশাকে পরিণত হইত। অনুরূপভাবে ভাঙ্গা-চুরা যেই সকল অস্ত্র তাহাদের নিকট থাকিত, যুদ্ধের সময় উহাই ব্যবহার করিতেন।

প্রশ্ন ঃ যেহেতু কোন বেতনভুক্ত সিপাহী ছিল না, সুতরাং কেমন করিয়া সৈন্য বাহিনী গঠন করিতেন?

উত্তর ঃ প্রতিটি ব্যক্তিই সামরিক বিধি-বিধানে পরিজ্ঞাত হইত। প্রয়োজনের সময় খলীফার পক্ষ হইতে ঘোষণা হইত এবং ইসলামের নওজওয়ানরা চতুর্দিক হইতে প্রস্তুত হইয়া নিজ নিজ নাম লেখাইয়া দিত। অর্থাৎ ইহারাই সিপাহীতে পরিণত হইত এবং ইহাদের মধ্য হইতেই এক জনকে সেনাপ্রধান বানাইয়া দেওয়া হইত– তিনি হইতেন কমাণ্ডার। স্মরণ রাখিবার বিষয় হইল– এই ধরনের স্বেচ্ছাসেবকগণই ভারত, মিশর, স্পেন, আফ্রিকা, সিরিয়া ও ইরাক বিজয়কারী ছিলেন।

প্রশ্ন ঃ এই পদ্ধতির উপকারিতা কি?

উত্তর ঃ সাধারণ মানুষের সুখ-সুবিধা এবং সৈন্যসংখ্যার অন্তহীন বৃদ্ধি। কারণ, এই ব্যবস্থার ফলে দেশের প্রতিটি সন্তানেরই সেনাকর্ম ও যুদ্ধ-বিদ্যা সম্পর্কে ওয়াকেফ হওয়া জরুরী হইবে। উহার ফলে যেন দেশের প্রতিটি ব্যক্তিই সৈন্য বাহিনীর একজন সিপাহীতে পরিণত হইবে এবং দেশের যুবকদের যেই সংখ্যা হইবে, সৈন্য সংখ্যাও সেই পরিমাণই হইবে– যাহারা প্রয়োজনের সময় সকল কাজ আঞ্জাম দিতে পরিবে।

এদিকে সিপাহীদের যখন কোন প্রকার বেতন দিতে হইবে না সুতরাং প্রজাদের নিকট হইতে সৈন্যবাহিনীদের জন্য যেই (প্রতিরক্ষা) কর উসুল করা হইত, উহা আর উসুল করা হইবে না। তো প্রজাসাধারণকে যখন টেক্স কম দিতে হইবে তখন অবশ্যই তাহাদের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি পাইবে।

প্রশ্ন ঃ এই সকল ব্যক্তিদেরকে জবরদস্তি যুদ্ধে শরীক করা হইত, না স্বেচ্ছায় শরীক হইত?

উত্তর ঃ স্বেচ্ছায়। মুসলিম মহিলাগণ নিজেদের প্রিয় সন্তানদেরকে এই উদ্দেশ্যে দুধ পান করাইত যে, তাহারা আল্লাহর নামে কোরবান হইবে। যুদ্ধে শরীক হওয়ার আগ্রহ তাহাদের স্বভাবে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মন-মানসিকতা ও কচি অন্তর সমূহেও বসাইয়া দেওয়া হইত। উহার প্রভাবেই যুদ্ধের সময় বড়দের সঙ্গে বাচ্চারাও আগ্রহের সহিত নিজেদের নাম লেখাইত এবং কম বয়সের কারণে তাহাদিগকে ফেরৎ দেওয়া হইলে তাহারা জিদ করিত। যেমন– গাযওয়ায়ে বদরের সময় হযরত ওমায়ের বিন ওয়াক্কাসকে কম বয়সের কারণে (যুদ্ধে অংশ গ্রহণ হইতে) বাধা দেওয়ার কারণে তিনি কান্নাকাটি ও বিলাপ জুড়িয়া দিয়া রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুমতি প্রদান করিতে বাধ্য করিলেন।

ওহোদ যুদ্ধের সময় রাফে' বিন খাদীজ পায়ের পাঞ্জার অঙ্গুলিতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন যেন লম্বায় তাহাকেও জওয়ানদের সমান মনে করা হয়। পরে যখন তাহাকে যুদ্ধে শরীক করা হইল, তখন তাহার সমবয়সী হযরত ছামুরা বিন জুন্দুব সঙ্গে সঙ্গে আরজ করিলেন, হুজুর! আমাকেও যেন ফেরৎ দেওয়া না হয়। কেননা, আমি রাফে' হইতেও শক্তিশালী এবং তাহাকে হারাইয়া দেই।

সুতরাং তাহাদের মধ্যে মোকাবেলা করানো হইলে সত্য সত্যই ছামুরা ফাফে'কে হারাইয়া দিল। পরে বাধ্য হইয়া উভয়কেই জেহাদে শরীক করা হইল। এইরূপ অসংখ্য ঘটনা[১] আছে যাহা বর্ণনা করিতে হইলে একটি দীর্ঘ কিতাবের আবশ্যক হইবে।

টীকা

১। ওহোদ প্রান্তরে তুমুল সংঘর্ষ চলাকালে জনৈক গ্রাম্য ছাহাবী অনতি দূরে দাঁড়াইয়া খেজুর খাইতেছিলেন। (যুদ্ধের ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া তিনি আর নিজেকে

শব্দার্থ ঃ

(মূল উর্দূ কিতাবের পাঠকদের জন্য)

اجتماعی – সম্মিলিতভাবে, সকলে মিলিয়া। تحریر – লেখা, লেখনী, লেখার পদ্ধতি, রচনা, দলীল, মুক্ত করিয়া দেওয়া, ছাড়িয়া দেওয়া। نتیجہ – ফলাফল, পরিণাম ফল, পরিণতি, শেষ, সমাপ্তি, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য। مجلس شوری – পরামর্শ সভা। صاحب بصیرت – দৃষ্টিমান, বুদ্ধিমান, অন্তরদৃষ্টিসম্পন্ন। تجربہ کار –

পূর্বের পৃষ্ঠার টীকার পর

সামলাইয়া রাখিতে পারিলেন না) তাহার আত্মসম্মানে ঠেউ খেলিয়া গেল। সামনে আগাইয়া গিয়া রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি জেহাদে অংশগ্রহণ করিয়া মৃত্যুবরণ করি তবে আমার ঠিকানা কোথায় হইবে? এরশাদ হইল– 'জান্নাত'। ছাহাবীর কানে এই কথা প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে (হাতের) খেজুরগুলি দূরে নিক্ষেপ করিয়া সৈন্যদের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং (যুদ্ধ করিতে করিতে) শাহাদাত বরণ করিলেন।

অনুরূপভাবে যাদুল মায়াদে হযরত ওমায়েরের ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তবুকের যুদ্ধে গরীব ছাহাবীগণ যখন সওয়ারীর অভাবে পথ অতিক্রম করিতে পারিতেছিলেন না এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের জন্য কোন ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না, তখন ছাহাবীগণ কাঁদিতে কাঁদিতে অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং রাতভর আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করিয়া দোয়া করিলেন। অবশেষে আল্লাহ পাক তাহাদের দোয়া কবুল করিলেন এবং তাহাদের সওয়ারীর ব্যবস্থা হইয়া গেল।

গাযওয়ায়ে ওহোদে যখন এই কথা রটিয়া গেল যে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদাত বরণ করিয়াছেন, তখন হযরত আনাস বিন নাজার (রাঃ) সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেনঃ এখন আমাদের জীবন অর্থহীন। অতঃপর নিজের সঙ্গীদেরকে সংবাদ দিলেন, আমি জান্নাতের খোশবু পাইতেছি। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধে ঝাপাইয়া পড়িলেন এবং আনুমানিক সত্তরটি আঘাতের পর শাহাদাত বরণ করিলেন।

অভিজ্ঞ, পারদর্শী, কোন বিষয়ে প্রভূত জ্ঞানসম্পন্ন। معامله فهم – বিষয়াভিজ্ঞ, কোন বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞানসম্পন্ন। اهل علم বিদ্যান, আলেম, শিক্ষিত, যিনি এলেম হাসিল করিয়াছেন। سربراهی – নেতৃত্ব, পরিচালনা, বন্দোবস্ত, চেষ্টা। مثلا – দৃষ্টান্ত স্বরূপ, উদাহরণ স্বরূপ, যেমন। نرغه – মানুষের ভীড়, পরিবেষ্টন। شوكت – মর্যাদা, আড়ম্বর, জাঁকজমক, শক্তি, সামর্থ্য, প্রভাব। برقرار বহাল, অক্ষুণ্ন, প্রতিষ্ঠিত, স্থায়ী। مسلح – সশস্ত্র, অস্ত্রধারী, বর্ম পরিহিত। بیچ بچاؤ – মধ্যস্ততা, মীমাংসা, সালিসী, ফায়সালা, অনিষ্ট দমন, ঝগড়া-বিবাদ দূর করা, সন্ধি, মিলমিশ, ঐক্য, একতা। زاهد – সাধক, পার্থিব বিষয়ে অনাসক্ত, ধর্মনিষ্ঠ, পরহেজগার, মুত্তাকী। تنخواه – মাসিক বেতন, মাহিনা, মাসহারা, মাস শেষে কর্মের বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থ। وردی – সৈনিকদের পোশাক, কর্মচারীদের নির্দিষ্ট পোশাক। رضاكار – আপন ইচ্ছায় বিনামূল্যে সেবা দানকারী, স্বেচ্ছাসেবক, ভ'লান্টিয়ার। سپه گری – সৈনিকের কাজ, সেনাকর্ম। قواعد جنگ – যুদ্ধের নিয়মাবলী, যুদ্ধবিদ্যা, রণকৌশল। لگان – জমির খাজনা, জমাবন্দী, কর, সরকারী টেক্স। پچھاڑنا – মল্লযুদ্ধ বা কুস্তিতে পরাজিত করা, চিৎপাত করা, হারাইয়া দেওয়া, অপারগ করিয়া দেওয়া, বিপর্যস্ত করিয়া দেওয়া, দুর্বল করিয়া দেওয়া, মারিয়া ফেলা, হত্যা করা, বিজয়ী হওয়া, আগে বাড়িয়া যাওয়া, বাজিমাত করা।

ইসলামী যুদ্ধসমূহ

প্রশ্ন ঃ কয়টি যুদ্ধে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং অংশগ্রহণ করেন?

উত্তর ঃ আল্লামা মোগলতাই এর বক্তব্য অনুযায়ী যেই সকল যুদ্ধে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অংশগ্রহণ করিয়াছেন উহার সংখ্যা ২৩। তবে কেহ কেহ উহার সংখ্যা ২৭ বলিয়াছেন।

প্রশ্ন ঃ যেই সকল যুদ্ধ ও সেনাদলে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অংশগ্রহণ করেন নাই; উহার সংখ্যা কত?

উত্তর ঃ উপরে বর্ণিত বিশেষজ্ঞের মতে উহার সংখ্যা ৪৪। তবে কোন কোন রেওয়ায়েতে উহার অধিকও বলা হইয়াছে।

প্রশ্ন ঃ যেই সকল বাহিনীতে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অংশ লইয়াছেন উহার কয়টিতে যুদ্ধ হয় এবং সেই সকল যুদ্ধের নাম কি?

উত্তর ঃ নয়টি বাহিনীতে যুদ্ধ হয়। সেইগুলির নাম এই– (১) বদরের প্রথম যুদ্ধ। (২) বদরের দ্বিতীয় যুদ্ধ। (৩) ওহোদ যুদ্ধ। (৪) আহযাবের যুদ্ধ অথবা খন্দকের যুদ্ধ। (৫) বনী কোরাইজার যুদ্ধ। (৬) বনী মুস্তালাকের যুদ্ধ। (৭) খায়বরের যুদ্ধ। (৮) হোনায়েনের যুদ্ধ। (৯) তায়েফের যুদ্ধ।

প্রশ্ন ঃ অপরাপর যুদ্ধে কি হয়?

উত্তর ঃ সন্ধি স্থাপিত হয় অথবা এমন কোন অবস্থা সামনে আসে যাহার ফলে শত্রুপক্ষ দমিয়া যায় এবং যুদ্ধ হইতে পারে নাই।

প্রশ্ন ঃ এই সকল যুদ্ধের এই নাম কিভাবে রাখা হয়?

উত্তর ঃ বদর, ওহোদ এবং হোনায়েন স্থান বা গোত্রের নাম। যেই স্থান বা যেই গোত্রে যুদ্ধ হয় উহার নাম অনুযায়ী যুদ্ধের নাম রাখা হয়।

প্রশ্ন ঃ কয়টি যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় হয়?

উত্তর ঃ আল্লাহ পাকের ফজলে ইসলামে সর্বদা বিজয়ের পাতাকাই উড্ডীন ছিল। কেবল ওহোদ যুদ্ধে ভুলক্রমে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা (হুকুম) অমান্য করার কারণে পরাজয় হয়। তা ছাড়া হোনায়েনের যুদ্ধে মুসলমানগণ প্রথমে পিছু হটিয়া গিয়াছিল, পরে উহাতেও আল্লাহ বিজয় দান করেন।

প্রথম হিজরীর বড় বড় যুদ্ধ এবং প্রসিদ্ধ ঘটনাসমূহ

প্রশ্ন ঃ ১ম হিজরীতে কয়টি গাযওয়া অনুষ্ঠিত হয় এবং কয়টি সেনাদল প্রেরণ করা হয়?

উত্তর ঃ কোন গাযওয়া হয় নাই, অবশ্য দুইটি সেনাদল প্রেরণ করা হয়। অর্থাৎ– হযরত হামজার দল এবং হযরত ওবায়দা বিন হারিছ (রাঃ)-এর দল।

প্রশ্ন ঃ ১ম হিজরীর অপরাপর বড় ঘটনা কি?

উত্তর ঃ (১) মসজিদে নববী নির্মাণ (২) আজানের তা'লীম (৩) প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ছালাম এবং হযরত ছালমান ফারসী (রাঃ) ইসলাম দ্বারা সৌভাগ্যবান হন।

দ্বিতীয় হিজরী

কেবলা পরিবর্তন এবং গাযওয়ায়ে বদর ইত্যাদি

প্রশ্ন ঃ কোন্ দলটি সর্বপ্রথম গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) লাভ করে?

উত্তর ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহাশের দল।

প্রশ্ন ঃ উহাতে কত জন মানুষ ছিল, তাহারা মোহাজের ছিল, না আনসারী এবং তাহাদের দলপতি কে ছিলেন?

উত্তর ঃ ১২ জন মোহাজের। দলপতি ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ।

প্রশ্ন ঃ এই দলটি কোথায় গিয়াছিল?

উত্তর ঃ নাখলা নামক স্থানে।

প্রশ্ন ঃ এই দলটি প্রেরণের উদ্দেশ্য কি ছিল?

উত্তর ঃ একটি কোরায়শী কাফেলার সঙ্গে মোকাবেলা করা।

প্রশ্ন ঃ এই ঘটনা কোন্ মাসে ঘটে?

উত্তর ঃ রজব মাসে।

প্রশ্ন ঃ রজব মাস সম্পর্কে আরবদের বিশেষ কোন আকীদা ছিল কি?

উত্তর ঃ চারটি মাসকে আরবের লোকেরা "নিষিদ্ধ মাস" মনে করিত এবং উহার খুব সম্মান করা হইত। ঐ চারটি মাসে যুদ্ধ করা হারাম মনে করা হইত। রজব ছিল ঐ চার মাসেরই এক মাস। অবশিষ্ট তিনটি মাস ছিল– জিক্বাআদাহ, জিলহাজ্জাহ এবং মোহররম।

প্রশ্ন ঃ এই বিশ্বাসের কোন ফায়দা ছিল কি?

উত্তর ঃ আরবের অধিবাসীরা দিনরাত মারামাটি, লুণ্ঠন এবং ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত থাকিত তাহাদের উপার্জনের একমাত্র উপায় ছিল– ডাকাতি ও লুটতরাজ। এই কারণেই আরবের জমিন আরববাসীদের জন্য বড় সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ডাকাতি ও লুণ্ঠনের কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ছফর করা বড় দুষ্কর ছিল। উপরোক্ত বিশ্বাসের কারণে ঐ চার মাস তাহারা কিছুটা শ্বাস গ্রহণের সুযোগ পাইত। উহা দ্বারা অন্ততঃ এই ফায়দাটুকু হইত।

প্রশ্ন ঃ ঐ যুদ্ধের ফলাফল কি হইল?

উত্তর ঃ মুসলমানদের বিজয় অর্জিত হয়। কাফেলার সরদার নিতহ্ হয় এবং দুই ব্যক্তি গ্রেফ্তার হয়। অবশিষ্টরা পালাইয়া যায় এবং বহু সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়।

প্রশ্ন ঃ ঐ সম্পদ কি করা হয়?

উত্তর ঃ দলের লোকদের মধ্যে বন্টন করা হয় এবং এক পঞ্চমাংশ ইসলামী খাজানা (বাইতুল মাল)-এর জন্য সংরক্ষিত করা হয়।

প্রশ্ন ঃ উহার পূর্বেও কি মুসলমানগণ গনীমতের মাল পাইয়াছিল? অথবা মুসলমানগণ কাহাকেও হত্যা বা বন্দী করিয়াছিল কি?

উত্তর ঃ না। ইহাই ছিল সর্বপ্রথম সুযোগ। একজন শত্রু নিহত, দুইজন গ্রেফ্‌তার এবং গনীমতের মালও হস্তগত হয়।

প্রশ্ন ঃ রজব সম্পর্কে যেহেতু আরবদের এই বিশ্বাস ছিল যে, ঐ মাসে যুদ্ধ করা হারাম, তখন মুসলমানদের ঐ যুদ্ধের ফলে তাহারা কি মন্তব্য করিল এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর উহার কি প্রতিক্রিয়া হইল?

উত্তর ঃ (এই বিষয়ে) তাহারা অনেক প্রতিবাদ করিল এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কষ্ট পাইলেন।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে উহার ইসলামী সমাধান কি হইল?

উত্তর ঃ একটি আয়াত নাজিল হয়, যাহার অর্থ এই–

বলিয়া দেওয়া হউক যে, ঐসকল মাসে যুদ্ধ করা ভাল নহে, কিন্তু অভিযোগকারীগণ যেন নিজেদের দিকে তাকাইয়া দেখে এবং চিন্তা করে যে– (১) অন্যকে আল্লাহর পথ হইতে বাধা দেওয়া (২) স্বয়ং নিজের মালিক ও সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার এবং কুফরী করা (৩) মানুষকে মসজিদে হারাম (কাবা ঘর)-এ প্রবেশ করা হইতে বাধা দেওয়া (৪) স্থায়ী বাসিন্দাদিগকে এবং বিশেষভাবে আল্লাহর পবিত্র ও নিরাপদ শহরের অধিবাসীদিগকে তাহাদের শহর হইতে বহিষ্কার করা– এই সকল কর্মসমূহ যাহা অভিযোগকারীগণ দিনরাত করিতেছে এবং যাহাদের দ্বারা অনেক বড় ফেতনা বিস্তার লাভ করিতেছে– তাহা রজবের রেওয়াজী ও লোকদেখানো তা'জীম অপেক্ষা বহু ত্রুটিপূর্ণ, লজ্জাজনক এবং ধ্বংসাত্মক।

সারাংশ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহাশের বাহিনীই সর্বপ্রথম গনীমত লাভ করে

এবং তাহারাই সর্বপ্রথম (শত্রুপক্ষের) দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার এবং এক জনকে হত্যা করে। এই দলে ১৪ জন মোহাজের ছিলেন এবং দলপতি ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ। এই সেনাদলকে কোরাইশী কাফেলার সংবাদ সংগ্রহের জন্য নাখলা নাকম স্থানে পাঠানো হইয়াছিল। ঘটনাক্রমে সেখানে সংঘর্ষ হয়। কাফেরদের আকীদা ও বিশ্বাস অনুযায়ী রজব মাসে যুদ্ধ হারাম ছিল। কিন্তু দুর্ঘটনাক্রমে ঐ সংঘর্ষ যেহেতু রজব মাসে অনুষ্ঠিত হয়, সুতরাং তাহারা উহার বহু সমালোচনা করে। কিন্তু তাহাদের জুলুমের তুলনায় ঐসকল অভিযোগের হাকীকত যেন "ক্রোধান্বিত বিড়ালের খাম্বা আঁচড়ানো"-এর মত ছিল। অর্থাৎ নিজের ক্রোধ ও লজ্জার ঝাল অপরের উপর মিটানোর মত।

শব্দার্থ ঃ

(মূল উর্দূ কিতাবের পাঠকদের জন্য)

لڑائی – যুদ্ধ, সংঘর্ষ, লড়াই, মোকাবেলা, প্রতিযোগিতা, সংগ্রাম, বিবাদ, মারামারি, শত্রুতা। مذکور – বর্ণিত, যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে, আলোচিত, উল্লেখিত। پھریرا – পতাকা, ঝাণ্ডা, নিশান। رنج – দুঃখ, বেদনা, দুর্দশা, মনোকষ্ট, অসুস্থতা, আফসোস, অনুতাপ। بے بسائی – স্থায়ী নিবাসী, আদি নিবাসী, বহুকাল যাবৎ বসবাস করিতেছে এইরূপ। معیوب – ত্রুটিপূর্ণ, মন্দ, খারাপ, কুৎসিত, অকেজো, লজ্জার কারণ।

গাযওয়ায়ে বদর

প্রশ্ন ঃ বদর কি এবং এই যুদ্ধকে গাযওয়ায়ে বদর বলা হয় কেন?

উত্তর ঃ বদর একটি কূপের নাম। উহার সহিত সংশ্লিষ্টতার কারণেই তথায় অবস্থিত গ্রামটিকেও বদর বলা হয়। আর (আলোচিত) যুদ্ধটি যেহেতু

উহার নিকটেই অনুষ্ঠিত হয়, এই কারণে উহার নামও বদর রাখা হয়।

প্রশ্ন ঃ বদর মদীনা হইতে কি পরিমাণ দূরত্বে অবস্থিত?

উত্তর ঃ আশি মাইল।

প্রশ্ন ঃ এই জেহাদের কারণ এবং জেহাদে যাত্রার সংক্ষিপ্ত অবস্থা বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ এই কথা পূর্বেই জানা গিয়াছে যে, হিজরতের পর মক্কার কাফেররা ইসলাম এবং মুসলমানদিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলার উদ্দেশ্যে আগের তুলনায় আরো বেশী বিবিধ প্রকার পরিকল্পনা করিতেছিল। তাহাদের অনিষ্ট হইতে বাঁচিবার উদ্দেশ্যে মুসলমানদেরও চেষ্টা-তদ্বিরের প্রয়োজন ছিল। ইহাও জানা গিয়াছে যে, (মুসলমানগণ নিজেদের আত্মরক্ষার) উপায় হিসাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল যে, মক্কাবাসীদের যেই কাফেলা মদীনার নিকট দিয়া অতিক্রম করিয়া সিরিয়া গমন করে, উহার ক্ষতিসাধন করা হইবে, যেন তাহাদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়– যাহা তাহাদের কোমরকে শক্তিশালী করা এবং অহংকারে শক্তি দানের মাধ্যম ছিল। (অর্থাৎ– এই ব্যবসাই ছিল তাহাদের যাবতীয় অহংকার ও শক্তি-মত্তার প্রধান উৎস)।

এইরূপ অবস্থা হইল যে, হিজরতের দুই বৎসর পর জানা গেল, কোরাইশদের একটি বিরাট (ব্যবসায়ী) কাফেলা পণ্য লইয়া সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সঙ্গীদেরকে লইয়া তাহাদের মোকাবেলা করার জন্য বাহির হইয়া 'রাওহা' নামক স্থানে গিয়া অবস্থান লইলেন। কিন্তু (কোরাইশী) কাফেলার সরদার এই খবর জানিয়া ফেলিল এবং প্রান্তপথ ধরিয়া ভিন্ন পথ অবলম্বন করিল। একজন আরোহীকে (এই মর্মে সংবাদ দিয়া) মক্কায় পাঠাইয়া দিল যে, মুসলানদের কারণে আমরা বিপদে আছি। মক্কার কাফেররা পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। এই সংবাদ পাইয়া তাহারা সঙ্গে সঙ্গে রওনা হইল।

এদিকে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (ঘটনার বিস্তারিত) সংবাদ অবহিত হইলেন, তখন ছাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। মোহাজেরগণ প্রবল উত্তেজনার সহিত নিজেদের উৎসাহ প্রকাশ করিল। আঁ-হজরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের প্রশ্নটি (বক্তব্যটি) দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার পুনরোল্লেখ করিলেন, মোহাজেরগণ প্রতিবারই অনুরূপ আগ্রহ ও উত্তেজনার সহিত জবাব দিল। পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল, আনসারী বুজুর্গরাও যেন জবাব দেয়। যখন আনসারগণ বিষয়টি উপলব্ধি করিল, তখন খাযরাজ গোত্রের সরদার হযরত ছাআদ বিন মোয়াজ (রাঃ) উঠিয়া আরজ করিলেন– আল্লাহর শপথ! "যদি (আপনার) হুকুম হয় তবে আমরা সমূদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িব।[১]

হযরত মেকদাদ (রাঃ) বলিয়া উঠিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার ডানে-বায়ে এবং অগ্রে ও পশ্চাতে থাকিয়া যুদ্ধ করিব। আমরা এমন নই যে, বলিয়া দিব– "আপনি এবং আপনার আল্লাহ গিয়া যুদ্ধ করুন, আমরা এখানে বসিলাম"।

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদের এই উৎসাহ উত্তেজনা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন।

টীকা

১। হযরত ছাআদ বিন মোয়াজের পূর্ণ জবাবটি ছিল এইরূপঃ আমি আনসারদের প্রতিনিধি হিসাবে আরজ করিতেছি, আপনি যার সঙ্গে ইচ্ছা সম্পর্ক স্থাপন করুন এবং যার সঙ্গে ইচ্ছা ছিন্ন করুন। যার সঙ্গে ইচ্ছা সন্ধি করুন এবং যার সঙ্গে ইচ্ছা যুদ্ধ করুন; আমরা সকল অবস্থাতেই আপনার সঙ্গে আছি। আমাদের জান-মাল আপনার উপর উৎসর্গকৃত। উহা হইতে যেই পরিমাণ ইচ্ছা হয় আপনি গ্রহণ করুন এবং আপনার যাহা মনে চায় আমাদিগকে দান করুন। যেই সম্পদ আমাদের নিকট থাকিবে উহা অপেক্ষা যাহা আপনি গ্রহণ করিবেন উহাই আমাদের নিকট অধিক প্রিয় হইবে।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের জবাবের অপেক্ষা করিলেন কেন?

উত্তর ঃ কেননা, তাহাদের সঙ্গে এই চুক্তি হইয়াছিল যে, তাহারা মদীনার ভিতরে থাকিয়া যুদ্ধ করিবে, আর এখানে ছিল মদীনার বাহিরের ঘটনা।

প্রশ্ন ঃ রাওহা মদীনা হইতে কোন দিকে এবং কত দূরে অবস্থিত?

উত্তর ঃ মদীনার দক্ষিণ দিকে ৪০ মাইল দূরে।

প্রশ্ন ঃ বদরে গমন করিয়া ইসলামী লশকর কি দেখিতে পাইল?

উত্তর ঃ তাহারা দেখিতে পাইল, কাফেরদের বিশাল সৈন্যবাহিনী বিপুল সাজ-সরঞ্জাম লইয়া পূর্বাহ্নেই তথায় পৌঁছিয়া গিয়াছে এবং বদর প্রান্তরে এমন সুবিধাজনক স্থান দখল করিয়া লইয়াছে, যেখানে পানি ইত্যাদির সর্ববিধ আরাম ও সুবিধা ছিল।

প্রশ্ন ঃ মুসলমানগণ যেই জায়গা পাইল উহা কেমন ছিল?

উত্তর ঃ ময়দানে মুসলমানদের অবস্থানস্থলটি ছিল অত্যন্ত বালুকাময় এবং তথায় চলাচল করা দুষ্কর ছিল। সেখানে পানিরও অভাব ছিল।

প্রশ্ন ঃ এই ক্ষেত্রে কি উপায়ে আল্লাহর পক্ষ হইতে বিজয় ও সাহায্যের ওয়াদার বিকাশ ঘটে?

উত্তর ঃ আল্লাহ পাক বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যার ফলে কাফেরদের অবস্থানস্থলে কাঁদা জমিয়া তাহাদের চলাচলে সংকট সৃষ্টি হয়। (পক্ষান্তরে) মুসলমানদের অংশের মাঠের বালি বসিয়া যায়। তাহারা নিজেদের পাত্রসমূহ বৃষ্টির পানি দ্বারা ভরিয়া রাখে এবং একটি হাউজ বানাইয়া উহাতে পানি জমা করিয়া রাখে। এই পর্যায়ে মাঠের ভাল দিকটি হইল মুসলমানদের অংশে এবং মন্দ দিকটি হইল কাফেরদের অংশে।

প্রশ্ন ঃ এই লশকর কত তারিখে মদীনা হইতে যাত্রা করে?

উত্তর ঃ ১২ই রমজানুল মোবারক, রোজ বৃহস্পতিবার, মোতাবেক ৮ই মার্চ ৬২৪ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন ঃ বদরে উপস্থিতি হয় কবে?

উত্তর ঃ (রমজানের) ১৭ তারিখ রাতে (অর্থাৎ ১৬ই রমজান দিবাগত রাতে) এশার সময়।

প্রশ্ন ঃ কত তারিখে এবং কি বারে যুদ্ধ হয়?

উত্তর ঃ ১৭ রমজানুল মোবরক, মঙ্গলবার, মোতাবেক ১৩ই মার্চ ৬২৪ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন ঃ মুসলমান এবং কাফেরদের সৈন্যসংখ্যা কত ছিল?

উত্তর ঃ মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল সর্বমোট ৩১৩ জন এবং কাফেরদের ৯৫০ জন।

প্রশ্ন ঃ ৩১৩ জন মুসলমান কোন্ কোন্ জামায়াতের ছিল?

উত্তর ঃ ৮৬ জন মোহাজের এবং আনসারদের মধ্য হইতে আউস গোত্রের ৬১ জন এবং খাযরাজ গোত্রের ১৬৬ জন।

প্রশ্ন ঃ রণসামগ্রীর বিস্তারিত বিবরণ দাও।

উত্তর ঃ কাফেরদের নিকট সাতশত উট, একশত ঘোড়া এবং সমুদয় অস্ত্র, লৌহবর্ম ও শিরস্ত্রাণের কারণে যেন গোটা বাহিনী লৌহ-উপকরণে ডুবিয়া ছিল। অপর পক্ষে মুসলমানদের নিকট ছিল মাত্র দুইটি ঘোড়া, সত্তরটি উট এবং কয়েকটি তলোয়ার।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী লশকরের প্রধান কে ছিলেন এবং এই যুদ্ধকে গাযওয়া বলা হইবে, না সারিয়া?

উত্তর ঃ সেনাপ্রধান ছিলেন স্বয়ং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

সুতরাং উহাকে গাযওয়া বলা হইবে।

প্রশ্ন ঃ কাফেরদের দলপতি কে ছিল?

উত্তর ঃ আবু জাহেল।

প্রশ্ন ঃ ইসলামের পতাকা কার কার নিকট ছিল?

উত্তর ঃ বড় পতাকাটি ছিল হযরত মাসআব বিন ওমায়েরের নিকট। একটি ছোট পতাকা হযরত আলী (রাঃ)-কে দেওয়া হয় এবং আনসারদের পতাকা ছিল হযরত ছাআদ বিন মোয়াজ (রাঃ)-এর নিকট।

প্রশ্ন ঃ এই যুদ্ধের ফলাফল কি হয়?

উত্তর ঃ মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ পাক বিরাট সাফল্য দান করেন। সত্তর জন কাফের নিহত হয়, যার মধ্যে মুসলমানদের সবচাইতে বড় শত্রু এবং কাফেরদের বড় সরদার আবু জাহেলও ছিল, যেই ব্যক্তি হিজরতের সময় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার পরামর্শ দিয়াছিল। আবু জাহেল ব্যতীত আরো ১১ ব্যক্তি নিহত হয় যাহারা (রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) হত্যার পরামর্শ দানে শরীক ছিল। তাছাড়া ৭০ জন কাফের গ্রেফতার হয় এবং বিপুল পরিমাণ সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়।

প্রশ্ন ঃ এই যুদ্ধে মোট কত জন মুসলমান শহীদ হয়। আনসারদের সংখ্যা কত এবং মোহাজেরদের সংখ্যা কত?

উত্তর ঃ মোট ১৪ জন। ৮ জন আনসার (৬ জন খাযরাজ গোত্রের এবং ২ জন আউস গোত্রের) এবং ৬ জন মোহাজের।

প্রশ্ন ঃ যেই সকল কাফের বন্দী হয় তাহাদের সঙ্গে কি ধরনের আচরণ করা হয় এবং তাহাদিগকে কোথায় রাখা হয়?

উত্তর ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বন্দীদের) দুই দুই জন এবং চার চার জন করিয়া ছাহাবাদের হাওয়ালা করিয়া দিলেন এবং

স্বাভাবিক নিয়মের[১] সম্পূর্ণ বিপরীতে তাঁহার রহমতের জবান হইতে হুকুম ঘোষণা হইল যে, "তাহাদের সঙ্গে যেন উত্তম আচরণ করা হয়"।

প্রশ্ন ঃ উভয় জগতের সরদার ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হুকুম কিভাবে পালন করা হয়?

উত্তর ঃ ছোবহানাল্লাহ! এই দৃশ্য ছিল দেখার মত। ছাহাবায়ে কেরাম নিজেদের প্রিয় সন্তানদের পেট ভরাইতেন (ক্ষুধা নিবারণ করাইতেন) সাধারণ খেজুর দ্বারা, কিন্তু নেতার হুকুম পালনার্থে সেই ভিন্ন শ্রেণীর মেহমানদিগকে নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী উত্তম হইতে উত্তম খানা খাওয়াইতেছিলেন।

তাহাদের নিকট কাপড় ছিল না। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের কাপড়ের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু হযরত আব্বাস (রাঃ) এত দীর্ঘকায় ছিলেন যে, অপর কাহারো জামা তাহার গায়ে লাগিল না। পরে মোনাফেক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই নিজের জামা তাঁহাকে দিয়া দিলেন।[২]

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত আব্বাস এবং তাঁহার জামাতা আবুল আস যাহারা তখনও কাফের ছিলেন এবং বদরে

টীকা

১। এখানে স্মরণ রাখিবার বিষয় হইল– ইহারা ঐসকল হত্যাযোগ্য অপরাধী যাহারা অনুক্ষণ ইসলাম এবং মুসলমানদের মূলোৎপাটনের চেষ্টায় লিপ্ত ছিল এবং বদরেও এই উদ্দেশ্যেই আগমন করিয়াছিল।

২। আব্দুল্লাহ বিন উবাই'র ইন্তেকালের পর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জামা মোবারক তাহাকে পরাইয়াছিলেন। ওলামাদের ধারণা– মোনাফেক নেতা সেইদিন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত আব্বাসের প্রতি যেই উদারতা প্রদর্শন করিয়াছিল, উহার প্রতিদান হিসাবেই হয়ত তাহার প্রতি এই সদয় আচরণ করা হয়।

গ্রেফতার হইয়াছিলেন, তাহাদের সঙ্গেও কি অন্য সকলের মতই ব্যবহার করা হইয়াছে, না কিছুটা পার্থক্য ছিল?

উত্তর ঃ ইসলামের (সাম্য) নীতিতে বাদশাহ্ ও ফকীর, বাদশার আত্মীয় এবং সাধারণ প্রজা সকলেই এক সমান। তবে (স্বজনদের প্রতি) মোহাব্বত ও ভালবাসার এই আছর অবশ্যই ছিল যে, রশির বন্ধন ও বন্দীত্বের যাতনায় গভীর রাতে যখন হযরত আব্বাসের কাতর ধ্বনি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কানে প্রবেশ করিল, তখন তাঁহার নিদ্রা টুটিয়া গেল। কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও সাম্যের নীতি স্বভাবসুলভ ভালবাসার উপর অগ্রগণ্য ছিল।

প্রশ্ন ঃ তাহারা (এই সকল বন্দীরা) কিভাবে মুক্ত হয়?

উত্তর ঃ পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত হয় যে, তাহাদিগকে এইভাবে মুক্ত করা হকউ–

(১) সামর্থ্যবানদের নিকট হইতে চার হাজার দেরহাম (মুক্তিপণ) অর্থাৎ প্রায় এক হাজার টাকা (বর্তমানে আরো বেশী) লওয়া হইবে।

(২) যাহারা আমীর ও বিত্তবান, তাহাদের নিকট হইতে আরো কিছু বেশী লওয়া হইবে।[১]

(৩) আর বিত্তহীন গরীবদের মুক্তিপণ এই নির্ধারণ করা হইল যে, তাহারা দশ দশজন মুসলিম-শিশুকে লেখাপড়া শিখাইয়া দিবে এবং মুক্ত হইয়া চলিয়া যাইবে। (অর্থাৎ মুসলিম বালকদের শিক্ষাদানই বিত্তহীন বন্দীদের মুক্তিপণ হিসাবে গণ্য করা হয়)।

টীকা

১। ঘটনাক্রমে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত আব্বাস এই বিত্তবানদের দলভুক্ত ছিলেন। সুতরাং তাহার নিকট হইতেও অতিরিক্ত পণ লওয়া হইল। হযরত আবুল আসের নিকট কিছুই ছিল না। তিনি নিজের স্ত্রী অর্থাৎ

প্রশ্ন ঃ মুসলমানদের এই আচরণ দ্বারা কি শিক্ষা পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ (১) ইসলামের উদারতা ও সহিষ্ণুতা (২) শত্রুদের প্রতি সদয় আচরণ (৩) উন্নত চরিত্রের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার এবং (৪) শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা। সুতরাং অপরাধী কাফেরদিগকেও উস্তাদ বানাইতে কুণ্ঠাবোধ করা হয় নাই।

প্রশ্ন ঃ যুদ্ধ-পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উত্তর ঃ আসমান ও জমিন গোটা পৃথিবীর ইতিহাসে এক নূতন দৃশ্য অবলোকন করিতেছিল। ময়দানের এক কোনে কয়েকজন মানুষ দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন, অনাহারক্লিষ্ট চেহারাগুলি মূর্ছা যাওয়ার

পূর্বের পৃষ্ঠার পর

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা হযরত জয়নবের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। তিনি তখন মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন। সংবাদ পাইয়া তিনি (পণ হিসাবে) একটি হার পাঠাইয়া দিলেন। ঐ হারটি জননী হযরত খাদীজা (রাঃ) আহাকে দিয়াছিলেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (প্রিয়তমা স্ত্রীর স্মৃতি বিজড়িত) তারটি দেখিবামাত্র অশ্রুস্বজল হইয়া উঠিলেন এবং ছাহাবায়ে কেরামকে বলিলেন, তোমরা যদি সম্মত হও; তবে জয়নবের মাতার স্মৃতি বিজড়িত হারটি তাহার নিকট ফেরত পাঠাইয়া দিতে পার। ছাহাবীগণ আনন্দের সহিত এই প্রস্তাব কবুল করিলেন এবং আবুল আসকে বলিয়া দিলেন, যেন হযরত জয়নবকে মদীনায় পাঠাইয়া দেয়। অবশেষে এইরূপই হইল।

হযরত খাদীজা (রাঃ) ছিলেন সর্বপ্রথম মুসলিম মহিলা। সুতরাং তাঁহার গলার হারটি একজন কাফেরের মুক্তিপণ হিসাবে গ্রহণ করা যেন ইসলামের স্বকীয় (মূল্যবোধের) প্রশ্নে দোষণীয় ছিল। সম্ভবতঃ এই শিক্ষণীয় বিষয়টিই রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অশ্রুস্বজল করিয়া তুলিয়াছিল এবং এই অনুভূতিই ছাহাবায়ে কেরামের চেতনাকেও নাড়া দিয়াছিল।

মত, নগ্নপদ এবং কেহ কেহ কেবল একটি লুঙ্গি জড়াইয়া আছে, আবার কাহারো গায়ে ছেঁড়া জামা জড়ানো। তাহাদের হাতে ছেঁড়া কাপড়ে জড়ানো কয়েকটি তলোয়ার এবং কেহ কেহ লাঠিসোটা ও লাকড়ি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কিন্তু মজার ব্যাপার হইল– গোটা পৃথিবীতে মাত্র পাঁচ-দশ জন ব্যতীত (এই পক্ষের) আর যাহারা আছেন তাহাদের সকলে এখানেই উপস্থিত। ইহারা ব্যতীত তাহাদের আর কোন সাহায্যকারী, সহানুভূতিকারী, সাহায্যকারী বাহিনী কিংবা আহতদের চিকিৎসাকারী বা শহীদদের দাফন করিবার মতও কেহ নাই। (যুদ্ধে জয় লাভ করিলে) তাহাদের বিজয়ে শোভাযাত্রা বাহির করিবারও কেহ নাই এবং পরাজয়ের পর তাহাদের সঙ্গে কান্না করিবারও কেহ নাই।

আল্লাহরে হিম্মত ! (অর্থাৎ– কি বিরাট হিম্মত)। তাহাদের অবস্থা টুটা-ফাটা বটে, কিন্তু তাহারা যেন স্থিতিশীলতার পাহাড়। যেন আব্দার ধরিয়া আছে যে, আমরা তো হকের উপর এবং সত্য নবীর অনুসারী, (সুতরাং) বিজয় আমাদেরই। অস্ত্র নাই, পরনে কাপড় নাই; কিন্তু আল্লাহর নিরাপত্তায় যেন বাহাদুর।

কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হইল, এই মোকাবেলা ও পরীক্ষা ছিল বড় ভয়াবহ ও কঠিন। ইহা নিশ্চিত যে, দুনিয়াতে উহার অপর কোন দৃষ্টান্ত ছিল না। তাহাদের দলপতি একটি ঝুপড়ির নীচে জমিনের উপর মথা লুটাইয়া আছেন, তাঁহার চোখে অশ্রুর প্রবাহ এবং মুখে বিজয়ের দোয়া। বার বার তিনি এই শব্দগুলি উচ্চারণ করিতেছেন, ইয়া আল্লাহ! তোমার এই মুষ্টিমেয় এবাদতগুজার বান্দা, আজ যদি তাহাদিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হয়, তবে পৃথিবীতে তোমার নাম লওয়ার মত আর কেহ থাকিবে না।

তিনি খোদায়ী ওয়াদায় সন্তুষ্ট, কিন্তু খোদার অমুখাপেক্ষিতার ভয়ও অন্তরে জমিয়া আছে। এই ময়দানেরই অপর প্রান্তে রক্তপিপাসু

নওজওয়ানদের ভারী লশকর পাহাড়ের মত জমিয়া আছে। চেহারায় আয়েশ ও প্রাচুর্যের চমক, দৃষ্টিতে অহংকার ও তাকাব্বুরীর নেশা। মাথায় শিরস্ত্রাণ এবং অঙ্গে লৌহবর্মের চাকচিক্য দেখিয়া মনে হয় যেন সমুদ্রে ঢেউ খেলিতেছে। নগ্ন হাতিয়ারের চমকে যেন চোখে ধাঁধা লাগিয়া যাইতেছে।

অগ্রভাগে আরবী অশ্বারোহী দল, পিছনে সাতশত উটের উপর দুর্ধর্ষ তীরান্দাজ বাহিনী উপবিষ্ট। চতুর্দিকে অসংখ্য পদাতিক বাহিনী। আবু জাহেল, উৎবা, শায়বা এবং উমাইয়্যা বিন খালফের মত সেনাপতিরা যথাযথ অবস্থানে যুদ্ধ পরিচালনায় লিপ্ত। (কোরাইশ বাহিনীর) একেকজন সরদার গোটা বাহিনীর রসদের যোগান দেওয়া নিজেদের দায়িত্বে গ্রহণ করিয়া লইয়াছিল।

তাহাদের ধারণা ছিল– এই মুষ্টিমেয় নিরস্ত্র ও বিবস্ত্র ফকীরের দলকে চোখের পলকে মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিব এবং নিমেষের মধ্যেই তাহাদের ধড় জমিনের উপর তড়পাইতে থাকিবে। কিন্তু তাহাদের এই খবর ছিল না যে, আল্লাহ পাকের শক্তি এই সকল জড়-প্রদর্শনী হইতে অমুখাপেক্ষী। তাঁহার সাহায্য– অস্ত্র, ঘোড়া এবং উটের তামাশা হইতে সম্পূর্ণ বে-পরওয়া।

অহংকারী বাহিনী হইতে তিন বাহাদুর (উৎবা বিন রবীআহ, শায়বা বিন রবীআহ এবং ওলীদ বিন উৎবা) বাহির হইয়া আসিল এবং (সদর্পে) নর্তন-কুদর্ণ করিতে করিতে চিৎকার করিয়া বলিলঃ আমাদের সঙ্গে মোকাবেলা করিবার মত কে আছ?

ইসলামী লশকর হইতে তিনজন জাঁনবাজ সামনে আগাইয়া আসেন। কিন্তু এই তিন জনই ছিলেন আনসারী। আর প্রতিপক্ষের দর্প এমনই চরমে পৌঁছিয়াছিল যে, এই নেশাগ্রস্ত মুর্তিমান অহংকারীরা নাক সিটকাইয়া বলিয়া উঠিল, 'না'; (আনসারীগণ নহে) আমাদের খান্দানের যুবকরা সামনে আস। এই সকল কৃষকদের সঙ্গে মোকাবেলা করা তো আমাদের জন্য

অপমানজনক। সঙ্গে সঙ্গে হযরত হামজা, হযরত আলী এবং হযরত ওবায়দা ইবনুল হারিছ রাজিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন ক্ষুধার্ত শার্দূলের মত ময়দানে অগ্রসর হইয়া গর্জন করিয়া উঠিলেন।

একপক্ষ চক্‌চকে কোষ হইতে এবং অপর পক্ষ ছেঁড়া নেকড়ার দলা হইতে তলোয়ার বাহির করিয়া পরস্পরকে হত্যা করার জন্য আগাইয়া আসিল। কিন্তু (বাহ্যিক) চাক্‌চিক্যের ধাঁধা হইতে (দর্শকদের) দৃষ্টি মুক্ত হইবামাত্র তাহারা তিনজন কাফেরের ভূপাতিত স্তুপ দেখিতে পাইল। অবশ্য মুসলমানদের মধ্যে হযরত ওবায়দা ইবনুল হারেছ (রাঃ) গুরুতর আহত হইলেন। হযরত আলী (রাঃ) সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে কাঁধে তুলিয়া লইলেন। আর মাহ্‌বুবে রাব্বুল আলামীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনতি বিলম্বে তাহাকে রহমতের কোলে টানিয়া লইলেন। হযরত ওবায়দার মাথা পবিত্র জানুতে রাখিয়া তাহাকে শয়ন করাইয়া দিলেন। আর পবিত্র হাতে তাহার মুখমণ্ডলের ধূলা-বালি পরিষ্কার করিয়া দিতে লাগিলেন। পরম আনুগত্যে জীবন উৎসর্গকারী (হযরত ওবায়দা) এই দৃশ্য দেখিতে পাইয়া মৃত্যুর কথা ভুলিয়া গেলেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কদমে চোখ ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং নিজের সৌভাগ্যের উপর গর্ব করিতে করিতে পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এইবার উভয় পক্ষ তৎপর হইয়া উঠিল এবং ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হইয়া গেল। কিন্তু তলোয়ার উত্তোলন করিবার পর এক বিস্ময়কর অবস্থা সৃষ্টি হইল। নিজের কলিজার টুকরা, নয়নমনি এবং একান্ত আপনজনেরা তলোয়ারের সামনে আসিয়া হাজির হইল। কিন্তু একদিকে যদিও আল্লাহ এবং তাঁহার সত্য দ্বীনের নামের উপর সকল আত্মীয়তার সম্পর্ক নিঃশেষ হইতেছিল,কিন্তু অপর পক্ষে অহংকার-তাকাব্বুর, ব্যক্তিস্বার্থ এবং কুফর ও জুলুমের অন্ধকার, শফকত ও মোহাব্বতের নূরকেও মিটাইয়া দিয়াছিল।

মোটকথা, একটি ভয়াবহ সংঘর্ষের ফলাফল ছিল হক পন্থীদের বিজয়–

যেই বিজয়ের ওয়াদা বহু পূর্বেই করা হইয়াছিল।

প্রশ্ন ঃ আবু জাহেল কিভাবে মৃত্যুবরণ করে?

উত্তর ঃ মোয়াওয়াজ ও মোয়াজ নামে স্বল্পবয়স্ক দুই আনসারী সহোদর ছিল। তাহারা শপথ করিয়াছিল যে, আবু জাহেলকে হত্যা না করিয়া ছাড়িব না। কিন্তু তাহারা আবু জাহেলকে চিনিত না। পরে হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে চিনিতে পারিয়া বাজপাখীর মত ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং এক আঘাতেই তাহাকে ধরাশয়ী করিয়া ফেলিল।[১]

প্রশ্ন ঃ এই যুদ্ধ দ্বারা কি উপকার হইল?

উত্তর ঃ (১) সবচাইতে বড় উপকার হইল- যেই মুষ্টিমেয় মুসলমানদিগকে এই পর্যন্ত হিসাবেই গণনা করা হইত না, এক্ষণে তাহারা একটি পৃথক জাতির অস্তিত্ব লাভ করিল।

(২) গোটা কোরাইশ গোত্রের উপর তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিল।

(৩) আরবরা তাহাদিগকে বিশেষ ইজ্জতের নজরে দেখিতে লাগিল।

টীকা

আবু জাহেলের ছেলে আকরামা (যিনি পরে মুসলমান হইয়াছিলেন) পিছন হইতে তাহাদিগকে ধাওয়া করিল। হযরত মোয়াজের কাঁধে আঘাত করিলে তাহার একটি হাত কর্তিত হইয়া কেবল সামান্য চামড়ায় ঝুলিয়া রহিল। কিন্তু দুর্দান্ত হিম্মতের অধিকারী হযরত মোয়াজ তখনো জেহাদে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু ঝুলন্ত হাতটি যখন জেহাদের দায়িত্ব পালনে সমস্যা সৃষ্টি করিতে লাগিল তখন পায়ের নীচে উহাকে চাপিয়া ধরিয়া সজোরে এক টান দিলেন এবং দেহ হইতে উহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সৈন্যদের ব্যূহে ঢুকিয়া পড়িলেন। অতঃপর বিজয় ও নুসরতের লাগাম ধরিয়া কিছুক্ষণের মধ্যেই পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে গিয়া হাজির হইলেন।

প্রশ্ন ঃ এই যুদ্ধ মুসলমানদের সমস্যা আরো বৃদ্ধি করিল কি?

উত্তর ঃ ইসলামের সমস্যা-বৃদ্ধি ছিল অবশ্যম্ভাবী। কারণ–

(১) এখন কাফেররা মোকাবেলা করার জন্য পূর্বের তুলনায় আরো বেশী প্রস্তুতি গ্রহণ করিল।

(২) সুতরাং মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য মদীনার ইহুদীদের উপর আরো কঠোরভাবে চাপ প্রয়োগ করা হইল।

(৩) আবু সুফিয়ান অঙ্গীকার করিল, মুসলমানদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত মাথা ধৌত করিব না।

(৪) আরবের অপরাপর গোত্রসমূহও এখন সতর্ক হইয়া গেল।

(৫) বিশেষতঃ মদীনার ইহুদীদের হিংসা-বিদ্বেষের কোন অন্ত রহিল না।

(৬) অবশেষে বনু কাইনুক্বা' সম্প্রদায় সঙ্গে সঙ্গেই চুক্তি ভঙ্গ শুরু করিয়া ঐ বৎসরই যুদ্ধের ঘোষণা করিয়া দিল।

প্রশ্ন ঃ বনু কাইনুকা'-এর যুদ্ধের ঘোষণার পর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে উহার মোকাবেলা করিলেন এবং ফলাফল কি দাঁড়াইল?

উত্তর ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের দুর্গ অবরোধ করিলেন। কেননা, তাহারা সংঘর্ষ এড়াইয়া দুর্গে আবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু পরে অবরোধে অতিষ্ঠ হইয়া সিরিয়া ভূখণ্ডে চলিয়া গেল।

প্রশ্ন ঃ এই অবরোধ কবে শুরু হয়, কত দিন স্থায়ী থাকে, এই সময়ে মদীনার গভর্ণর কে ছিলেন এবং পতাকা কার নিকট ছিল?

উত্তর ঃ দ্বিতীয় হিজরীর ১৫ই শাওয়াল রোজ শনিবার হইতে এই অবরোধ শুরু হয়, যাহা ক্রমাগত ১৫ দিন স্থায়ী ছিল। হযরত হামযা (রাঃ) পতাকাবাহী ছিলেন এবং মদীনার গভর্ণর ছিলেন হযরত আবু লুবাবা (রাঃ)।

প্রশ্ন ঃ তাহাদের সংখ্যা কত ছিল এবং তাহারা কি কাজ করিত?

উত্তর ঃ যুদ্ধ করিতে পারে এইরূপ আনুমানিক একশত পুরুষ এবং অবশিষ্টরা ছিল শিশু, বৃদ্ধ ও নারী। তাহাদের পেশা ছিল ব্যবসা ও স্বর্ণকর্ম।

প্রশ্ন ঃ এই বৎসর কয়টি গাযওয়া অনুষ্ঠিত হয় এবং কয়টি সেনাদল পাঠানো হয়?

উত্তর ঃ সর্বমোট পাঁচটি গাযওয়া এবং তিনটি সেনাদল।

দ্বিতীয় হিজরীর বড় বড় ঘটনা

প্রশ্ন ঃ এই বৎসরের অন্যান্য বড় ঘটনা কি?

উত্তর ঃ (১) মুসলমানগণ বাইতুল মোকাদ্দাসের দিকে ফিরিয়া নামাজ আদায় করিত। হিজরতের ১৬ মাস পর দ্বিতীয় হিজরীতে হুকুম হইল যে, এখন হইতে যেন কাবার দিকে রোখ করা হয়।

(২) রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা হযরত রোকাইয়া (রাঃ) ইন্তেকাল করেন– যিনি দীর্ঘ দিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন এবং যার অসুস্থতার কারণে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওসমান (রাঃ)-কে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা হইতে বিরত রাখিয়া বলিয়াছিলেনঃ রুগীর সেবা কর, উহাতেই তুমি জেহাদের ছাওয়াব লাভ করিবে।

সকল নবীদের শ্রেষ্ঠ নবীর পক্ষে ইহা এক আশ্চর্য পরীক্ষা ছিল যে, তিনি যুদ্ধে লিপ্ত আর তাঁহার কন্যা দুনিয়া হইতে বিদায় হইতেছেন। এই মোবারক বিজয়ের সংবাদ এমন সময় মদীনায় পৌঁছায় যখন লোকেরা নবী-কন্যার দাফন শেষে হাত হইতে মাটি ঝাড়িতেছিল।

(৩) রোজা (৪) জাকাত (৫) ছদকায়ে ফিতর (৬) ঈদ ও বকরী ঈদের নামাজের হুকুম (৭) কোরবানী এবং– (৮) হযরত আলীর সঙ্গে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর বিবাহ (এই বৎসরেই অনষ্ঠিত হয়)।

সারাংশ

কোরাইশী কাফেলা যাহা সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল, তাহাদিগকে বাধা দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় হিজরীর ১২ই রমজান রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা হইতে রওনা হন। কিন্তু ঐ কাফেলা ভিন্ন পথ ধরিয়া চলিয়া যায় এবং মক্কার কাফেরদের একটি বড় লশকর মোকাবেলা করার জন্য বদরে আসিয়া উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ই রমজান বদরের প্রসিদ্ধ ঘটনা সংঘটিত হয়। উহাতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ এবং তাহাদের নিকট সর্বমোট দুইটি ঘোড়া, সত্তরটি উট এবং কয়েকটি তলোয়ার ছিল। একেকটি উটের উপর কয়েকজন আরোহণ করিয়াছিল।

অপর পক্ষে ছিল প্রায় এক হাজার নওজওয়ান এবং তাহারা যাবতীয় সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত ছিল। আল্লাহ পাক এই ক্ষেত্রে মুসলমানদিগকে বিরাট সাফল্য দান করেন। কোরাইশদের সেই সকল প্রসিদ্ধ সরদার যাহারা হিজরতের সময় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার পরামর্শ দিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এগার জন নিহত হয়। নিহতদের মধ্যে আবু জাহেলও ছিল, তাহাদের মোট সংখ্যা ছিল চৌদ্দজন। এতদ্ব্যতীত উনষাট জন নিহত হয় এবং অপর সত্তর জন বন্দী হয়। মুসলিম পক্ষে মোট চৌদ্দ জন শাহাদাত বরণ করে। যেই সত্তর জনকে বন্দী করা হয় তাহাদের নিকট হইতে ফিদ্‌য়া (মুক্তিপণ) লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ফিদ্‌য়ার পরিমাণ ছিল চার হাজার দেরহাম এবং বিত্তবানদের জন্য আরো কিছুটা বেশী ধার্য করা হয়। আর যাহাদের নিকট কিছুই ছিল না তাহাদের ফিদ্‌য়া এই ধার্য করা হয় যে, তাহারা দশ দশজন মুসলিম শিশুকে লেখা পড়া শিখাইয়া দিবে।

শব্দার্থ ঃ

(মূল উর্দূ কিতাবের পাঠকদের জন্য)

کچل ڈالنا – পিষ্ট করা, পিষিয়া ফেলা, মিশাইয়া দেওয়া, নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া, মারাত্মকভাবে প্রহার করা। غرور – অহংকার, অভিমান, সন্দেহ। تقويت – শক্ত, মজবুত, শক্ত করা, সান্ত্বনা। پڑاؤ ڈالنا – অবস্থান লওয়া, পড়িয়া থাকা, থাকিয়া যাওয়া, নড়িবার ইচ্ছা না করা, শিবির স্থাপন করা। آمادگی – প্রস্তুতি, সন্তুষ্টি, আসক্তি, উৎসাহ। عمده – ভাল, সুন্দর, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, প্রকৃষ্ট, বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, ভদ্র, বিত্তবান, সম্মানিত, নির্বাচিত, পছন্দকৃত, প্রশংসিত, খাটি, প্রথম শ্রেণীর, সুস্বাদু, মূল্যবান, নেক। کیچڑ – কাদা, ময়লাযুক্ত মাটি, পানি মিশ্রিত মাটি, নরম মাটিবিশেষ। زره – লৌহবর্ম, যুদ্ধের পোশাক, লৌহ নির্মিত পোশাক যাহা সৈনিকরা যুদ্ধের সময় ব্যবহার করে। خود – শিরস্ত্রাণ, লৌহ নির্মিত টুপি যাহা যুদ্ধের সময় ব্যবহার করা হয়। مساوات – সাম্য। طے – সিদ্ধান্ত, মীমাংসা, ফায়সালা, নিস্পত্তি, জড়ানো, দূরত্ব অতিক্রম করা, শেষ অবস্থায় যাওয়া, শেষ করা, ছোট করা, সংক্ষিপ্ত করা। رواداری– সহিষ্ণুতা, উদারতা, কোন বিষয়কে ছাড় দিয়া বৈধ করা। احسان – অনুগ্রহ, উপকার, সদয় আচরণ, অবদান, ভাল ব্যবহার, কৃতজ্ঞতা। اهميت – গুরুত্ব, প্রয়োজন। مجرم – দোষী, অপরাধী, গোনাহগার, পাপী, দুর্বৃত্ত। تماشا، تماشه – তামাশা, দর্শনীয় খেলা, আমোদ প্রমোদ, দৃশ্য, কৌতুক, আনন্দ, ক্রীড়া, মানুষের ভীড়, হাঙ্গামা, বিবাদ, ঠাট্টা, বিদ্রূপ, বিস্ময়কর কথা, মেলা। غمخوار – সহানুভূতিশীল ব্যক্তি। كمك – সাহায্য, সহযোগিতা, যুদ্ধের সময় সাহায্যের জন্য প্রেরীত সৈন্য বাহিনী। استقلال – ধৈর্য, স্থিথিশীলতা, মজবুতী। خونخوار – রক্তপিপাসু, হিংস্র, জালেম, জল্লাদ। آن کی آن میں মুহূর্তের মধ্যে, চোখের পলকে, স্বল্প সময়ের মধ্যে। توهين – লজ্জা, অপমান, মানহানী, অপবাদ, কুৎসা, অবজ্ঞা। گهمسان – যুদ্ধ, ভিষণ যুদ্ধ, প্রচণ্ড যুদ্ধ, গুরুতর যুদ্ধ, খুন,

হত্যা। بهرحال – সর্বাবস্থায়, সকল অবস্থায়, মোটকথা, যাহাই হউক। دهاك – প্রভাবশালী, প্রভাব, জাঁকজমক, খ্যাতি, ভয়, শান-শওকত, মর্যাদা। كينه – হিংসা, ঈর্ষা, দ্বেষ, ঘৃণা, শত্রুতা, কপটতা।

তৃতীয় হিজরী

গাতফান এবং ওহোদ যুদ্ধ ইত্যাদি

প্রশ্ন ঃ তৃতীয় হিজরীর বড় ও প্রসিদ্ধ যুদ্ধসমূহ কোন্‌গুলি?

উত্তর ঃ গাতফান এবং ওহোদ যুদ্ধ।

প্রশ্ন ঃ গাতফানের যুদ্ধ কোন আক্রমণের জবাব ছিল, না রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে আক্রমণ ছিল?

উত্তর ঃ এই যুদ্ধ ছিল আক্রমণের জবাব।

প্রশ্ন ঃ কে আক্রমণ করিয়াছিল?

উত্তর ঃ দু'ছুর আক্রমণ করিয়াছিল?

প্রশ্ন ঃ দু'ছুর কে ছিল এবং গাতফান কাহাকে বলা হয়?

উত্তর ঃ দু'ছুর হইল এক ব্যক্তির নাম। তাহার পিতার নাম ছিল হারেছ। সে কবীলায়ে বনী মোহারেবের অধিবাসী ছিল। আর গাতফান একটি কবীলা বা গোত্রের নাম।

প্রশ্ন ঃ এই হামলা কোথায় এবং কি কারণে হয় এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার জবাবে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং উহার ফলাফল কি দাঁড়ায়?

উত্তর ঃ এই হামলার কারণও কাফেরদের ঐ একই উদ্দেশ্য ছিল যে, ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতিসাধন, এমনকি তাহাদিগকে নাস্তা-নাবুদ করিয়া দেওয়া। বদরে (মুসলমানদের) বিজয়ের কারণে তাহাদের এই

ইচ্ছাকে আরো শক্তিশালী ও স্বক্রিয় করিয়া দিয়াছিল। সুতরাং দু'ছুর এক বিরাট বাহিনী লইয়া মদীনার দিকে রওনা হইল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের ক্ষতিসাধন করা। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা জানিতে পারিয়া মোকাবেলার উদ্দেশ্যে মদীনার বাহিরে তাশরীফ লইয়া আসিলেন। কিন্তু দু'ছুর এবং তাহার সঙ্গীগণ ভয় পাইয়া পাহাড়ে গিয়া পলায়ন করিল এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চিন্তে ময়দান হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

প্রশ্ন ঃ এই হামলা কবে হয় এবং দু'ছুরের সৈন্যসংখ্যা কত ছিল?

উত্তর ঃ তৃতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এই হামলা হয়। দু'ছুরের সঙ্গে ৪৫০ জন মানুষ ছিল।

প্রশ্ন ঃ এইসকল লোক কোন্ গোত্রের ছিল?

উত্তর ঃ বনু ছা'লাবা এবং বনু মোহারেব গোত্রের।

প্রশ্ন ঃ দু'ছুর কুফরী হালাতে প্রত্যাবর্তন করে, না মুসলমান হইয়া?

উত্তর ঃ মুসলমান হইয়া।

প্রশ্ন ঃ সে কিভাবে মুসলমান হয়?

উত্তর ঃ এই ছফরে হঠাৎ কিছুটা বৃষ্টিপাত হইয়া ছিল। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ময়দান হইতে ফিরিয়া আসিয়া (গায়ের ভিজা) কাপড় খুলিয়া শুকাইবার উদ্দেশ্যে একটি বৃক্ষে নাড়িয়া দেন। অতঃপর শাহে দো আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্রাম করার উদ্দেশ্যে বৃক্ষের ছায়ায় মাটির উপর শয়ন করেন। লশকরের লোকেরা কিছুটা দূরে অবস্থান করিতেছিল।

এদিকে দু'ছর পাহাড়ের উপর হইতে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একা দেখিতে পাইয়া ইহাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শিয়রে আসিয়া তলোয়ার উত্তোলন করিয়া বলিল– বল,

তোমাকে কে রক্ষা করিবে? (আল্লাহর নবী শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন) "আমার আল্লাহ"। ইহা ছিল ঐ সত্য নবীর জবাব যিনি নিজের আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ভরসা রাখিতেন। কিন্তু ইহা অজ্ঞাত যে, ঐ সাধারণ কয়েকটি কথার মধ্যে এমন কি প্রভাব ছিল যে, (উহা শুনিবামাত্র) দু'ছুর কাঁপিয়া উঠিল। তাহার হাত হইতে তলোয়ার পড়িয়া গেল এবং সে একেবারেই হতভম্ব হইয়া গেল।

এইবার রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই তলোয়ারটি উঠাইয়া বলিলেন, বল, তোমাকে কে রক্ষা করিবে? দু'ছুর ছিল একেবারেই নিরুত্তর। কারণ তাহার ভরসা ছিল দৃশ্যমান শক্তির উপর, সে আল্লাহকে চিনিত না। আর এই মুহূর্তে সে কুফরীর অসহায়ত্ব অনুভব করিতেছিল। তাহার নিকট "কেহই নহে" ব্যতীত অপর কোন জবাবই ছিল না। তাহার অসহায় অবস্থার উপর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের করুণা হইল এবং তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু এই সততা ও সত্য ভরসা তাহার উপর এমন ক্রিয়া করিল যে, অতঃপর কেবল সে নিজেই মুসলমান হইল না, বরং নিজের কওমের জন্য সে একজন শক্তিশালী দ্বীন প্রচারক হইয়া গেল।

ইহাই ছিল সেই সম্মানিত নবীর চরিত্র যিনি উন্নত চরিত্রকে পূর্ণতা দান করার জন্য আগমন করিয়াছিলেন।

সারাংশ

তৃতীয় হিজরীতে দু'ছুর বনু মোহারেব এবং বনু ছা'লাবা গোত্রের ৪৫০ জন মানুষ লইয়া মদীনার উপর চড়াও হয়। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সঙ্গে মোকাবেলার উদ্দেশ্যে মদীনার বাহিরে তাশরীফ লইয়া আসিলে তাহারা পাহাড়ে পালাইয়া যায় এবং তিনি সাফল্যের সহিত প্রত্যাবর্তন করেন। দু'ছুরের উপর পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের উন্নত চরিত্রের এমন প্রভাব পড়িল যে, উহার ফলে সে মুসলমান হইয়া ইসলামের তাবলীগ শুরু করিয়া দিল।

ওহোদ যুদ্ধ

প্রশ্ন ঃ ওহোদ কাহাকে বলা হয় এবং এই যুদ্ধকে "ওহোদ যুদ্ধ" বলা হয় কেন?

উত্তর ঃ "ওহোদ" মদীনার নিকটে এক পাহাড়ের নাম। সেখানে হযরত হারুন (আঃ)-এর কবরও অবস্থিত। আলোচিত যুদ্ধটি যেহেতু ওহোদের নিকটেই অনুষ্ঠিত হয়, এই কারণেই উহাকে ওহোদ যুদ্ধ বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ এই যুদ্ধ কবে এবং কাহাদের সঙ্গে সংঘটিত হয়।

উত্তর ঃ হিজরী তৃতীয় সনের শাওয়াল মাসের ৭ তারিখে, মক্কার কাফেরদের সঙ্গে।

প্রশ্ন ঃ এই যুদ্ধের কারণ কি ছিল?

উত্তর ঃ বদর যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করা। কাফেররা তখন হইতেই উহার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিল।

প্রশ্ন ঃ এই যুদ্ধে মুসলমান এবং কাফেরদের সংখ্যা কত ছিল?

উত্তর ঃ সাতশত মুসলমান এবং তিন হাজার কাফের।

প্রশ্ন ঃ উহাতে কি মোনাফেকরাও শরীক ছিল?

উত্তর ঃ শুরুতে তিনশত মোনাফেক মুসলমানদের সঙ্গে যাত্রা করিয়াছিল। ফলে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা হইয়াছিল এক হাজার। কিন্তু পরে তাহাদের সরদার আব্দুল্লাহ বিন উবাই মুসলমানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পথিমধ্য হইতে সকলকে ফিরাইয়া লইয়া আসে।

প্রশ্ন ঃ মুসলমান ও কাফেরদের সমরোপকরণের বিবরণ দাও।

উত্তর ঃ কাফেরদের নিকট সাতশত লৌহবর্ম, দুইশত ঘোড়া এবং তিন

হাজার উট ছিল। আর সঙ্গে করিয়া চৌদ্দজন মহিলা আনা হইয়াছিল, তাহারা (যোদ্ধাদের) উৎসাহ ও লজ্জা দিয়া দিয়া প্রতিশোধ গ্রহণের অগ্নি উত্তেজিত করিতেছিল। পক্ষান্তরে মুসলমানদের নিকট ছিল মাত্র পঞ্চাশটি ঘোড়া।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী বাহিনীর পতাকা কার হাতে ছিল?

উত্তর ঃ হযরত মুস্‌আব বিন ওমায়েরের নিকট।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী লশকরের প্রধান তো ছিলেন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কিন্তু কাফেরদের লশকরপ্রধান কে ছিল?

উত্তর ঃ আবু ছুফিয়ান।

প্রশ্ন ঃ মদীনার খলীফা কে নিযুক্ত হয়?

উত্তর ঃ হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ)।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের এই হামলার সংবাদ কিভাবে প্রাপ্ত হন?

উত্তর ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) যিনি মুসলমান হইয়াছিলেন কিন্তু তখনো মক্কাতেই অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি বিস্তারিত অবস্থা লিখিয়া রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। এই সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি (ঘটনা) অনুসন্ধানের জন্য দুই ব্যক্তিকে রওনা করাইয়া দিলেন। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, কাফেরদের লশকর মদীনার উপকণ্ঠে "আইনাইন" নামক স্থানে আসিয়া অবস্থান লইয়াছে।

প্রশ্ন ঃ এই যুদ্ধের বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ যেহেতু শহরের উপর আক্রমণের আশংকা ছিল, সুতরাং সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নগরীর চতুর্দিকে পাহারা বসাইয়া দেওয়া হইল। পরে সকাল বেলা ছাহাবাদের সঙ্গে পরামর্শ করা হইল যে, মদীনায় থাকিয়া

মোকাবেলা করা (সঙ্গত) হইবে, না বাহিরে আসিয়া। (পরামর্শক্রমে) সিদ্ধান হইল যে, মোকাবেলার জন্য বাহিরে আসা হউক। সেমতে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতশত মুসলমাননের জামায়াত সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন এবং সংঘর্ষস্থলে পৌছাইবার পর উভয় দিক হইতেই সৈন্যদের ব্যুহ রচনা করা হইল।

ওহোদ পাহাড়টি যেহেতু ইসলামী বাহিনীর পিছনে ছিল এবং সেই দিক হইতে হামলার আশংকা ছিল। এই কারণেই রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পঞ্চাশ জন ব্যক্তিকে সেখানে দাঁড় করাইয়া বলিয়া দিলেনঃ মুসলমানদের বিজয় হউক কিংবা পরাজয়, কিন্তু তোমরা তোমাদের অবস্থান ত্যাগ করিবে না। হযরত আব্দুল্লাহ বিন জোবায়েরকে তাহাদের দলনেতা নির্ধারণ করিয়া দিলেন। পরে যুদ্ধ শুরু হইল এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ভয়াবহ যুদ্ধ স্থায়ী হইল। যখন (কাফের) সৈন্যরা কিছুটা পিছু হটিল তখন মুসলমানদের পাল্লা ছিল ভারী এবং তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। এই সময় মুসলমানগণ অগ্রসর হইয়া গনীমতের মাল জড়ো করিতে শুরু করিল।

পাহাড়ের (উপরে অবস্থিত) দলটিও এই দৃশ্য দেখিয়া (গনীমতের মাল সংগ্রহে) ঝাপাইয়া পড়িল। তাহাদের দলনেতা তাহাদিগকে অনেক বারণ করিলেন এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাকীদ স্মরণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহারা জবাব দিল যে, বিজয় হইয়া গিয়োছে, এখন আর ভয় কি? কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন জোবায়ের এবং তাহার কয়েকজন সঙ্গী যথারীতি সেই পাহাড়েই রহিয়া গেলেন।

খালেদ বিন ওলীদ কোরাইশদের বড় সিপাহ্সালার ছিলেন, (যিনি তখনো মুসলমান হন নাই)। এই সুযোগকে তিনি গনীমত মনে করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি বাহিনী লইয়া পাহাড়ে পৌছিয়া গেলেন। হযরত জোবায়ের এবং তাহার অবশিষ্ট সঙ্গীগণ দুরন্ত সাহসিকতায় যুদ্ধ করিয়া শেষ

পর্যন্ত শাহাদাত বরণ করিলেন (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)।

এইবার খালেদ বিন ওলীদ নিজের বাহিনী লইয়া পিছনের দিক হইতে মুসলমানদের উপর ঝাপাইয়া পড়িলেন। সম্মুখ দিক হইতে যেই সকল কাফের পালাইতেছিল, এক্ষণে তাহারাও থামিয়া গেল। উহার ফল এই হইল যে, মুসলমানগণ মধ্যখানে আসিয়া গেল এবং দুই দিক হইতে এমন সাঁড়াশি আক্রমণ হইল যে, তাহারা পরস্পরকে চিনিতে পারিল না; মুসলমানদের হাতেই মুসলমানগণ শহীদ হইতে লাগিলেন এবং ইসলামী ফৌজের পতাকাবাহী হযরত মুসআব বিন ওমায়ের (রাঃ)ও শাহাদাত বরণ করিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ) যুদ্ধের পতাকা সামলাইয়া লইলেন।

একটি ভয়াবহ দৃশ্য

এমন একটি সংবাদ প্রচার হইয়া গেল যে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদাত বরণ করিয়াছেন (উহা যেন দুশমনদেরই ভাগ্যে ঘটে)। এই সংবাদে ইসলামী সেনাদের মধ্যে হতাশা ছড়াইয়া পড়ে। বড় বড় বাহাদুরগণ তাহাদের হাতিয়ার ফেলিয়া দিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের এই ধারণা হইল যে, প্রিয় নেতার পরে আমাদের জীবনের কোন মূল্য নাই। এই ধারণা যেন একটি বিদ্যুতের চমক ছিল, যাহা প্রাণ-উৎসর্গীদের প্রাণ নিবেদন করিতে অস্থির করিয়া তুলিল।

সর্বপ্রথম হযরত আনাস বিন নজর (রাঃ)-এর মধ্যে এই ধারণা পয়দা হয় এবং তিনি তৎপর হইয়া ওঠেন। ঐ যুদ্ধের ময়দানেই তিনি বেহেশ্তের বাগানের খোশবু পাইয়াছিলেন। অতঃপর এমনভাবে মাতোয়ারা হইয়া গেলেন যে, তীর-তলোয়ার ও বল্লমের প্রায় নব্বইটি আঘাতের পর শাহাদাতের অন্তহীন জীবন লাভ করিলেন।

অনুরূপভাবে আরো অনেকেই মাতোয়ারা হইয়া উঠিলেন এবং তলোয়ার উত্তোলন করিয়া ক্ষুধার্ত শার্দূলের মত শত্রুদের উপর ঝাপাইয়া পড়িলেন। এক পর্যায়ে হযরত কাআব বিন মালেক (রাঃ)-এর অনুসন্ধানী দৃষ্টি সেই উদ্দিষ্ট কেবলার দৃশ্য অবলোকনে ভাগ্যবান হইল, যাহার দীদার ও দর্শন ছিল আজ (সেই দিন) সকল মুসলমানের অন্তিম বাসনা। আবেগ-বাসনার কম্পিত হৃদয় আর সংবরণ করিতে পারিল না। মনের অনিচ্ছাতেই (তাহার কণ্ঠে) ধ্বনিত হইলঃ মুসলমানগণ! ধন্য হও; তোমাদের গর্দানের (জীবনের) মালিক, মাথার মুকুট এবং আত্মার মনিব (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিরাপদে আছেন।

এই মোবারক ঘোষণা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মৃত-প্রায় মুসলমানদের আত্মাসমূহ হৃদপিণ্ডে লাফাইয়া উঠিল। নব জীবনের উত্তাল তরঙ্গ সকল হতাশার পরিসমাপ্তি করিয়া দিল। স্খলিত পা আবার জমিয়া গেল এবং নিবেদিত প্রাণ ছাহাবীগণ তাহাদের নেতার দিকে ছুটিয়া গেলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এই সংবাদটি কাফেরদের আক্রমণের গতিও সকল দিক হইতে গুটাইয়া এদিকে ধাবিত করিল।

অতঃপর ঐ পবিত্র জাতের উপর সকল দিক হইতে আক্রমণ হইতে লাগিল। আক্রমণের ব্যূহ রচনা করিয়া বৃষ্টির মত তীর বর্ষণ হইতেছিল। এই সময় উভয় জাহানের সরদার ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় অনুরাগীদের মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ঘোষণা করিলেনঃ আমার জন্য প্রাণ দিতে কে প্রস্তুত আছ? সঙ্গে সঙ্গে এক-দুইটি নহে; পাঁচ পাঁচটি বক্ষ সামনে আগাইয়া ঢাল স্বরূপ তাঁহার কদমে লুটাইয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে হযরত জিয়াদ বিন ছাকানের পবিত্র নাম অধিক প্রসিদ্ধ।

দান্দান মোবারকের শাহাদাত

এই গোলযোগের এক পর্যায়ে কোরাইশদের প্রসিদ্ধ বীর আব্দুল্লাহ বিন

কুমাইয়া লক্ষ্য স্থির করিয়া রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়া তলোয়ার দ্বারা নূরাণী চেহারাতে আঘাত করিল। ফলে শিরস্ত্রাণের দুইটি কড়া পবিত্র চেহারায় ঢুকিয়া একটি দান্দান শহীদ হইল। আহত সূর্য (নুরানী চেহারা) হইতে শিরস্ত্রাণের কড়া বাহির করার জন্য হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ) তাঁহাকে কসম দিয়া বলিলেন, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে এই খেদমতটুকু করার সুযোগ দান করা হউক।

লোহার কড়া এমন শক্তভাবে প্রবেশ করিয়াছিল যে, খালি হাতে উহা বাহির করা মুশকিল হইয়া পড়িল। পরে তিনি দাঁত দ্বারা কামড় দিয়া একটি কড়া বাহির করিলেন। উহাতে আবু ওবায়দারও একটি দাঁত পড়িয়া গেল। দ্বিতীয় কড়াটি বাহির করার জন্য হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাঃ) আগাইয়া আসিলেন। কিন্তু সত্যের জন্য নিবেদিতপ্রাণ আবু ওবায়দা দাঁত শহীদ হওয়ার আগ্রহে এখনো তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। এইবারও তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে কসম দিয়া বাধা দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় কড়াটিও দাঁত দ্বারা কামড় দিয়া সজোরে টান দিলেন। এইবারও কড়া বাহির হইয়া আসিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার আরেকটি দাঁতও উৎসর্গ হইয়া গেল।

হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)-এর দুইটি দাঁত শেষ হইয়া গেল বটে, কিন্তু যেই আশেক ও নিবেদিতপ্রাণ শাহাদাতের আকাংখায় মাতোয়ারা ছিল (নিছক) দাঁতের জন্য তাহার কি আক্ষেপ হইবে? তিনি তো ইহাতেই নিমগ্ন যে, তাঁহার যদি একটি দাঁত শহীদ হইল, তবে নিবেদিতপ্রাণ, জান নেছারের দুইটি দাঁত যেন কোরবান করা হয়। ইহাই হইল সত্যিকারের মোহাব্বত এবং ইহারই নাম এশ্‌কে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

হযরত আবু ছাইদ খোদরী (রাঃ)-এর পিতা হযরত মালেক বিন সিনানের দৃষ্টি পড়িল রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চেহারার

রক্তের ধারার উপর– যাহা ফিনকি দিয়া বাহির হইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঠোট লাগাইয়া উহা চুষিতে লাগিলেন। ঠোট লাগাইলেই কি আর রক্ত বন্ধ হয়? কিন্তু একজন নিবেদিত প্রাণের অন্তরের আবেগের অবস্থা এইরূপই হইয়া থাকে।

রহমতে আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ দয়া

ছাহাবায়ে কেরামগণের আত্মনিবেদন ছিল দেখিবার মত। জানবাজ আশেকান স্বীয় মাহবুবে আক্বা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল। হযরত জিয়াদ বিন ছাকান এবং তাহার সঙ্গীদের কোরবানীর আলোচনা ইতিপূর্বেই করা হইয়াছে। হযরত আবু দুজানাও একান্ত আশেক ছিলেন। তিনি ঝুকিয়া পড়িয়া পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঢাল বনিয়া গিয়াছিলেন। হযরত তালহা (রাঃ) নিজের এক পার্শ্ব তীর ও তলোয়ারের দিকে করিয়া দিয়াছিলেন। একটি বাহু কাটিয়া পড়িয়া গেল এবং দেহের প্রায় সত্তরটি স্থান জখম হইল, কিন্তু আল্লাহর এই শের কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। আক্বায়ে দো জাহাঁ মাহবুবে রাব্বুল আলামীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সবই দেখিতেছিলেন; স্বয়ং তাঁহার নিজেরও জখমের কষ্ট হইতেছিল, কিন্তু নিজের কষ্টের তুলনায় অধিক মর্ম বেদনা ছিল প্রাণ-উৎসর্গী সঙ্গীদের শাহাদাত এবং আঘাতে ঘায়েল হওয়ার কারণে। তিনি তাহাদের ফিকির করিতেছিলেন। নিশ্চয়ই ইহা এমন এক সময় ছিল, যখন তিনি ঐ দুরাচার বেআদব ও জালেমদের জন্য বদদোয়া করিতে পারিতেন– যাহাদের আক্রমণ তখনো অব্যাহত ছিল। ঈর্ষা ও শত্রুতার অগ্নি ছিল তখনো উত্তেজিত, প্রবল উত্তেজনায় তখনো যাহারা ইসলামের পতাকা এবং দেহায়েতের এই বাতিকে অপমানিত ও চিরতরে নির্বাপিত করিয়া দিতে চাহিতেছিল।

কিন্তু দেখ! মোহাম্মদ ছিলেন আল্লাহর রাসূল। তিনি শুধু নবীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন রহমতের নবী– অসীম দয়ালু, তিনি ছিলেন রাহমাতুল লিল আলামীন। দুনিয়ার জন্য 'রহমত' বানাইয়া তাঁহাকে প্রেরণ করা হয়। ঐ সময়ও তাঁহার সামনে এই (চিন্তাই) ছিল যে, ইহারা নাদান– কিছুই জানে না, মুর্খ– কিছুই বুঝে না, নিজেদের বোকামীর কারণেই এইরূপ আচরণ করিতেছে। একজন স্নেহপরায়ণ সহিষ্ণু পিতা আপন সন্তানদের বেআদবীর কারণে কখনো বদদোয়া করেন না। তাহার সদয় অন্তর এই মনে করিয়া পাশ কাটাইয়া যায় যে, এই যুবকরা কিছুই জানে না এবং কথা বুঝে না। বদদোয়ার পরিবর্তে তাহারা এই দোয়া করেন যে, আয় আল্লাহ! তাহাদিগকে সমঝ দান কর।

সৃষ্টির সেরা রাহমাতুল লিল আলামীনের করুণা ও স্নেহ ছিল মাতাপিতার তুলনায় অনেক বেশী। তিনি বদদোয়া করিবেন কি, তিনি তো দোয়া করিতেছিলেন এবং শুধু দোয়াই নহে, বরং স্বীয় পরওয়ারদিগারের নিকট সুপারিশ করিতেছিলেন যে, আয় আল্লাহ! তাহারা কিছুই জানে না, তাহাদের বেআদবী ক্ষমা করিয়া দাও–

اللهم اغفر لقومى فانهم لا يعلمون

আয় আল্লাহ! আমার কওমকে ক্ষমা করিয়া দাও, তাহারা জানে না।

সাথীদের অনেকে শহীদ হইয়াছে, আহতদের অনেকে ছট্‌ফট করিতেছে, স্বয়ং নিজের দেহ মোবারক আঘাতে জর্জরিত, নুরানী চেহারা হইতে রক্তের প্রবাহ ঝরিতেছে, কিন্তু তাঁহার একমাত্র চিন্তা– জাতির ভবিষ্যৎ। তিনি আক্ষেপের সহিত বলিতেছেনঃ "ঐ জাতির কি পরিণতি হইবে, যাহারা নিজেদের নবীর সহিত এমন বেআদবী করে"।

সেইসঙ্গে তিনি এই বিষয়েও সতর্কতা অবলম্বন করিতেছেন, যেন দেহ মোবারক হইতে রক্তের কোন ফোটা জমিনের উপর পতিত না হয়।

অন্যথায় আল্লাহর গজব উত্তেজিত হইয়া উঠিবে। কারণ নিয়ম হইল, কোন নবীর রক্তের ফোটা যদি জমিনের উপর পতিত হয়, তবে আল্লাহর গজব উত্তেজিত হইয়া ওঠে।

প্রশ্ন ঃ কাফেরদের বাহিনী হইতে সর্বপ্রথম কে হামলা করে?

উত্তর ঃ আবু আমের ফাসেক[১]। তাহার নাম ছিল আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন ছাইফী।

প্রশ্ন ঃ এই গাযওয়ায় কি কারণে পরাজয় হয়?

উত্তর ঃ পারস্পরিক মতবিরোধ এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম মান্য না করার কারণে– যাহা ইতিপূর্বে জানা হইয়াছে।

টীকা

১। আবু আমের মূলতঃ মদীনার অধিবাসী ছিল এবং ইসলামপূর্ব যুগে আউস গোত্রের সরদার ছিল। মদীনাতে যখন ইসলামের চর্চা শুরু হয় এবং লোকেরা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরাগী হইতে আরম্ভ করে তখন সে ঈর্ষার বশবর্তী হইয়া প্রকাশ্যে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে শত্রুতা শুরু করিল। অবশেষে মদীনা ত্যাগ করিয়া সে কোরাইশদের সঙ্গে গিয়া মিলিত হয়। সে তাহাদিগকে সর্বদা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে শত্রুতা এবং মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উৎসাহ দিতে লাগিল।

যুদ্ধের সময় কোরাইশদিগকে সে নিশ্চয়তা দিয়া বলিয়াছিল, আমার কওম যখন আমাকে দেখিতে পাইবে তখন তাহারা মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইবে। কিন্তু যুদ্ধের সময় সে তাহার কওমকে আহবান করিয়া উহার বিপরীত অবস্থা দেখিতে পাইল। এই সময় সে মন্তব্য করিলঃ আমার পরে আমার কওম বিগড়াইয়া গিয়াছে। অতঃপর সে ভয়ানকভাবে মোকাবেলা করিল। তাহাকে আবু আমের রাহেব (সাধু) বলা হইত। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে আবু আমের 'ফাসেক' বলিলেন।

প্রশ্ন ঃ ইহা দ্বারা কি শিক্ষা পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ যদি সুস্পষ্ট ভুল ও শরীয়তের খেলাফ না হয় তবে সরদার ও সেনাপতির হুকুম মান্য করা আবশ্যক।

প্রশ্ন ঃ এই যুদ্ধে কতজন মুসলমান শহীদ হয় এবং কয়জন কাফের নিহত হয়?

উত্তর ঃ সত্তর জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন এবং বাইশ বা তেইশজন কাফের নিহত হয়।

প্রশ্ন ঃ এই বৎসর আর কয়টি যুদ্ধ হয়। গাযওয়া কয়টি এবং সারিয়া কয়টি?

উত্তর ঃ গাযওয়ায়ে 'হামরাউল আসাদ" নামে অপর একটি গাযওয়া এবং দুইটি সারিয়া অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন ঃ এই বৎসরের অপরাপর বড় ঘটনা কি?

উত্তর ঃ (১) উম্মুল মোমেনীন হযরত হাফসা ও জয়নবের সঙ্গে বিবাহ (২) মদ হারাম (ঘোষণা) করা হয় (৩) নবী-গৃহের আলো, হযরত আলীর কলিজার টুকরা, হযরত ফাতেমার নয়নমনি সাইয়্যেদানা হযরত হাছান রাজিয়াল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ঃ এই বিবাহ কোন্ কোন্ মাসে অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর ঃ হযরত হাফসা (রাঃ)-এর সঙ্গে শাবান মাসে এবং হযরত জয়নব (রাঃ)-এর সঙ্গে রমজান মাসে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

সারাংশ

তৃতীয় হিজরীর ৭ই শাওয়াল রোজ সোমবার ওহোদ পাহাড়ের নিকট প্রসিদ্ধ (ঐতিহাসিক) ওহোদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উহাতে মক্কার তিন হাজার কাফেরের (বিশাল) বাহিনী গাযওয়ায়ে বদরের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে

মদীনার উপর আক্রমণ করিয়াছিল। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক এই সংবাদ পাইলেন, তখন আল্লাহর নামে সাতশত মুসলমানসহ মোকাবেলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। শুরুতে মোনাফেক আব্দুল্লাহ বিন উবাইও তিনশত সৈন্য লইয়া মুসলমানদের সঙ্গে যাত্রা করিয়াছিল। কিন্তু পরে সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া রাস্তা হইতেই ফেরত চলিয়া আসে।

মুসলমানগণ ছিলেন নিঃসম্বল এবং কাফেরদের নিকট সাতশত লৌহবর্ম, দুইশত ঘোড়া, তিন হাজার উট ছিল। আর জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া উত্তেজনা বৃদ্ধির জন্য সঙ্গে চৌদ্দ জন মহিলা আনা হইয়াছিল।

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পঞ্চাশ জনের একটি দলকে ইসলামী ফৌজের পিছনের দিকে ওহোদ পাহাড়ের উপর নিযুক্ত করিয়া দিলেন, যেন ঐ দিক হইতে কোন আক্রমণ হইতে না পারে। প্রাথমিক অবস্থায় মুসলমানদের বিজয় সূচিত হয় এবং গনীমতের মালও সংগ্রহ করিতে শুরু করে। কিন্তু পরে তাহাদের পরাজয় হয়। এমনকি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহত হন এবং তাঁহার দান্দান মোবারকও শহীদ হয়।

আব্দুল্লাহ বিন কুমাইয়া সুযোগ পাইয়া রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর তলোয়ার দ্বারা আঘাত করিল। ফলে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুরানী চেহারায় শিরস্ত্রাণের দুইটি কড়া ঢুকিয়া পড়ে– যাহা আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ নিজের দাঁত দ্বারা (কামড় দিয়া) বাহির করেন, কিন্তু উহাতে তাহার দুইটি দাঁতও পড়িয়া যায়। কাফেররা তীর বর্ষণ করিতেছিল, যাহা ছাহাবায়ে কেরাম নিজেদের উপর লইতেছিলেন।

হযরত আবু দুজানা নিজের কোমর হামলার দিকে করিয়া দিয়াছিলেন, নিজের বাহু দ্বারা তীর ও তলোয়ারের হামলা ঠেকাইতেছিলেন হযরত

তালহা (রাঃ)। ফলে তাহার বাহুটি অচল হইয়া যায় এবং দেহের সত্তরটি স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হন। এই সবকিছুই হইতেছিল, কিন্তু রহমতে আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবানে তখনো এই দোয়াই ছিল– আয় আল্লাহ! আমার কওমকে ক্ষমা করিয়া দাও। তাহারা আমাকে চিনিতে পারে নাই।

পিছনে নিয়োজিত দলটির ভুলই ছিল এই পরাজয়ের মূল কারণ। তাহারা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুমের তাৎপর্য ভুল বুঝিয়াছিল এবং তাড়াহুড়া করিয়াছিল।

শব্দার্থ ঃ

(মূল উর্দূ কিতাবের পাঠকদের জন্য)

مطمئن – শান্ত, নিরাপদ, নিশ্চিন্ত, সন্তুষ্ট। سرهانه – মাথা রাখিবার জায়গা, বালিশ, শিয়র। تاثير – ফলাফল, নিশান, ছাপ, প্রভাব, কার্যকারিতা, আছর, আমল, গুণ, বৈশিষ্ট্য। غدارى – বিশ্বাস ঘাতকতা, রাজদ্রোহীতা, অকৃতজ্ঞতা, শত্রুতা। بے جگری – বীরত্ব, বাহাদুরী, বেপরওয়া, দূরন্ত সাহসিকতা। وحشت ناك – ভয়াবহ, ভীতিপ্রদ। بے قرار – অধৈর্য, অস্থির, অশান্ত, পেরেশান। گلشن – বাগান, বাগিচা। لازوال – যাহার শেষ নাই, অন্তহীন, চিরস্থায়ী, যাহার ধ্বংস নাই। بے اختيار – নিজেনিজে, অনিচ্ছাকৃতভাবে, বে কাবু, অনিয়ন্ত্রণ, অপারগ, বাধ্য। سرفروش – প্রাণ উৎসর্গী, জানবাজ, বাহাদুর, নিবেদিত প্রাণ। ٹس سے مس نه هونا – বিচলিত না হওয়া, অনড় থাকা, নিজের কথায় জিদ ধরিয়া থাকা, কোন বিষয়ে নীতি নির্ধারণের পর কোন অবস্থাতেই উহা ত্যাগ না করা, প্রভাবিত না হওয়া। سرنگوں – অপমানিত। گل هونا – নির্বাপিত হওয়া, প্রদীপ নিভিয়া যাওয়া, সুনাম ক্ষুণ্ন হওয়া, ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়া, মান-সম্মান বিনাশ হওয়া। حماقت – নির্বুদ্ধিতা,

বোকামী, অজ্ঞতা। بردبار সহিষ্ণু, সহনশীল, ধৈর্যশীল, গম্ভীর। نادان – অজ্ঞ, মুর্খ, বোকা, কম বয়সী। فواره – প্রস্রবণ, প্রবাহ, ঝর্ণা। حسرت – আক্ষেপ, দুঃখ, বেদনা, আকাঙ্খা। قهر – গজব, রাগ, ক্রোধ, ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধ, প্রাধান্য, জবরদস্তী, আবেগ, উত্তেজনা, প্রেরণা, তীব্রতা, কঠিন কর্ম, বালা, মুসীবত।

৪র্থ হিজরী

নিরপরাধ রক্তপাত

প্রশ্ন ঃ চতুর্থ হিজরীতে কয়টি গাযওয়া সংঘটিত হয় এবং কয়টি বাহিনী রওনা করা হয়?

উত্তর ঃ দুইটি গাযওয়া সংঘটিত হয়। বনু নাজীরের গাযওয়া এবং বদরের ছোট যুদ্ধ। তা ছাড়া চারটি অভিযাত্রী দল রওনা করা হয়।

প্রশ্ন ঃ বনু নাজীর তো ছিল মদীনার ইহুদীদের একটি গোত্র। তাহাদের সঙ্গে কি কারণে এবং কিভাবে যুদ্ধ হয়?

উত্তর ঃ পূর্বেই জানা হইয়াছে যে, ইহুদীরা ঐ চুক্তির পাবন্দি করে নাই যাহা শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা আগমনের পরই সম্পাদন করা হইয়াছিল এবং উহার ফলেই তাহাদিগকে বহিষ্কৃত হইতে হয়। এখন বুন নাজীরও (উহার বিরুদ্ধাচরণ) করে। সুতরাং তাহাদেরকেও দেশ ত্যাগের হুকুম দেওয়া হয়। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন উবাই এবং ইহুদীদের অপর কবীলা বনু কোরাইজা কর্তৃক ক্ষেপাইয়া তোলার কারণে তাহারা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের উপর আক্রমণ করিলে তাহারা দুর্গে আবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং কিছু দিন তাহাদিগকে অবরোধ করিয়া রাখা হয়। অবশেষে বাধ্য হইয়া তাহারা দেশ-ত্যাগ মানিয়া লয়।

প্রশ্ন ঃ তাহারা কি বিষয়-সম্পদ সঙ্গে লইয়া যাওয়ার অনুমতি পায়, না উহা বাজেয়াপ্ত করা হয়?

উত্তর ঃ তাহাদের প্রতি হুকুম করা হয়– হাতিয়ার ব্যতীত অপরাপর ছামান উটের উপর চাপাইয়া যেই পরিমা সঙ্গে লইয়া যাওয়া যায়, যেন লইয়া যাওয়া হয়।

প্রশ্ন ঃ মদীনার খলীফা কাহাকে নিযুক্ত করা হয় এবং এই অবরোধ কত দিন বলবৎ থাকে?

উত্তর ঃ হযরত ইবনে উম্মে মাকতুমকে খলীফা নিযুক্ত করা হয় এবং এই অবরোধ ছয় দিন বলবৎ থাকে।

প্রশ্ন ঃ তাহারা কিভাবে চুক্তি ভক্ত করে?

উত্তর ঃ তাহারা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে।

প্রশ্ন ঃ এই ষড়যন্ত্রের বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ চতুর্থ হিজরীর কথা। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক "জাতীয় চাঁদা সংগ্রহ" উপলক্ষে বনু নাজীরের মহল্লায় তাশরীফ লইয়া গেলেন। তাহারা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি দেয়ালের নীচে (পাশে) বসাইয়া ইবনে হাজ্জাশ নামে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিল যেন উপর হইতে পাথর নিক্ষেপ করিয়া রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাবসান ঘটাইয়া দেয় (দুশমনদের ভাগ্যেই এইরূপ হউক)।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা হইতে কেমন করিয়া রক্ষা পাইলেন?

উত্তর ঃ আল্লাহ পাক তাঁহাকে এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করিয়া দিলেন।

প্রশ্ন ঃ ইহুদীদের ব্যক্তিগত হিংসা-বিদ্বেষ ব্যতীত উহার অপর কোন কারণও ছিল কি?

উত্তর ঃ কোরাইশ কাফেরদের একটি চিঠিও উহার কারণ ছিল, যেই চিঠি তাহারা বদরে পরাজয়ের পর মদীনার ইহুদীদের নামে লিখিয়া ছিল।

প্রশ্ন ঃ ঐ চিঠির বিষয়বস্তু কি ছিল?

উত্তর ঃ তোমরা শক্তিশালী। তোমাদের নিকট দুর্গও আছে, তোমরা মোহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সঙ্গে যুদ্ধ কর। অন্যথায় আমরা তোমাদের সঙ্গে এইরূপ এইরূপ আচরণ করিব এবং তোমাদের নারীদের পায়ের অলঙ্কার পর্যন্ত খুলিয়া ফেলিব।

প্রশ্ন ঃ বনু নাজীর মদীনা হইতে কিভাবে বাহির হয় এবং কোথায় গিয়া বসবাস করে?

উত্তর ঃ নিজেদের ঘর-দোর নিজেদের হাতেই ধ্বসাইয়া দিয়া ছয়শত উটের উপর নিজেদের ছামান চাপাইয়া বাজনা বাজাইতে বাজাইতে বাহির হইয়া যায় এবং খায়বরে গিয়া বসবাস করে।

প্রশ্ন ঃ তাহাদের বিষয়-সম্পদ ও জমিনসমূহ কি করা হয়?

উত্তর ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত অধিকারে দখল করা হয়।

প্রশ্ন ঃ তাহাদের নিকট হইতে কি পরিমাণ হাতিয়ার পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ পঞ্চাশটি লৌহবর্ম, পঞ্চাশটি শিরস্ত্রাণ এবং তিনশত চল্লিশটি তলোয়ার।

প্রশ্ন ঃ ঐ বৎসর যেই চারটি সেনাদল প্রেরণ করা হয়, উহার মধ্যে বিরে মাউনা কি কারণে অধিক প্রসিদ্ধ?

উত্তর ঃ কারণ, উহাতে সত্তর জন কোরআনে হাফেজ ছাহাবাকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে শহীদ করা হয়।

প্রশ্ন ঃ তাহাদিগকে কোথায় ও কি উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয় এবং

লোকেরা কি কারণে তাহাদিগকে শহীদ করে?

উত্তর ঃ বস্তুতঃ তাহাদিগকে নজদবাসীদের উপর দ্বীনের তাবলীগ করার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা বিরে মাউনা নামক প্রসিদ্ধ স্থানে পৌঁছাইবার পর তথায় কয়েকটি গোত্র যুদ্ধের জন্য আসিয়া জড়ো হয়। আর ঘটনাক্রমে একমাত্র হযরত কাআব বিন জায়েদ ব্যতীত অন্য সকলকেই শহীদ করিয়া দেওয়া হয়।

প্রশ্ন ঃ এই দলের প্রধান কে ছিলেন?

উত্তর ঃ মুনজির ইবনে আমর আনসারী (রাঃ)।

প্রশ্ন ঃ এই দলটি প্রেরণের পিছনে কাহারো কোন ষড়যন্ত্র ছিল কি?

উত্তর ঃ (উহার পিছনে) আবু বারা আমেরের প্রতারণা ছিল। সে নিশ্চয়তা দিয়াছিল যে, তাহারা নিরাপদ থাকিবে এবং এই তাবলীগ ফলপ্রসু হইবে। কারণ, নজদের প্রশাসক আমার ভ্রাতুস্পুত্র। কিন্তু গোপনে সে গোত্রসমূহকে হত্যাকাণ্ডের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল।

প্রশ্ন ঃ এই সকল গোত্র কাহারা, যাহারা এই জুলুম করিল?

উত্তর ঃ আমের, রুউলু, জাক্‌ওয়ান এবং উসাইয়্যাহ।

প্রশ্ন ঃ কবে যাত্রা করা হয়?

উত্তর ঃ চতুর্থ হিজরীর ছফর মাসে।

প্রশ্ন ঃ এই বৎসরের অন্যান্য বড় বড় ঘটনা কি?

উত্তর ঃ (১) জান্নাতী যুবকদের সরদার শহীদগণের গৌরব, সাইয়্যেদানা হযরত হোছাইন (রাঃ)-এর জন্ম। (২) হযরত জায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ)-কে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদী (ভাষার) লেখা শিক্ষা করিতে হুকুম করেন।

সারাংশ

চতুর্থ হিজরীতে বনু নাজীর নিজেদের ব্যক্তিগত শত্রুতা এবং কোরাইশদের প্ররোচনার ফলে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। এই কারণে তাহাদিগকে মদীনা হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহারা খায়বরে গিয়া বসতী স্থাপন করে। ঐ বৎসরই বিরে মাউনার প্রসিদ্ধ ঘটনা ঘটে। ঐ ঘটনায় আমের, রুউলু, জাক্ওয়ান এবং উসাইয়্যাহ গোত্রের লোকেরা সত্তর জন হাফেজে কোরআনকে শহীদ করিয়াছিল। আবু বারা আমেরের প্রতারণামূল আবেদনের ভিত্তিতে নজদ্বাসীদের জন্য তাবলীগ করার উদ্দেশ্যে তাহারা যাইতেছিলেন।

শব্দার্থ ঃ

(মূল উর্দূ কিতাবের পাঠকদের জন্য)

امن و امان – শান্তি ও নিরাপত্তা। جلاوطن – নির্বাসিত, দেশ হইতে বহিষ্কৃত। پازیب – পাঁয়জোর, এক প্রকার অলংকার যাহা পায়ে পরিধান করা হয়, নূপুর, মঞ্জুরী, ঘুঙুর।

পঞ্চম হিজরী

গাযওয়ায়ে খন্দক বা গাযওয়ায়ে আহযাব

প্রশ্ন ঃ পঞ্চম হিজরীর সর্ববৃহৎ যুদ্ধ কোন্‌টি?

উত্তর ঃ আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধ।

প্রশ্ন ঃ উহাকে গাযওয়ায়ে আহযাব কেন বলা হয়?

উত্তর ঃ ঐ যুদ্ধে আরবের বড় বড় গোত্রসমূহ এক হইয়া মদীনার উপর চড়াও হইয়াছিল, এই কারণেই উহাকে গাযওয়ায়ে আহযাব বলা হয়। হিয্‌ব

অর্থ জামায়াত। উহার বহুবচন হইল আহযাব বা জামায়াতসমূহ।

প্রশ্ন ঃ ঐ যুদ্ধকে গাযওয়ায়ে খন্দক কেন বলা হয়?

উত্তর ঃ এই কারণে যে ঐ যুদ্ধে মদীনার চতুর্দিকে পরিখা বা গর্ত খনন করা হইয়াছিল।

প্রশ্ন ঃ এই যুদ্ধের কারণ কি ছিল?

উত্তর ঃ কাফেরদের সেই পুরাতন শত্রুতা এবং ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার আঠার বৎসরের (লালিত) বাসনা, যাহা বদর এবং ওহোদের পর গোটা আরবে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সুতরাং দু'ছুরের আক্রমণ এবং বিরে মাউ'না ইত্যাদি ঘটনাসমূহ উহারই পরিণতি ছিল।

প্রশ্ন ঃ ঐ যুদ্ধে কোন্ শ্রেণীর লোকেরা শরীক ছিল?

উত্তর ঃ আরবের মূর্তিপূজক কাফের এবং ইহুদীরা।

প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ গোত্র কি কি উপায়ে ঐ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং কি ষড়যন্ত্র কার্যকর করা হয়?

উত্তর ঃ ইতিপূর্বে কেবল আরবের কাফেররা বাহির হইতে আক্রমণ করিত। কিন্তু নিজেদের চুক্তিভঙ্গের কারণে বনু নাজীর ও বনু কাইনুকা' এই দুই ইহুদী সম্প্রদায়কে মদীনা হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিল। এই সুযোগে তাহারা কেবল আক্রমণকারীদের সঙ্গেই সারিবদ্ধ হয় নাই; বরং (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) ষড়যন্ত্রেও বরাবর শরীক ছিল। তা ছাড়া মক্কার কাফেররা অপরাপর গোত্রসমূহকেও উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে প্রাণপণ চেষ্টা করিল এবং বক্তৃতা ও কবিতা পরিবেশনের মাধ্যমে আরবের সকল বড় বড় দলসমূহের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া দিল। ফলে মক্কা হইতে মদীনার (সুবিস্তির্ণ অঞ্চল জুড়িয়া) সকল গোত্রের মধ্যে ইসলামের সঙ্গে শত্রুতার আগুন ছড়াইয়া পড়িল। আর মূলতঃ ঐ বৎসর যেই ছোট ছোট যুদ্ধ অনুষ্ঠিত

হয় উহা এই ধারারই অংশ ছিল। অবশেষে সকলে এক হইয়া মদীনার উপর চড়াও হয়।

প্রশ্ন ঃ এই আক্রমণ কোন্ মাসে পরিচালিত হয়?

উত্তর ঃ জিক্বাআদাহ মাসে।

প্রশ্ন ঃ গাযওয়ায়ে খন্দকে কতজন মুসলমান ছিল এবং কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনীর সংখ্যা কত ছিল?

উত্তর ঃ মুসলমানদের সংখ্যা ছিল সর্বমোট তিন হাজার। আর কাফেরদের সংখ্যা শুরুতে দশ হাজার এবং পরে উহা প্রায় দুই গুণ বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ঃ ইহুদীদের তৃতীয় গোত্র যাহা তখনো মদীনাতে আবাদ ছিল, অর্থাৎ– বনু কোরাইজাহ; এই সুযোগে তাহারা কি করিল?

উত্তর ঃ চুক্তি ভঙ্গ করিয়া আক্রমণকারীদের সঙ্গে মিশিয়া গেল, যাহার ফলে তাহাদের সংখ্যায় বিপুল বৃদ্ধি ঘটিল।

প্রশ্ন ঃ এই সময় কি কারণে খন্দক খনন করা হয়?

উত্তর ঃ ইতিপূর্বেই জানা গিয়াছে যে, কাফেরদের সংখ্যা ছিল বিপুল এবং মুসলমানদের সংখ্যা ছিল সর্বমোট তিন হাজার। তাছাড়া খোদ মদীনায় বসবাসরত বনু কোরাইজার ইহুদীরা যদিও শুরুতে যুদ্ধের ঘোষণা দেয় নাই, কিন্তু তাহাদের পক্ষ হইতে (অবশ্যই উহার) আশঙ্কা ছিল (যাহা পরবর্তীতে দৃষ্ট হয়)। সর্বোপরি মোনাফেকদের বিশেষ জামায়াত স্বতন্ত্রভাবেই 'বন্ধুর ছুরতে শত্রু'তে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং (এই সকল কারণেই) মদীনা হইতে বাহিরে গিয়া যুদ্ধ করা সঙ্গত মনে করা হয় নাই। বরং মদীনার ভিতরে থাকিয়াই মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং যেই দিক হইতে কাফেরদের অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা ছিল, সেই দিকে এক (সুবিশাল) পরিখা খনন করা হয়।

প্রশ্ন ঃ পরিখা খননের রায় (পরামর্শ) কে দিয়াছিলেন?

উত্তর ঃ হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)।

প্রশ্ন ঃ এই খন্দক (পরিখা) কাহারা খনন করেন?

উত্তর ঃ সকল মুসলমানগণ, যাহাদের মধ্যে স্বয়ং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও শামিল ছিলেন।

প্রশ্ন ঃ এই পরিখা খননে কয়দিন সময় ব্যয় হয়?

উত্তর ঃ ছয় দিন।

প্রশ্ন ঃ পরিখা কি পরিমাণ গভীর করিয়া খনন করা হয়?

উত্তর ঃ পাঁচ গজ।

প্রশ্ন ঃ কাফেররা এই পরিখার তীরে কত দিন অবস্থান করিয়া ছিল?

উত্তর ঃ পনর দিন।

প্রশ্ন ঃ এই সময়ে মুসলমানদের এবং স্বয়ং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা কি ছিল?

উত্তর ঃ মুসলমানদের উপর তিন দিন অনাহার অতিক্রম করে। কোমর সোজা রাখার জন্য তাহারা পেটে পাথর বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। একদিন ছাহাবীগণ দরবারে রেসালাতে অনাহারের অভিযোগ করিয়া পেটের পাথর খুলিয়া দেখাইলেন। (জবাবে) পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পেট মোবারক খুলিয়া দেখাইলেন। তো (দেখা গেল,) সকল মুসলমানের পেটে ছিল একটি করিয়া পাথর আর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেট মোবারকে ছিল দুইটি পাথর। (পরিখা খননের কাজে) কর্ম ব্যস্ততার এমন অবস্থা ছিল যে, একদিন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চার ওয়াক্ত নামাজ কাজা হইয়া যায়।

খনন করিতে করিতে এক পর্যায়ে একটি বিশাল পাথর বাহির হইয়া

আসে। উহা অপসারণ করিতে সকল ছাহাবী অপারগ হইয়া গেলেন। অবশেষে তাহারা সকল সমস্যার আশ্রয়স্থল অর্থাৎ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়া অভিযোগ করিলেন। যেই পাথরটি ছাহাবীগণ নাড়াইতেও পারিলেন না, পেয়ারা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাকে এক আঘাতেই গুড়াইয়া দিলেন। ইহা ছিল তাঁহার মোজেযা।

প্রশ্ন ঃ কিভাবে এই অবস্থান বা (অবরোধের) পরিসমাপ্তি হয়?

উত্তর ঃ পনর দিনের মধ্যে কাফেরদের সকল রসদ ও ছামান নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। তাছাড়া হযরত নাঈম বিন মাসউদ (রাঃ) নামে এক বুজুর্গ ছিলেন। তিনি একটি (কুটনৈতিক) উপায় অবলম্বন করিলেন,[১] যাহার ফলে খোদ কাফেরদের লশকরের মধ্যেই বিভেদ সৃষ্টি হইয়া গেল। এদিকে আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতেও গায়বী সাহায্য (নাজিল) হইল। এমন ভয়াবহ তুফান আসিল যে, (উহার ফলে কাফেরদের) সকল তাবু উপড়াইয়া গেল এবং চুলা হইতে খাবারের হাড়িগুলিও উল্টাইয়া গেল। এই সকল ঘটনা কাফেরদেরকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করিয়া দিল এবং তাহারা ব্যর্থকাম অবস্থায় পলায়ন করিল।

প্রশ্ন ঃ এই সুযোগে কোন প্রকার যুদ্ধ হইয়াছে কি?

উত্তর ঃ কাফেররা খন্দক অতিক্রম করিতে না পারিয়া মুসলমানদের উপর পাথর ও তীর নিক্ষেপ করে এবং মুসলমানরাও উহার জবাব দেয়। তবে দুই একজন কাফের (খন্দক) অতিক্রম করিয়াও আসিয়াছিল, তাহাদের

টীকা

১। ঘটনাটি এইরূপ ঃ বিভিন্ন দল ও শ্রেণীর লোকেরা যদিও ইসলামের মোকাবেলায় এই সময় ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু খোদ তাহাদের নিজেদের মধ্যে কিন্তু পরস্পর আস্থা ছিল না। হযরত নাঈম (রাঃ) তাহাদের সেই অবস্থাটিরই বহিঃপ্রকাশ ঘটাইয়া দিয়াছিলেন।

সঙ্গে তলোয়ার দ্বারা সামনাসামনি যুদ্ধ হয়।

প্রশ্ন ঃ বনু কোরাইজার এই প্রতারণার জবাব কিভাবে দেওয়া হয়?

উত্তর ঃ আহযাবের যুদ্ধ হইতে অবসর হওয়ার পর তাহাদের উপর আক্রমণ করা হয়। আক্রমণের কারণ ইহাও ছিল যে, বনু নাজীরের সরদার হুইয়াই বিন আখতাব, যে তাহাদিগকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য উৎসাহিত করিয়ছিল, সে তাহাদের মধ্যেই বসবাস করিতেছিল। কিন্তু তাহারা দুর্গে ঢুকিয়া পড়ে এবং পচিশ দিন তাহাদের অবরোধ অব্যাহত থাকে। অবশেষে বাধ্য হইয়া রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দরখাস্ত করিল যে, আউস গোত্রের সরদার হযরত সাআদ বিন মোয়াজ (রাঃ)-কে সালিস নিযুক্ত করা হউক। তিনি যাহা ফায়সালা করিবেন উহাই গ্রহণ করা হইবে। হযরত সাআদ বিন মোয়াজ (রাঃ) ইহুদীদের ধর্মমত অনুযায়ী ফায়সালা করিয়াছিলেন। উহার মূল কথা ছিল এই–

(১) যুদ্ধ করিতে সক্ষম পুরুষদেরকে হত্যা করা হইবে।

(২) নারী ও শিশুদিগকে গোলাম বানানো হইবে এবং সম্পদ বন্টন করিয়া দেওয়া হইবে।

যাহাই হউক, এই ফায়সালার উপর একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আমল করা হয়।

প্রশ্ন ঃ এই সময় ইসলামী পতাকা কাহার নিকট ছিল এবং মদীনার খলীফা কে নিযুক্ত হন?

উত্তর ঃ হযরত আলী (রাঃ)-কে পতাকা দেওয়া হয় এবং হযরত উম্মে মাকতুম মদীনার খলীফা নিযুক্ত হন।

প্রশ্ন ঃ বনু কোরাইজা ও খন্দকের যুদ্ধে কতজন মুসলমান শহীদ হন?

উত্তর ঃ আনুমানিক দশ জন।

প্রশ্ন ঃ এই বৎসর বনু কোরাইজা ও খন্দকের যুদ্ধ ব্যতীত অপর কোন যুদ্ধ হইয়াছিল কি?

উত্তর ঃ তিনটি গাযওয়া অনুষ্ঠিত হয়– (১) জাতুররিকা' (২) দাওমাতুল জান্দাল এবং– (৩) বনু মোস্তালাক। কিন্তু শুধু বনু মোস্তালাকেই যুদ্ধ হয় এবং বিজয় অর্জিত হয়।

প্রশ্ন ঃ এই বৎসর কোন সেনাদলও পাঠানো হইয়াছিল কি?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ এই বৎসরের অপরাপর বড় ঘটনা কি?

উত্তর ঃ (১) জুমাদাল উলা মাসে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৌহিত্র হযরত আব্দুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। তিনি হযরত রোকাইয়ার গর্ভ হইতে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর পুত্র ছিলেন।

(২) কোন কোন আলেমের বক্তব্য অনুযায়ী শাওয়াল মাসে হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ)-এর মাতা ইন্তেকাল করেন।

(৩) জুমাদাচ্ছানীতে হযরত উম্মে ছালামার (রাঃ) সঙ্গে এবং জিক্বাআদাতে হযরত জয়নব বিনতে জাহাশের সঙ্গে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

(৪) মদীনাতে ভূমিকম্প হয়।

(৫) চন্দ্র গ্রহণ হয়।

(৬) প্রায় ওলামাদের ধারণা হইল এই বৎসরই হজ্জ ফরজ হয়।[১]

টীকা

১। কিন্তু হাফেজ ইবনে কাইম (রহঃ) অত্যন্ত কঠোরভাবে এই ধারণা খণ্ডন করিয়া ১ম হিজরীতে হজ্ব ফরজ হওয়ার কথা বলিয়াছেন।

সারাংশ

পঞ্চম হিজরীতে ইহুদী ও কোরাইশরা ঐক্যবদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগকে ধ্বংস করার চূড়ান্ত চেষ্টা চালায়। গোটা আরবের বড় বড় গোত্রসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া ইসলামের উপর আক্রমণ করা হয়। মদীনার অবশিষ্ট ইহুদী বনু কোরাইজাও মুসলমানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া কাফেরদের সঙ্গে মিলিত হয়। দশ হাজার লশকরের বিশাল বাহিনী মদীনার উপর চড়াও হয়। বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বাহিরে আসিয়া যুদ্ধ করা সঙ্গত মনে করা হয় নাই। সুতরাং হযরত সালমান ফারসীর মতামত অনুযায়ী আশঙ্কাজনক স্থানসমূহে পরিখা খনন করা হয় এবং এই ব্যবস্থা ফলপ্রসু হয়। ফাফেররা উহা অতিক্রম করিতে না পারায় মুসলমানগণ নিরাপদে থাকে। তাহারা ১৫ দিন (পরিখার তীরে) অবরোধ করিয়া রাখে। অবশেষে কিছু গায়বী সাহায্য, কিছু পারস্পরিক অনৈক্য ও রসদ ফুরাইয়া যাওয়া– তাহাদিগকে পালাইয়া যাইতে বাধ্য করে।

বনু কোরাইজা প্রথমতঃ ধোঁকা দিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ তাহাদিগকে উৎসাহদানকারী ইসলামের বিদ্রোহী ও বনু নাজীরের সরদার হুইয়াই বিন আখতাব তাহাদের মধ্যেই আত্মগোপন করিয়াছিল। সুতরাং গাযওয়ায়ে খন্দক হইতে অবসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বনু কোরাইজার উপর আক্রমণ করা হইল। কিন্তু তাহারা দুর্গের ভিতরে চলিয়া যায় এবং বাধ্য হইয়া আউস গোত্রের মুসলমানদিগকে মধ্যখানে টানিয়া আনিয়া রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবেদন করে যে, আউস গোত্রের সরদার হযরত সাআদ বিন মোয়াজ (রাঃ)-কে সালিস নিযুক্ত করা হউক। হযরত সাআদ তাহাদের ধর্ম অনুযায়ী ফায়সালা ঘোষণা করেন। উহার মূল কথা ছিল– "যুদ্ধ করিতে পারে" এমন যুবকদেরকে হত্যা করা হউক। নারী ও শিশুদিগকে গোলাম বানানো হউক এবং সমুদয় সম্পদ বন্টন করিয়া লওয়া হউক।

শব্দার্থ ঃ

(মূল উর্দূ কিতাবের পাঠকদের জন্য)

قصیدہ – কবিতা, কাহারো প্রশংসা বা নিন্দা বর্ণিত কবিতা। عداوت শত্রুতা, দুশমনি, হিংসা, ঈর্ষা, বিরুদ্ধাচরণ। ہلہ – চড়াও, হামলা, আক্রামণ, ধাওয়া, হট্টগোল। خطرہ – আশঙ্কা, ভয়, বিপদ, ভীতি, অনিষ্ট, শঙ্কট, মুসীবত। مشغولیت – ব্যস্ততা, কোন কাজে নিমগ্নতা। پھوٹ –বিভেদ, অনৈক্য, কলহ, বিচ্ছেদ, মতভেদ, پھوٹ پڑنا – বিভেদ সৃষ্টি হওয়া। محرومی – ব্যর্থতা, ব্যর্থকাম হওয়া, বঞ্চিত হওয়া, নৈরাশ্য, অকৃতকার্যতা। روبرو – সামনাসামনি, মুখোমুখি। پنچ – পাঁচ সংখ্যার সংক্ষিপ্তরূপ, পঞ্চায়েত, সালিস, তৃতীয় ব্যক্তি, পরস্পর মীমাংসাকারী, গোত্রপ্রধান। بطن – পেট, উদর, কোন বস্তুর ভিতরের অংশ। متحد – ঐক্যবদ্ধ, সম্মিলিত, একত্রিত, যে একত্রিত করে। جرار – বিশাল সামরিক বাহিনী, সাহসী, বীর।

ষষ্ঠ হিজরী

শান্তি ও নিরাপত্তার যুগ, অহংকার ও জুলুমের অবসান, কাফেরদের পরাজয় এবং ইসলামের বিজয়, হোদায়বিয়ার সন্ধি, বাইআতে রিজওয়ান এবং মুসলমান হওয়ার জন্য রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট পত্র

প্রশ্ন ঃ ষষ্ঠ হিজরীর সবচাইতে বড় ঘটনা কি?

উত্তর ঃ হোদায়বিয়ার সন্ধি।

প্রশ্ন ঃ হোদায়বিয়া কিসের নাম?

উত্তর ঃ একটি কূপের নাম। ঐ কূপের নামেই সেখানে একটি গ্রাম অবস্থিত।

প্রশ্ন ঃ এই কূপটি কোথায়?

উত্তর ঃ মক্কা মোয়াজ্জমা হইতে এক মঞ্জিল দূরত্বে।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কারণে সেখানে তাশরীফ লইয়া গিয়াছিলেন?

উত্তর ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (স্বীয়) পবিত্র জন্মভূমি অর্থাৎ মক্কা মোয়াজ্জমা ত্যাগ করিয়াছেন প্রায় ছয় বৎসর হইয়া গিয়াছিল। মক্কা মোয়াজ্জমা ছিল ঐ শহর যাহা পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতৃভূমি হওয়া ছাড়াও সে আল্লাহর ঘরকে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়াছিল প্রথমতঃ জন্মভূমিতে যাওয়ার আগ্রহ, তদুপরী খানায়ে কা'বা অর্থাৎ আল্লাহর নূরের স্থান– যাহার দিকে মুসলমানগণ প্রতিদিন পাঁচবার নামাজ আদায় করিত এবং হজ্বের সময় উহার চতুর্দিকে তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করা ফরজ ছিল– উহা জেয়ারতের বাসনা ও আগ্রহের শিখা সকল মুসলমানদের অন্তরেই উচ্ছলিত ছিল।

উপরোক্ত আবেগ-বাসনা পূরণ করার উদ্দেশ্যে ৬ষ্ঠ হিজরীর জিক্বাআদাহ মাসে ছাহাবাদের একটি বড় জামায়াত সঙ্গে লইয়া রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মোয়াজ্জমা জেয়ারতের এরাদা করিয়া হোদায়বিয়া নামক স্থানে গমন করিলেন।

প্রশ্ন ঃ মক্কার কাফেররা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সকল মুসলমানদের প্রাণের শত্রু ছিল। সুতরাং সেখানে গমনের পর তিনি মক্কায় প্রবেশের কি উপায় অবলম্বন করিলেন?

উত্তর ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হোদায়বিয়া গমনের পর হযরত ওসমান (রাঃ)-কে কোরাইশদের নিকট এই মর্মে সংবাদ দিয়া

পাঠাইলেন যে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ছফরের উদ্দেশ্য কেবল খানায়ে কা'বা জেয়ারত করা।

প্রশ্ন ঃ কোরাইশরা অনুমতি দিয়াছিল কি?

উত্তর ঃ অনুমতি দেয় নাই বটে, তবে ছোহাইল বিন আমরকে সন্ধি করার জন্য প্রেরণ করিল। সুতরাং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং কোরাইশী কাফেরদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইয়া যায়।

প্রশ্ন ঃ এই সন্ধিতে কি কি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়?

উত্তর ঃ (১) এইবার মুসলমানগণ ফেরত চলিয়া যাইবে।

(২) আগামী বৎসর কা'বা শরীফ জেয়ারত করিবে, তবে মাত্র তিন দিন অবস্থান করিয়া ফেরত চলিয়া যাইবে।

(৩) অস্ত্রসজ্জিত হইয়া আসিবে না, সঙ্গে তলোয়ার আনিলে উহা কোষবদ্ধ থাকিবে।

(৪) যদি (মক্কা হইতে) কেহ আপনার নিকট (মদীনায়) চলিয়া যায়, তবে তাহাকে ফেরত পাঠাইয়া দিবেন– যদিও সে মুসলমান হইয়া যায়। পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি আপনার নিকট হইতে আমাদের নিকট চলিয়া আসিবে, আমরা তাহাকে ফেরত পাঠাইব না।

(৫) এই সন্ধির মেয়াদকাল হইবে দশ বৎসর।

(৬) এই সময়ের মধ্যে কোন প্রকার যুদ্ধ, সন্ধিভঙ্গ ও প্রতারণা করা চলিবে না।

প্রশ্ন ঃ এই সন্ধিতে অপরাপর গোত্রও শরীক হইয়াছিল কি?

উত্তর ঃ বনী খুযাআ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে চলিয়া আসে এবং বনী বকর কোরাইশদের সঙ্গ অবলম্বন করে। আর এই উভয় গোত্রও এই সন্ধির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রশ্ন ঃ এই সকল শর্ত যাহা দৃশ্যতঃ মুসলমানদের জন্য পরাজয়সুলভ ছিল– কেন মঞ্জুর করা হয়?

উত্তর ঃ আল্লাহ পাকের ইহাই হুকুম ছিল।

প্রশ্ন ঃ এই পরাজয়সুলভ শর্তসমূহ মুসলমানদের নিকট অস্বস্তিকর মনে হয় নাই কি?

উত্তর ঃ ভিষণ অস্বস্তির উদ্রেক হইয়াছে। এমনকি হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) আরজ করিলেন, আমরা যখন হকের উপর আছি, তখন কি কারণে নতি স্বীকার করিব? কিন্তু রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ ছিলঃ ইহাই আল্লাহ পাকের হুকুম। এই কথার উপর সকলেই অবনত মস্তকে উহা মানিয়া লইল।

প্রশ্ন ঃ পবিত্র কোরআনে এই সন্ধিকে 'ফাত্‌হে মুবীন' কেন বলা হইল?

উত্তর ঃ বাস্তবিক পক্ষে এই সন্ধিটি বিরাট বিজয় ছিল বটে। অতীতের ধারণা অনুযায়ী উহা এই কারণে (বিজয় ছিল) যে, মুসলমানদের ঐ মুষ্টিমেয় দল যাহাদিগকে নিঃশেষ করিয়া দেওয়া কাফেররা বাম হাতের খেলা মনে করিতেছিল এবং যাহাদিগকে (আল্লাহর পানাহ) অভুক্তের দল বলিয়া মন্তব্য করিত, যাহাদের মুখের সামনে কথা বলাও তাহাদের আত্মগৌরবের পরিপন্থী ছিল; মক্কার অধিবাসীসহ গোটা আরবের চেষ্টা সত্ত্বেও তাহাদের বিনাশ হয় নাই। পক্ষান্তরে (আরবের সেই) শক্তিশালী জামায়াতের পক্ষে বাধ্য হইয়া সন্ধির জন্য হস্ত প্রসারিত করা – প্রকৃত পক্ষে মুসলমানদের জন্য বিরাট বিজয় ছিল। কারণ, শক্তিশালীর পক্ষে বাধ্য হইয়া দুর্বলের সঙ্গে সন্ধি করা – মূলতঃ দুর্বলের বিজয়ই বটে।

দ্বিতীয়তঃ ভবিষ্যতের বিবেচনায় উহা এই কারণে (বিজয়) যে, উহার উপকারিতা ছিল ব্যাপক ও সুমহান। যেমন–

(ক) কোরাইশদের প্রতিরোধের কারণে মুসলমানদের পক্ষে এই পর্যন্ত

গোটা আরবে স্বাভাবিকভাবে বিচরণ করিয়া ইসলাম প্রচার করার সুযোগ হয় নাই। আর কাফেরদের পক্ষ হইতে ইসলামের দুর্নাম প্রচার এবং ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর ধারণা প্রচার করার এমন অবস্থা ছিল যে, খোদ মক্কার বহু মানুষ ইসলামের হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। সুতরাং এই সন্ধির ফলে কাফেরদের সঙ্গে মুসলমানদের সাক্ষাত এবং তাহাদের নিকট ইসলামের হাকীকত পেশ করার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। সুতরাং এই সন্ধির পর অল্প সময়ের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা এমন বৃদ্ধি ঘটিল যে, ইতিপূর্বেকার সময়ে (মুসলমানদের সংখ্যায়) এমন উন্নতি ঘটে নাই।

এই সময় পর্যন্ত গোটা মুসলমানদের সংখ্যা আনুমানিক দুই-আড়াই হাজার ছিল। কিন্তু উহার দুই বৎসর পর মক্কা বিজয়ের জন্য যেই বাহিনী যাত্রা করে, উহাতে নারী, শিশু ও দুর্বলরা ব্যতীত শুধু যোদ্ধাদের সংখ্যাই ছিল দশ হাজার।

(খ) রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোটা পৃথিবীর জন্য নবী বানাইয়া প্রেরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু এই যাবৎ তিনি কাফেরদের প্রতিরোধের কারণে আরবের অন্যান্য দেশে ইসলামের তাবলীগ করার সুযোগ পান নাই। কিন্তু এখন সন্ধি ও নিরাপদ পরিবেশের কারণে উহা আছান হইয়া গেল। সুতরাং অপরাপর দেশের বাদশাহদের নামে তিনি পত্র লিখিলেন।

প্রশ্ন ঃ ওমরা কাহাকে বলে এবং এহরাম বাঁধার অর্থ কি?

উত্তর ঃ হজ্বের মত ওমরাও একটি এবাদতের নাম। ইহাতে মক্কা গমন করিয়া বিশেষ বিশেষ এবাদত সম্পন্ন করা হয়। ওমরা ও হজ্বের ব্যবধান হইল ফরজ ও নফলের মত। হজ্ব একটি বিশেষ সময়ে আদায় করা হয়। ওমরার জন্য বিশেষ কোন সময়ের বাধ্যবাধকতা নাই। আর হজ্বের পূর্বে যেমন বিশেষ বিশেষ কাপড় পরিধান করা হয়, অনুরূপভাবে ওমরার পূর্বেও

বিশেষ বিশেষ কাপড় পরিধান করা হয়– যাহাকে এহরাম বাঁধা বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ হোদায়বিয়া পৌঁছাইবার পর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে কি মোজেযা প্রকাশ হয়?

উত্তর ঃ হোদায়বিয়ার কূপটি ছিল একেবারেই শুষ্ক। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেনঃ উহাতে একটি তীর ছাড়িয়া দাও। (অতঃপর) আল্লাহর হুকুমে উহাতে এত পানি আসিল যে, উহা সকলের জন্য যথেষ্ট হইয়া আরো উদ্বৃত্ত হইল।

প্রশ্ন ঃ বাইআতে রিজওয়ানের হাকীকত কি?

উত্তর ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত ওসমান (রাঃ)-কে মক্কায় প্রেরণ করিলেন, তখন মক্কার কাফেররা তাহাকে রাখিয়া দিলেন। (হযরত ওসমানের ফিরিতে) বিলম্ব হওয়ায় দুশ্চিন্তা দেখা দিল এবং এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল যে, (আল্লাহ না করুন) হযরত ওসমানকে শহীদ করা হইয়াছে। ঐ সময় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাবলা বৃক্ষের নীচে বসিয়া ছাহাবীগণের নিকট হইতে যুদ্ধের অঙ্গীকার অর্থাৎ বাইআত গ্রহণ করেন। ইহার নাম বাইআতে রিজওয়ান।

প্রশ্ন ঃ এই অঙ্গীকার বা বাইআতে কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল?

উত্তর ঃ এই কথা যে, আমরা ময়দান ত্যাগ করিব না।

প্রশ্ন ঃ এই বাইআত যাহা নিতান্ত নিঃসম্বল অবস্থায় (সম্পাদিত) হয়, (উহার বিনিময়ে) আল্লাহর পক্ষ হইতে কি পুরস্কার নাজিল হয় এবং ইহাকে বাইআতে রিজওয়ান বলা হয় কেন?

উত্তর ঃ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির সনদ দান করা হয়। সুতরাং কালামে পাকে এরশাদ হয়–

لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة

অর্থঃ আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন, যখন তাহারা বৃক্ষের নীচে আপনার নিকট শপথ করিল।

এই কারণেই ইহাকে বাইআতে রিজওয়ান বলা হয়। রিজওয়ান অর্থ সন্তুষ্টি।

প্রশ্ন ঃ এই বৎসর আর কয়টি গাযওয়া হয় এবং কয়টি বাহিনী রওনা করানো হয়?

উত্তর ঃ দুইটি গাযওয়া হয়। গাযওয়ায়ে লাহইয়ান এবং গাযওয়ায়ে গাবাহ। তবে গাযওয়ায়ে গাবাহকে জিকারদ-এর যুদ্ধও বলা হয়। তাছাড়া এগারটি বাহিনী রওনা (প্রেরণ) করা হয়।

প্রশ্ন ঃ এই বৎসরের অন্যান্য বড় ঘটনা কি?

উত্তর ঃ (১) হযরত খালেদ বিন ওলীদ এবং আমর ইবনুল আসের মুসলমান হওয়া। (২) দুনিয়ার বাদশাহগণের নিকট ইসলামের (দাওয়াত দিয়া) পত্র প্রেরণ।

প্রশ্ন ঃ এই দুই ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ করাকে বড় ঘটনার মধ্যে গণ্য করার কারণ কি?

উত্তর ঃ এই কারণে যে, এই দুই ব্যক্তি বড় বাহাদুর এবং অনেক বড় সেনাপতি ছিলেন। তাহাদের দ্বারা কুফরী হালাতে এবং ইসলামে আসার পরও অনেক বড় বড় তৎপরতা প্রকাশ পাইয়াছে।

সারাংশ

ষষ্ঠ হিজরীর জিক্বাআদাহ্ মাসে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মোয়াজ্জমা (গমনের) উদ্দেশ্যে চৌদ্দশত ছাহাবা সঙ্গে লইয়া যাত্রা করেন। কিন্তু হোদায়বিয়া নামক স্থানে গমনের পর তিনি হযরত ওসমান

(রাঃ)-কে এই উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রেরণ করিলেন, যেন (মক্কার কাফেরদিগকে) তাঁহার নেক উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করেন। কিন্তু কাফেররা পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া দেয়। তবে তাহাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হয়- যাহার আলোকে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই অধিকার দেওয়া হয় যে, কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে আগামী বৎসর আসিয়া তিনি বাইতুল্লাহ্ জেয়ারত করিবেন। যেহেতু এই সন্ধির অনেক বড় বড় ফায়দা ছিল, এই কারণে আল্লাহর কালামে উহাকে "ফাত্‌হে মুবীন" বলা হইয়াছে।

দুনিয়ার বাদশাহদের নামে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত চিঠি

প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ বাদশাহ্‌দের নামে ইসলাম গ্রহণের জন্য চিঠি প্রেরণ করা হয়, কাহাদের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়, তাহারা কোন্ কোন্ দেশের বাদশাহ ছিলেন এবং (চিঠির) কি জবাব দেন?

উত্তর ঃ পরবর্তী পৃষ্ঠায় উল্লেখিত নক্‌শা হইতে এই সকল প্রশ্নের জবাব জানিয়া লও।

নকশা

ক্রঃ নং	বাদশার নাম	কোথাকার বাদশাহ ছিলেন	চিঠি কে লইয়া যান	চিঠির জবাব এবং ফলাফল
১	আসহামা উপাধি ঃ নাজ্জাশী	আবিসিনিয়া	আমর বিন উমাইয়্যাহ (রাঃ)	অত্যন্ত খুশির সহিত ইসলাম কবুল করেন। পবিত্র পত্রটি (শ্রদ্ধার সহিত) চোখে স্থাপন করেন এবং সিংহাসন হইতে নামিয়া নীচে উপবেশন করেন।
২	হারকিল	রোম বা ইটালী	হযরত দাহয়া কালবী (রাঃ)	প্রজাদের অসন্তোষের আশঙ্কায় ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা স্থগিত করেন এবং জবাব দেন যে, আমি (ইসলামকে) সত্য জানি বটে কিন্তু আমি অপারগ।
৩	খসরু পারভেজ	ইরান আফগানিস্তান ইত্যাদি	হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুজাফা (রাঃ)	এই দুরাচার পবিত্র পত্রটি টুকরা টুকরা করিয়া ফেলে। (ঘটনা শুনিয়া) রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্তব্য করিলেনঃ আল্লাহ পাক তাহার সম্রাজ্যকেও এইভাবে টুকরা করিবেন। সুতরাং (পরবর্তীতে) এইরূপই হইয়াছে।
৪	জুরাইজ মীনা উপাধী মোক্কাওক্কাস	মিশর এবং আলেকজান্দ্রিয়া	হযরত হাতের ইবনে আবী বালতাআ (রাঃ)	অন্তরে ইসলামের সত্যতা পয়দা হয়। সুতরাং পবিত্র পত্রটি হস্তিদন্তের পাত্রে ভরিয়া মোহর করিয়া ধনাগারে রাখিয়া দেয়। কিন্তু সে জবাব দেয়– এই বিষয়ে আমি চিন্তা করিব রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু হাদিয়া প্রেরণ করে।

ক্রঃ নং	বাদশার নাম	কোথাকার বাদশাহ ছিলেন	চিঠি কে লইয়া যান	চিঠির জবাব এবং ফলাফল
				উহার মধ্যে হযরত মারিয়া কিবতিয়া এবং দুলদুল নামে একটি সাদা খচ্চর ছিল। বর্ণিত আছে যে, এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ও বিশ জোড়া পোশাকও দেওয়া হয়।
৫	জিফার এবং আব্দুল্লাহ	আম্মান	হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ)	মুসলমান হইয়া যায় এবং জাকাত জমা করিয়া হযরত আমর ইবনুল আসের হস্তগত করে।
৬	মুনজির বিন সাদী	বাহরাইন	হযরত আলা বিন খাজরামী (রাঃ)	স্বয়ং নিজে এবং প্রজাদের অধিকাংশ মুসলমান হইয়া যায়।
৭	হারেছ বিন আবী শিমর	বলকের বাদশাহ, দামেশকের হাকিম এবং সিরিয়ার গভর্ণর	সুজা' বিন ওহাব আসাদী (রাঃ)	ইজ্জতের সহিত দূতকে বিদায় করে কিন্তু ইসলামের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত থাকে।
৮	হুজা বিন আলী	য়ামামা	মুলাইত বিন আমর (রাঃ)	দূতের সম্মান করে। কিন্তু জবাব দেয়, যদি ইসলামী সম্রাজ্যের অর্ধেকের উপর আমার হুকুমত মানিয়া লওয়া হয় তবে আমি মুসলমান হইব। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং সে মুসলমান হয় নাই।
৯	হারেছ বিন	হিম্য়ার	হযরত মোহাজের	সে জবাব দেয়, আমি চিন্তা

ক্রম নং	বাদশার নাম	কোথাকার বাদশাহ ছিলেন	চিঠি কে লইয়া যান	চিঠির জবাব এবং ফলাফল
১০	আব্দে কেলাল	গোত্র	বিন উমাইয়্যা মাখজুমী।	করিয়া দেখিব।
১১		য়ামামা	হযরত আবু মূসা আশআরী এবং হযরত মোয়াজ বিন জাবাল (রাঃ)	বাদশাহ এবং তাহার প্রজাগণও ইসলাম কবুল করেন।
১২	জিল কুলা জিওমর	হিম্য়ার	হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালী।	মুসলমান হয়। কিন্তু হযরত জারীর (রাঃ) তথায় থাকিতেই রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত প্রাপ্ত হন।

প্রশ্ন ঃ এতদ্ব্যতীত অন্য কোন বাদশাহের নামেও চিঠি পাঠানো হইয়াছে কি?

উত্তর ঃ হাঁ, পাঠানো হইয়াছে। [১]

প্রশ্ন ঃ এখানে কি কারণে উহার উল্লেখ করা হইল না?

উত্তর ঃ উহার বিস্তারিত বিবরণ হয়ত ব্যাপকভাবে বর্ণিত নাই বা থাকিলেও তাহাদের নামের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। এই কারণেই উহার আলোচনা করা জরুরী মনে করা হয় নাই।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সকল চিঠির জন্য বিশেষ কোন মোহর তৈরী করিয়াছিলেন কি? যদি করিয়া থাকেন তবে উহার কারণ কি?

উত্তর ঃ মোহর তৈরী করিয়াছিলেন। উহার কারণ বলা হইয়াছে যে, বাদশাহগণ কোন চিঠি সীল-মোহরকৃত না হওয়া পর্যন্ত গ্রহণ করেন না।

প্রশ্ন ঃ ঐ মোহারটি কিরূপ ছিল?

উত্তর ঃ উহা এইরূপ ছিল

محمد
رسول
الله

অর্থাৎ তিন লাইনের উপরের লাইনে মোহাম্মদ অতঃপর রাসূল এবং সবশেষে আল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

টীকা

১। আনুমামানিক ১৯৩০ সালে খবরের কাগজে এই সংবাদ প্রচার হয় যে, চীনে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের একটি মসজিদ আছে। ঐ মসজিদটি চীনে আগমনকারী তাঁহার এক দূত নির্মাণ করিয়াছিলেন। সেই যুগে চীনের বাদশাহ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূতকে বহু ইজ্জত করেন। কিন্তু তিনি মুসলমান হন নাই।

প্রশ্ন ঃ ঐসকল দূতগণকে এক সঙ্গেই প্রেরণ করা হয়, না কিছুদিন পর পর?

উত্তর ঃ নাজ্জাশী, হারকিল, কিসরা, মোক্বাওক্বাছ, হারেছ বিন আবী শিমর গাচ্ছানী এবং হাওজা বিন আলীর নিকট একই তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। এতদ্ব্যতীত অপরাপরগণের নিকট বিভিন্ন তারিখে প্রেরণ করা হয়।

প্রশ্ন ঃ উহা কোন্ তারিখ ছিল?

উত্তর ঃ সপ্তম হিজরীর ১লা মোহররম।

প্রশ্ন ঃ উহার পূর্বে বা পরে যদি আরো কোন হাকিম বা নবাব মুসলমান হইয়া থাকে তবে উহার বিস্তারিত বিবরণ দাও।

উত্তর ঃ যেই সকল হাকিম বা প্রশাসক মুসলমান হইয়াছেন তাহাদের কয়েকজনের বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী পৃষ্ঠার নক্সা হইতে জানা যাইবে।

নকশা

ক্রঃ নং	নাম	শাসনাধীন এলাকা	কবে মুসলমান হন	মন্তব্য
১	জিবিল্লাহ	গাচ্ছান	৭ম হিজরী	আরবের এক বিশাল ও প্রসিদ্ধ হুকুমত ছিল।
২	হযরত ছুমামা ইবনে উছাল (রাঃ)।	নজদ	৬ষ্ঠ হিজরী	বন্দী করিয়া আনা হয়। তিন দিন মসজিদের খাম্বার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অতঃপর গোসল করিয়া ইসলামের কালেমা পাঠ করেন।
৩	হযরত ফারদাহ্ বিন আমর খাজায়ী (রাঃ)	সম্রাট কিসরার পক্ষ হইতে সিরিয়ার কিছু অঞ্চলের গভর্ণর ছিলেন।		
৪	হযরত উকাইদির (রাঃ)	দাওমাতুল জান্দাল	৯ম হিজরী	
৫	জিল কুলা' হিম্‌য়ারী (রাঃ)	য়ামান ও তায়েফের কিছু জিলা এবং হিময়ার গোত্র		নিজেকে খোদা বলিয়া দাবী করিত (আল্লাহর পানাহ)। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত ওমর ফারূকের যুগে নিজের মুকুট ও সিংহাসনে লাথি মারিয়া মদীনা চলিয়া আসেন এবং ফকীরানা জীবন যাপন করেন। মুসলমান হওয়ার দিন ১৮ হাজার গোলাম আজাদ করিয়া দেন।

৭ম হিজরী

গাযওয়ায়ে খায়বর, ফিদাক বিজয় এবং কাজা ওমরা

প্রশ্ন ঃ সপ্তম হিজরীর সর্ববৃহৎ যুদ্ধ কোন্‌টি?

উত্তর ঃ খায়বর ও ফিদাকের যুদ্ধ।

প্রশ্ন ঃ কোন্ মাসে এই যুদ্ধ হয়?

উত্তর ঃ সপ্তম হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ফৌজের সংখ্যা কত ছিল?

উত্তর ঃ আনুমানিক ১৬ শত।

প্রশ্ন ঃ এই বাহিনীর প্রধান কে ছিলেন এবং পতাকা কার হাতে ছিল?

উত্তর ঃ বাহিনীর প্রধান ছিলেন স্বয়ং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর যুদ্ধের দিন হযরত আলী (রাঃ)-কে পতাকা দেওয়া হয়।

প্রশ্ন ঃ মদীনার খলীফা কাহাকে নিযুক্ত করা হয়?

উত্তর ঃ হযরত ছিবা' বিন আরফাতাহ (রাঃ)-কে।

প্রশ্ন ঃ কি কারণে এই যুদ্ধ হয়?

উত্তর ঃ ইহা পূর্বেই জানা হইয়াছে যে, বনু নাজীরের ইহুদীরা মদীনা হইতে উৎখাত হওয়ার পর খায়বর চলিয়া যায়। উহার পর হইতেই খায়বর ইহুদীদের 'আড্ডা' ও কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। এই স্থান হইতেই লোকেরা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া কাফেরদিগকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিত। যেমন গাযওয়ায়ে আহজাবের সময় (এই বিষয়ে) যাহা করা হইয়াছে তাহা ইতিপূর্বেই জানা হইয়াছে। সুতরাং ইসলামের হেফাজত এবং তাহাদের অনিষ্ট হইতে নিরাপত্তার জন্য তাহাদের আখড়া ধ্বংস করিয়া দেওয়া জরুরী হইয়া পড়ে।

প্রশ্ন ঃ এই যুদ্ধে মুসলমানদের জয় হয়, না পরাজয়?

উত্তর ঃ সকল দুর্গ মুসলমানদের অধিকারে আসে এবং বিজয় অর্জিত হয়।

প্রশ্ন ঃ খায়বরের ইহুদীদিগকে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়, না তাহাদের সঙ্গে কোন চুক্তি হয়।

উত্তর ঃ তাহাদের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

প্রশ্ন ঃ ঐ চুক্তিটি কি ছিল?

উত্তর ঃ মুসলমানগণ যতদিন ইচ্ছা করিবেন তাহাদিগকে খায়বরে থাকিতে দিবেন। আর যখন বহিষ্কার করিতে চাহিবেন তখন ইহুদীদের পক্ষে খায়বর ত্যাগ করা জরুরী হইবে। তা ছাড়া (উৎপন্ন) শস্যের একটি অংশ মুসলমানদিগকে দেওয়া হইবে।

প্রশ্ন ঃ হযরত আলীকে খায়বর বিজয়ী বলা হয় কেন?

উত্তর ঃ এই কারণে যে, তিনি এই যুদ্ধের কমাণ্ডার ছিলেন এবং পতাকাও তাহার হাতেই ছিল। তাছাড়া আল্লাহ পাক তাহার দ্বারা একটি বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করান। খায়বরের যেই ফটকটি সত্তর জনেও উঠাইতে পারে নাই; উহা তিনি একাই উঠাইয়া দূরে নিক্ষেপ করেন।

প্রশ্ন ঃ ফিদাকের উপর কবে আক্রমণ হয়?

উত্তর ঃ এই ছফরেই খায়বর বিজয়ের পর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিদাকের দিকে মনোযোগ দেন।

প্রশ্ন ঃ যুদ্ধ হইয়াছে কি-না এবং যুদ্ধের ফলাফল কি হয়?

উত্তর ঃ ফিদাকের ইহুদীরা সন্ধি করিয়া লয়। সুতরাং যুদ্ধ হয় নাই।

প্রশ্ন ঃ এই বৎসর কয়টি বাহিনী প্রেরণ করা হয় এবং কয়টি গাযওয়া হয়?

উত্তর ঃ উহা ব্যতীত অন্য কোন গাযওয়া হয় নাই। তবে বিভিন্ন সুযোগে পাঁচটি বাহিনী প্রেরণ করা হয়।

প্রশ্ন ঃ এই বৎসরের অপর বড় বড় ঘটনা কি?

উত্তর ঃ (১) গত বৎসর হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় যেই সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, আগামী বৎসর ওমরা করিব, চুক্তির সেই শর্তের পরিপূর্ণ পাবন্দির সহিত এই বৎসর সেই ওমরা আদায় করা হয়।

(২) হযরত মাইমুনা (রাঃ) এই ছফরেই রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেকাহে প্রবেশ করেন।

সারাংশ

যেহেতু বনু নাজীরের ইহুদীরা মদীনা হইতে বহিষ্কার হইয়া খায়বরকে তাহাদের ষড়যন্ত্রের আখড়ায় পরিণত করিয়াছিল, এই কারণেই উহার উপর আক্রমণ করা হয়। হযরত আলীর হাতে পতাকা ছিল এবং আল্লাহ পাক বিজয়-মুকুট তাহার মাথায়ই পরাইয়া দেন। খায়বরের পর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিদাকের দিকে মনোযোগ দেন। তবে তথাকার লোকেরা সন্ধি করিয়া লয়। চুক্তি অনুযায়ী গত বৎসরের ওমরার কাজা আদায় করা হয় এবং হযরত মাইমুনা (রাঃ)-এর সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন হয়।

শব্দার্থ ঃ

(মূল উর্দূ কিতাবের পাঠকদের জন্য)

معظمه – সম্মানিত, উন্নত, মর্যাদাসম্পন্ন, কোন পুণ্যভূমির পবিত্রতা বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত। যেমন মক্কা মোয়াজ্জমা। বুজুর্গ মহিলা। میان – মধ্য, সূত্র, মধ্যভাগ, তরবারীর খাপ বা কোষ, কোমর, কটিদেশ, কেন্দ্র। مدت – সময়ের দৈর্ঘ, অবকাশ, সুযোগ, মেয়াদকাল। عالی شان সুমহান, উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন, উত্তম, শানদার, বৃহৎ। بے کسی – নিঃসম্বল, অসহায়, সহায়-সম্বলহীন। خوشنودی – সন্তুষ্টি, সন্তোষ, আনন্দ। تمغه – সনদ, নিশান, মোহর, সোনা-রূপা ইত্যাদির উপর মোহর, শাহী মোহর, প্রশংসা বা বিজয়ের নিদর্শন স্বরূপ (প্রধানতঃ ধাতুনির্মিত)

পদকবিশেষ (medal)। نامہ – পত্র, চিঠি, লিপি, পুস্তিকা, রেজিস্টার, রচনা, ইতিহাস। تخت – আসন, সিংহাসন, রাজাসন, মসনদ, রাজা-বাদশাহদের বসিবার স্থান, রাজত্ব, বড় চকি। چاك كرنا – টুকরা করিয়া ফেলা, ছিঁড়িয়া ফেলা। سفیر – দূত, সংবাদ বাহক, কোন দেশের পক্ষ হইতে নিয়োজিত সরকারী প্রতিনিধি, রাষ্ট্রদূত। اجڑنا – উৎখাত হওয়া, ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া, বিরাণ হওয়া, জনশূন্য হওয়া। اڈا – একত্রিত হওয়ার স্থান, আড্ডা, কেন্দ্র, উড়োজাহাজ বা গাড়ী দাঁড়াইবার স্থান। رنھان – আড্ডা, আখড়া।

অষ্টম হিজরী

এক নূতন শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ ।। ইসলামের সূর্য মধ্যাহ্নে, অর্থাৎ মূতার যুদ্ধ এবং মক্কা বিজয়

প্রশ্ন ঃ অষ্টম হিজরীর বড় বড় ঘটনা কি?

উত্তর ঃ মূতার দিকে সৈন্যদের গমন ও যুদ্ধ এবং মক্কা বিজয়।

প্রশ্ন ঃ মূতা কোথায়?

উত্তর ঃ সিরিয়া অঞ্চলের দামেশ্‌ক ও বলকার আশেপাশে।

প্রশ্ন ঃ এই যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়?

উত্তর ঃ অষ্টম হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে।

প্রশ্ন ঃ কাহাদের সঙ্গে এই যুদ্ধ হয়?

উত্তর ঃ বসরার গভর্ণরের পক্ষ হইতে প্রেরীত রোমানদের সঙ্গে।

প্রশ্ন ঃ ইতিপূর্বেও রোমানদের সঙ্গে কোন যুদ্ধ হইয়াছিল কি-না এবং রোমানদের ধর্ম কি ছিল?

উত্তর ঃ রোমানরা খৃষ্টান ছিল এবং ইহাই তাহাদের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধ।

প্রশ্ন ঃ কি কারণে এই যুদ্ধ হয়?

উত্তর ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত হযরত হারেছ বিন ওমায়ের (রাঃ) যখন ইসলামের পয়গাম লইয়া বসরার প্রশাসক শারজিলের নিকট গমন করিলেন, তখন সে তাহাকে শহীদ করিয়া দিল, (এই অপরাধের) শাস্তি হিসাবে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাহিনী প্রেরণ করেন।

প্রশ্ন ঃ মক্কার কাফেররা বিবিধ উপায়ে শাস্তি দিয়া বহু মুসলমানকে শহীদ করিয়াছিল। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের কাহাকেও শাস্তি দেন নাই। কিন্তু এই ক্ষেত্রে শারজিলকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যথারীতি যুদ্ধের আয়োজন করার কারণ কি?

উত্তর ঃ মক্কার কাফেরদের অত্যাচারে যেই সকল মুসলমান শহীদ হইয়াছেন, তাহারা ছিলেন মোবাল্লেগ বা দ্বীন প্রচারক। দ্বীন প্রচার বা তাবলীগের পথে হুকুম হইলঃ আমরা বিরুদ্ধবাদীদের অত্যাচার সহ্য করিব এবং নিজেদের মূল উদ্দেশ্যে অটল থাকিব। এই পথে যদি আমাদের জীবনও চলিয়া যায়, তবে আমরা ছবর করিব এবং প্রতিশোধ গ্রহণের পিছনে পড়িব না।

ইহাই সেই ছবর যার মর্যাদা অনেক ঊর্ধ্বে। এমনকি এই বিষয়ে আল্লাহ পাক নিশ্চয়তা দিয়াছেন যে, আল্লাহ ছবরকারীদের সঙ্গে থাকেন। কিন্তু হযরত হারেছ (রাঃ) শুধু মোবাল্লেগই ছিলেন না, বরং ঐ সময় তিনি রাষ্ট্রদূত বা বার্তাবাহকও ছিলেন। রাষ্ট্রদূত সম্পর্কে বর্তমান বিশ্বেও এই নিয়ম (স্বীকৃত) এবং তৎকালেও এই নিয়মই ছিল যে, তাহাদের হেফাজত ও নিরাপত্তা (নিশ্চিত) করা হইত; যেন পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরস্পর মতবিনিময় ও আলাপ-আলোচনার পথ উন্মুক্ত থাকে। কিন্তু শারজিল রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূতকে শহীদ করিয়া এই সর্বসম্মত বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শারজিলকে শাস্তি দিয়া এমন বিধানের সহযোগিতা করিলেন

যেই বিধানের উপর বিশ্ব-শান্তি ও নিরাপত্তা (অনেকটা) নির্ভরশীল ছিল।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজে (ঐ যুদ্ধে) অংশ গ্রহণ করেন নাই, তখন কি কারণে উহাকে গাযওয়া বলা হয়?

উত্তর ঃ এই কারণে যে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাহিনীকে অত্যন্ত মূল্যবান ও বিশেষ বিশেষ ওসীয়ত করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন ঃ ঐসকল ওসীয়ত কি ছিল?

উত্তর ঃ (১) তোমরা গির্জা এবং উপাসনালয়সমূহে কিছু দুনিয়া ত্যাগকারী মানুষের সাক্ষাত পাইবে, তাহাদিগকে বাধা দিবে না।

(২) কস্মিনকালেও নারী, শিশু ও বৃদ্ধদিগকে হত্যা করিবে না।

(৩) কোন বৃক্ষ কর্তন করিবে না।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা কত ছিল এবং বসরার গভর্ণর কি পরিমাণ ফৌজ প্রস্তুত করিয়াছিল?

উত্তর ঃ ইসলামী সৈন্যসংখ্যা ছিল তিন হাজার। আর শারজিল আনুমানিক দেড় লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিল।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী সেনাপ্রধান কে ছিলেন?

উত্তর ঃ প্রথমে হযরত জায়েদ বিন হারেছাকে উহার প্রধান নিযুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ওসীয়তও করিয়াছিলেন যে, হযরত জায়েদ বিন হারেছা যদি শহীদ হইয়া যায় তবে হযরত জাফর বিন আবু তালেব পতাকা বহন করিবে। তাহার পরেও যদি প্রয়োজন হয় তবে হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) পতাকা বহন করিবেন।

প্রশ্ন ঃ এই যুদ্ধের ফলাফল কি হয়?

উত্তর ঃ আল্লাহ পাক দেড় লক্ষ পঙ্গপাল-হৃদয় (অর্থাৎ ভীতু) লশকরের

উপর ঐ মুষ্টিমেয় জামায়াতের এমন প্রভাব বিস্তার করিয়া দিলেন যে, (অবশেষে) তাহারা পিছু না হটিয়া তিষ্টাইতে পারিল না। আর প্রকৃতপক্ষে দেড় লাখের বিশাল বাহিনীর মধ্য হইতে তিন হাজারের মুষ্টিমেয় জামা'য়াতটি বাঁচিয়া আসাই বিরাট বাহাদুরী ও বড় ধরনের বিজয় বটে। তবে (ইসলামী পক্ষের) তিন জন প্রসিদ্ধ সেনাপ্রধান ইসলামের পতাকার হেফাজতে অবশ্যই শাহাদাত বরণ করিয়াছেন।

প্রশ্ন ঃ এই তিন জনের শাহাদাতের পর কে পতাকা সামলাইয়াছেন?

উত্তর ঃ আল্লাহর এক তলোয়ার, যার নাম ছিল খালেদ বিন ওলীদ। তিনি নিজে অগ্রসর হইয়া পতাকা সামলাইয়া ময়দান জয় করিয়া লইলেন (রাজিয়াল্লাহু আনহুম আজমায়ীন)।

শব্দার্থ ঃ
(মূল উর্দূ কিতাবের পাঠকদের জন্য)
قرب جوار - আশপাশ, প্রতিবেশ, নিকটের। پیغام - বার্তা, বিবাহের প্রস্তাব, বাণী। تعرض - বাধা, প্রতিবন্ধক, অন্তরায়, প্রতিবাদ, সামনে আসা, মুখোমুখি হওয়া। فراهم - সমাবেশ, একত্রিত, সঞ্চিত, চয়নিত। نام زد প্রসিদ্ধ, পরিচিত, নিয়োজিত, কোন কাজের জন্য নিযুক্ত, বাগদত্তা মেয়ে।

মক্কা বিজয়

আল্লাহর ঘরে আসমানী রাজত্বের পতাকা।।

বহিষ্কৃতদের সফল প্রত্যাবর্তন

প্রশ্ন ঃ মক্কা কবে জয় হয়?

উত্তর ঃ অষ্টম হিজরীর রমজান মাসে।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী লশকরের সংখ্যা কি পরিমাণ ছিল?

উত্তর ঃ দশ হাজার।

প্রশ্ন ঃ এই বাহিনীর প্রধান কে ছিলেন?

উত্তর ঃ সরওয়ারে দো জাহাঁ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

প্রশ্ন ঃ মদীনার খলীফা কাহাকে নিযুক্ত করা হয়?

উত্তর ঃ হযরত আবু রুহ্‌ম কুলছুম বিন হুছাইন গাফ্‌ফারী (রাঃ) অথবা হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ)-কে।

প্রশ্ন ঃ মক্কার কাফেরদের আচরণ যদিও উহার উপযুক্ত ছিল যে, সুযোগ পাওয়া মাত্রই তাহাদের উপর আক্রমণ করা যাইত; কিন্তু দশ বৎসরের সন্ধি-চুক্তি হওয়ার পর তৃতীয় বৎসরেই কেন তাহাদের উপর আক্রমণ করা হয়?

উত্তর ঃ কোরাইশরা নিজেরাই ঐ চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছিল।

প্রশ্ন ঃ উহার ধরন কি ছিল?

উত্তর ঃ হয়ত স্মরণ আছে যে, হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় বনু বকর কোরাইশদের সঙ্গে ছিল এবং বনু খুজাআ ছিল মুসলমানদের সঙ্গে। আর এই দুই গোত্রও হোদায়বিয়ার সন্ধির অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু পরে দুই বৎসর অতিক্রম না করিতেই বনু বকর অতর্কিতে বনু খুজাআ'র উপর আক্রমণ করিয়া বসে। তাহাদের নারী ও শিশুদেরকেও হত্যা করা হয়। কোরাইশরা অস্ত্র ও সম্পদ দ্বারা বনু বকরকে সাহায্য করে এবং হত্যাকাণ্ডেও অংশ লয়। তাহাদের কতিপয় সরদার নেকাব পরিধান করিয়া আক্রমণ করে।

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তাহারা "আল্লাহর দোহাই" দিয়া নিরাপত্তা চাহিয়াছিল, কিন্তু বনু বকর এবং তাহাদের সাহায্যকারী সরদাররা তখন জবাবে বলিয়াছিলঃ আজ আল্লাহ বলিতে কোন কিছু নাই (আল্লাহ পানাহ)। বনু খুজাআ' বাইতুল্লাহ শরীফে আশ্রয় লইলে সেখানে গিয়াও তাহাদিগকে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করা হয়।

বনু খুজাআ'র নির্যাতিত ব্যক্তিদের মধ্যে চল্লিশ জন পালাইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। তাহারা ন্যায় বিচারের জন্য রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোহাই দিয়া দরবারে রেসালাতে আসিয়া হজির হইল। আমর বিন সালেম খুজায়ী এক মর্মস্পর্শি কবিতার মাধ্যমে সাহায্যের আবেদন করিলেন।

রহমতে আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলব মোবারক অস্থির হইয়া তাঁহার আত্মসম্মানে উত্তেজনা পয়দা হইল এবং তিনি (যুদ্ধের) প্রস্তুতির হুকুম ঘোষণা করিলেন।

প্রশ্ন ঃ এই যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মদীনা মোনাওয়ারা হইতে কবে যাত্রা করা হয়?

উত্তর ঃ রমজান মাসের দশ তারিখ, সোমবার আছরের নামাজের পর।

প্রশ্ন ঃ এই ছফরের বিস্তারিত বিবরণ বল।

উত্তর ঃ এই বাহিনী তথা বিজয়ের ঢেউ যখন মদীনা তাইয়্যেবা হইতে রওনা হইয়া 'উম্মুজ্জাহ্রান' নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছাইল, তো (সেই পরিস্থিতির বিবরণ দিয়া) হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমার এমন ধারণা হইল যে, আজ যদি মক্কার অধিবাসীরা নিরাপত্তা লাভ করিতে না পারে তবে তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে একটি খচ্চরের উপর ছওয়ার হইয়া মক্কার দিকে যাত্রা করিলাম (এই আশায়) যে, যদি কাহারো সঙ্গে সাক্ষাত হয় তবে বলিয়া পাঠাইব যে, আজ "আশ্রয় প্রার্থনা ব্যতীত কোন উপায় নাই"। আমি নিকটবর্তী পাহাড়ে গমনের পরই দুইজন মানুষ দৃষ্টিগোচর হইল। সামনে আগাইয়া শুনিতে পাইলাম–

প্রথম ব্যক্তি ঃ এই লশকর কার, যাহাদের আগুণ ও প্রদীপে (গোটা) প্রান্তর ঝলমল করিতেছে?

দ্বিতীয় ব্যক্তি ঃ সম্ভবতঃ বনু খুজাআর (লশকর) হইবে।

প্রথম ব্যক্তি ঃ তওবা! তাহাদের নিকট এত সৈন্য কোথায়?

ইত্যবসরে আমি আরো সামনে আগাইয়া গিয়াছিলাম। গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়া চিনিতে পারিলাম যে, (তাহাদের) একজন আবু সুফিয়ান এবং অপরজন হাকিম বিন হিজাম। (আমাকে দেখিয়া) উভয়ে বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল, আপনি এখানে? আমি ঘটনার বিবরণ দিলে তাহারা উভয়ে ভয় পাইয়া বলিল, এখন আত্মরক্ষার উপায়? আমি বলিলাম, একমাত্র উপায় হইল– আমার সঙ্গে চল এবং আশ্রয় প্রার্থনা কর।

আবু সুফিয়ান সঙ্গে সঙ্গে আমার খচ্চরের উপর বসিয়া পড়িল। আমরা উভয়ে দরবারে রেসালাতে হাজির হওয়ার পর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেনঃ বল, আবু সুফিয়ান! এখনো কি আল্লাহকে এক বলিয়া স্বীকার করিবে না?

আবু সুফিয়ান ঃ নিশ্চয়ই তিনি এক। যদি অন্য কোন খোদা থাকিত তবে আজ তিনি আমার সাহায্য করিতেন। অতঃপর আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ফৌজ কোন্ পথে মক্কায় প্রবেশ করে?

উত্তর ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিপাহীদিগকে হুকুম করিলেন যেন বিভিন্ন পথে মক্কায় প্রবেশ করে। আর একটি বাহিনীর প্রধান হযরত খালেদ বিন ওলীদকে মক্কার উপরের দিকের পথে ভিতরে প্রবেশ করিতে নির্দেশ দিলেন। আর তিনি স্বয়ং নীচের দিকেয় পথে মক্কায় প্রবেশ করিলেন।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন?

উত্তর ঃ আজ মক্কা বিজয়ী উভয় জাহানের নেতার শান হইলঃ তিনি একটি উটনীর উপর আরোহণ করিয়া আছেন, পবিত্র মস্তকে কৃষ্ণ বর্ণের

পাগড়ী। জবান মোবারকে ছুরায়ে ফাতাহ্ এবং সমগ্র দেহ জুড়িয়া বিনয় ও তাওয়াজু। এই পরিস্থিতিতে দুনিয়ার বিজয়ীগণ মাথা উঁচু করিয়া রাখেন, কিন্তু উভয় জাহানের বাদশাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শির মোবারক নত হইয়া আছে। পবিত্র অন্তর আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন। আজেযী-এনকেসারী এবং বিনয়-বিনম্র ও শোকর-কৃতজ্ঞতার যৌথ ক্রিয়ায় যেন মোরাকাবার হালাত পয়দা করিয়া দিয়াছে। এমনকি তাঁহার পাগড়ী মোবারকের প্রান্ত আসিয়া উটের আসন স্পর্শ করিল।

প্রশ্ন ঃ উটের উপর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে অপর ব্যক্তিটি কে ছিলেন?

উত্তর ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজাদকৃত গোলাম হযরত জায়েদ ইবনে হারেছাহ (মূতার যুদ্ধে শাহাদাতপ্রাপ্ত)-এর সুযোগ্য সন্তান হযরত উসামা (রাঃ)।

প্রশ্ন ঃ বিজয়ী বেশে প্রবেশের সময় গণহত্যা- ইত্যাদির হুকুম হইয়া থাকে। এই সময় পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কি হুকুম ঘোষণা করিয়াছিলেন?

উত্তর ঃ দুনিয়ার বিজয়ী (রাজা-বাদশাহ ও সেনাপতি)-দের তুলনায় রাহমাতুল লিল আলামীনের শান ছিল ব্যাতিক্রমধর্মী। সেই নগরী এবং সেই অধিবাসী, যাহারা হিজরতের সময় ঐ ব্যক্তির জন্য বড় বড় পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিল, যেই ব্যক্তি রাসূলকে জীবিত কিংবা তাহার (মৃত) মাথা আনিয়া দিতে পারিবে।

রহমতে আলম রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সেই নগরীতে এবং সেইসকল লোকদের উপর বিজয়ী হইয়া প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন উভয় জাহানের দয়ালুর পক্ষ হইতে সরকারী ঘোষণা দেওয়া হইল-

(১) যেই ব্যক্তি অস্ত্র ত্যাগ করিবে, তাহাকে হত্যা করা হইবে না।

(২) যেই ব্যক্তি কাবা ঘরে প্রবেশ করিবে তাহাকে হত্যা করা হইবে না।

(৩) যেই ব্যক্তি গৃহে বসিয়া থাকিবে তাহাকে হত্যা করা হইবে না।

(৪) কোন আহত ব্যক্তিকে হত্যা করা হইবে না।

(৫) কোন বন্দীকে হত্যা করা হইবে না।

(৬) কোন পলায়নকারীকে ধাওয়া করা হইবে না।

আর সেই আবু সুফিয়ান, যে গতকাল পর্যন্তও শুধু যে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু ছিল তাহাই নহে; বরং শত্রুদের গুরু ছিল এবং ওহোদের মত কেয়ামতসম সন্ত্রাসী ঘটনার নেতা ছিল। (অথচ) আজ তাহার উপর কর্তৃত্ব পাওয়ার পর ঘোষণা হইতেছে–

(৭) যেই ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় লইবে তাহাকে হত্যা করা হইবে না। অনুরূপভাবে–

(৮) যেই ব্যক্তি হাকিম বিন হিজামের ঘরে প্রবেশ করিবে তাহাকে হত্যা করা হইবে না।

প্রশ্ন ঃ মক্কায় প্রবেশের সময় যুদ্ধ হইয়াছে কি-না এবং কয় জনের প্রাণহানি ঘটে?

উত্তর ঃ প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত ঘোষণার পর যুদ্ধ করার কোন সুযোগই ছিল না। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও কতিপয় অবাধ্য ব্যক্তি হযরত খালেদ বিন ওলীদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ফলে বাধ্য হইয়া উহার জবাব দেওয়ার কারণে ২৭ বা ২৮ জন কাফের নিহত হয় এবং ২ জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। ইহা ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধ হয় নাই।

প্রশ্ন ঃ মক্কায় প্রবেশের সময় কি কারণে ছয় জন নারী এবং এগার জন পুরুষকে নিরাপত্তা হইতে বঞ্চিত রাখা হয়?

উত্তর ঃ তাহাদের মধ্যে কিছু তো ছিল মোরতাদ ও হত্যাকারী এবং কিছু ছিল এইরূপ যাহাদের শঠতা বহু ক্ষতিসাধন করিয়াছিল এবং ভবিষ্যতের জন্যও আশঙ্কা ছিল।

প্রশ্ন ঃ এই অপরাধীদেরকে কোন্ সময় হত্যা করা হয়?

উত্তর ঃ কখনো হত্যা করা হয় নাই। কারণ ঐ সময় তাহারা পালাইয়া গিয়াছিল কিংবা আত্মগোপন করিয়াছিল। পরে একে একে সকলে মদীনায় আসিয়া রহমতে আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়ার দৃষ্টি দ্বারা নিজেদের অপরাধ ক্ষমা করাইয়া লয়। কেবল দুই জন সম্পর্কে হত্যার কথা বর্ণিত আছে যে, তাহারা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রহমতের দরবারে যাওয়ার সুযোগ পায় নাই।

প্রশ্ন ঃ ঐ সময় খানায়ে খোদা অর্থাৎ কাবা শরীফের কি অবস্থা ছিল?

উত্তর ঃ উহার অভ্যন্তরে ৩৬০টি মূর্তি রক্ষিত ছিল। হুবুল নামে একটি বড় মূর্তি কাবার ছাদের উপর দাঁড় করানো ছিল।

প্রশ্ন ঃ এই সময় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করিলেন?

উত্তর ঃ তিনি একটি ধনুক বা ছড়ির অগ্রভাগ দ্বারা মূর্তিগুলিকে ইশারা করিতেছিলেন এবং ঐগুলি উপুড় হইয়া পতিত হইতেছিল। এই সময় পবিত্র জবানে এই আয়াতগুলি (উচ্চারিত হইতে)-ছিলঃ

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

অর্থ ঃ সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।

جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ

অর্থ ঃ সত্য আগমন করিয়াছে এবং অসত্য না পারে নূতন কিছু সৃজন করিতে এবং না পারে পুনঃ প্রত্যাবর্তিত হইতে।

প্রশ্ন ঃ কাবা ঘর ব্যতীত উহার আশেপাশে আরো যেই বড় বড় মূর্তি ছিল, সেইগুলি কি করা হয়?

উত্তর ঃ কয়েকজন মুজাহিদের এক বাহিনী পাঠাইলে তাহারা উহা ভাঙ্গিয়া ফেলে।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর ঘরকে মূর্তির অপবিত্রতা হইতে পবিত্র করিয়া আল্লাহর রাসূল উহাতে কবে তাওয়াফ করেন?

উত্তর ঃ অষ্টম হিজরীর ২০শে রমজানুল মোবারক।

প্রশ্ন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন মক্কার অধিবাসীদের কি অবস্থা ছিল এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করেন?

উত্তর ঃ কাবা চত্বরে মক্কার নেতৃশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ এবং সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিল। তাহাদের সকলের মধ্যেই ভয় এবং আতঙ্ক বিরাজ করিতেছিল। প্রত্যেকেরই অতীতের দিন (গুলির কথা) স্মরণ হইতেছিল। কারণ তাহাদের কেহ হয়ত রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ইট নিক্ষেপ করিয়াছিল, কেহ হয়ত বার বার তাঁহার উপর ধুলাবালি নিক্ষেপ করিয়াছিল, কেহ বা নবী-দুহিতাকে বল্লম দ্বারা আঘাত করিয়াছিল– যাহার ক্রিয়া হইতে তিনি নিজেকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। কেহ ছিল হযরত হামজার হত্যাকারী, কেহ তাহার কলিজা চর্বনকারিণী। তাহাদের মধ্যেই কেহবা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিন্দায় কবিতা পাঠ এবং বক্তৃতা দানকারী, কেহ বা (ঐ কবিতা) গাহিয়া গাহিয়া (উত্তেজনার) আগুন বৃদ্ধিকারী।

মোটকথা, আজ সকলকেই তাহাদের "অপরাধ" হত্যার আশঙ্কায় কম্পমান করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মূর্তির বিষয় সম্পন্ন করিয়া কাবার বাহিরে তাশরীফ আনিয়া তাহাদিগকে কম্পমান দেখিলেন, তখন তিনি ঠোটে মৃদু হাস্য করিয়া

সদয়সুলভ এরশাদ করিলেন– যাহা হইবার ছিল তাহা হইয়াছে, আজ (আর কাহারো বিরুদ্ধে) কোন অভিযোগ নাই।[১] সকল কিছু এখানেই শেষ।

ইত্যবসরে তথায় এক ব্যক্তি আগমন করিল। লোকটি ভয়ে কাঁপিতেছিল। পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহাকে অভয় দিয়া) বলিলেনঃ ভয় পাইও না, আমি বাদশাহদের মত নই। আমি একজন কোরাইশী নারীর সন্তান, যিনি সাধারণ নারীদের মতই পানাহার করিতেন।

প্রশ্ন ঃ কাবা ঘরের চাবি কাহার নিকট ছিল এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন উহা কাহার নিকট দিলেন?

উত্তর ঃ উসমান বিন তালহা শায়বীর নিকট ছিল। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় নসীহত করার পর তাহাকেই উহা ফেরৎ দিলেন।[২]

টীকা

১। এ স্থলে তিনি একটি তাকরীর করেন। আল্লাহর হাম্‌দ ও ছানার পর রক্তপাত সংক্রান্ত কতিপয় বিধান বর্ণনার পর এরশাদ করিলেনঃ হে কোরাইশ সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদের মধ্য হইতে ঐ অহংকার দূর করিয়া দিয়াছেন যাহা পূর্বে ছিল। দেখ, আমরা সকলে হযরত আদম (আঃ)-এর সন্তান, আর আদম মাটি হইতে সৃষ্ট।

অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি তেলাওয়াত করেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ

অর্থ ঃ হে লোকসকল! আমি তোমাদিগকে এক পুরুষ ও এক স্ত্রীলোক হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমাদিগকে সম্প্রদায় ও গোত্রসমূহে বিভক্ত করিয়াছি, যেন তোমরা পারস্পরিক পরিচয় পাইতে পার। কিন্তু আল্লাহর নিকট কেবল তাহারাই অধিক সম্মান পাওয়ার যোগ্য যাহারা আল্লাহকে অধিক ভয় করে।

২। হযরত ওসমান বিন তালহা বর্ণনা করেন, কাবা ঘরের চাবি আমাদের

প্রশ্ন ঃ মক্কার সকল কাফেরই তখন মুসলমান হইয়া গিয়াছিল কি?

উত্তর ঃ না। অনেক কাফের এমন ছিল যাহারা তখন মুসলমান হয় নাই। তবে ক্রমে সকলেই মুসলমান হইয়াছিল।

প্রশ্ন ঃ যাহারা মুসলমান হইলেন, তাহাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের নাম বল।

উত্তর ঃ হযরত আবু সুফিয়ান বিন হরব। তাহার ছেলে হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)। হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ)-এর সম্মানিত পিতা হযরত আবু কুহাফা এবং আবু সুফিয়ান বিন হারেছ অর্থাৎ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড় চাচার ছেলে (রিজওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন)।

সারাংশ

হোদায়বিয়ার সন্ধির সময়সীমা যদিও দশ বৎসর নির্ধারণ করা হইয়াছিল কিন্তু দুই বৎসর পরই বনু খুজাআর উপর বনু বকর আক্রমণ করিয়া বসে এবং কোরাইশরা তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া সন্ধির সকল চুক্তি ভঙ্গ করিয়া ফেলে। অতঃপর বনু খুজাআ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

টীকা (পূর্বের পৃষ্ঠার পর)

নিকট থাকিত। আমরা শুধু সোমবার ও বৃহস্পতিবার উহা খুলিতাম। হিজরতের পূর্বের ঘটনাঃ একবার রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা ঘর খুলিতে আদেশ করিলে আমি কঠোরভাবে উহা খুলিতে অস্বীকার করিলাম। এই ঘটনায় তিনি দারুণভাবে মর্মাহত হইয়া বলিয়াছিলেনঃ সেই দিন খুব বেশী দূর নহে যে, কাবার চাবির মালিক আমি হইব এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই উহা দান করিব।

কিন্তু ইহা উন্নত চরিত্রের চরম পরাকাষ্ঠা ছিল যে, আজ তিনি কর্তৃত্ব পাওয়ার পরও সেই ওসমানকেই চাবি ফিরাইয়া দিলেন।

ওয়াসাল্লামের খেদমতে (এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে) অভিযোগ পেশ করিয়া সাহায্যের আবেদন করে। পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নৃশংসতার প্রতিশোধ গ্রহণের হুকুম দিলেন এবং দশ হাজার লশকরের এক বিশাল বাহিনী লইয়া মক্কার নিকটবর্তী 'মাররুজ্জাহ্রান' নামক স্থান পর্যন্ত আগাইয়া গেলেন।

হযরত আব্বাস (রাঃ) কোরাইশদের উপর অনুগ্রহ করিয়া আবু সুফিয়ানকে তওবা করিয়া (ইসলামে) ফিরিয়া আসিতে পরামর্শ দিলেন। আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করিলেন। ফলে তাহার এবং গোটা মক্কাবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার কোন সুযোগই রহিল না। পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চূড়ান্ত বিনয় প্রকাশ করিতে করিতে মক্কার নীচের দিকের পথে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সৈন্য বাহিনীকে হুকুম করিলেন যেন বিভিন্ন পথে ভিতরে প্রবেশ করা হয়। যেহেতু অল্প কয়েকজন ব্যতীত (সকলের জন্য) সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল, এই কারণে কোন যুদ্ধ ও প্রাণহানি ঘটে নাই। শুধু হযরত খালেদ বিন ওলীদের সঙ্গে পথে কিছু সংঘর্ষ হইলে উহাতে ২৭ বা ২৮ জন কাফের নিহত হয় এবং দুইজন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা ঘরে প্রবেশ করিয়া মূর্তিগুলি ফেলিয়া দেন। তিনি ২০ তারিখে খানায়ে কাবা তাওয়াফ করেন এবং পনের দিন মক্কায় অবস্থান করেন।

শব্দার্থ ঃ

(মূল উর্দূ কিতাবের পাঠকদের জন্য)

نقاب – পর্দা, মুখ ঢাকিবার পর্দা, ঘোমটা, অবগুণ্ঠন, বোরকা। پشت پناه – সাহায্য, সাহায্যকারী, আশ্রয়স্থল। دوهائی – দোহাই, বিচার প্রার্থনা, চিৎকার, চিৎকার করিয়া সাহায্য প্রার্থনা, শপথ, কসম, দিব্য, ছুতা, উছিলা। اپیل –

আবেদন, নিবেদন, পূনর্বিচারে জন্য আবেদন, ছোট হাকিমের রায়ের বিরুদ্ধে ঊর্ধতন হাকিমের নিকট বিচার প্রার্থনা, (appeal)। بے تاب – অস্থির, চঞ্চল, সহ্য করিতে না পারা, দুর্বল, শক্তিহীন। حيرت – বিস্ময়, আশ্চর্য, চমৎকৃতভাব বা অবস্থা। مراقبه – গভীর চিন্তা, পরকালের ধ্যান, মাথা ঝুকাইয়া আধ্যাত্ম বিষয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হওয়া, পার্থিব সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া। مرتد – ইসলাম ত্যাগ করা, ধর্মত্যাগী, অবিশ্বাসী, বিশ্বাসঘাতক। هراس – ভয়, ভীতি, বিমূঢ়তা, নৈরাশ্য, দুঃখ। هجو – নিন্দা, দুর্নাম, বদনাম, ব্যঙ্গকবিতা, কাহারো নিন্দায় কবিতা রচনা। تبسم – হাসি, মৃদুহাসি, মুচকিহাসি, স্বল্পহাসি। رفته رفته – ধীরে ধীরে, ক্রমে, আস্তে আস্তে। امداد – সাহায্য, সহযোগিতা, সহায়তা, আশ্রয়।

হোনাইনের যুদ্ধ

প্রশ্ন ঃ হোনাইন কি?

উত্তর ঃ মক্কা হইতে তিন মঞ্জিল দূরত্বে এবং তায়েফের নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম।

প্রশ্ন ঃ এই যুদ্ধ কবে অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর ঃ মক্কা বিজয়ের পর অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে।

প্রশ্ন ঃ এই যুদ্ধে কাহাদের সঙ্গে মোকাবেলা করা হয়?

উত্তর ঃ হাওয়াজিন এবং বনী ছাকিফের সঙ্গে।

প্রশ্ন ঃ এই যুদ্ধের কারণ কি ছিল?

উত্তর ঃ যেহেতু এই দুইটি গোত্র অনেক বড় এবং প্রসিদ্ধ ছিল, সুতরাং

মক্কা বিজয়ের পর তাহাদের আত্মসম্মানবোধ[১] জাগ্রত হইল এবং ইসলামী লশকরের উপর আক্রমণ করিয়া বসিল।

প্রশ্ন ঃ এই যুদ্ধের জন্য রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই ইসলামী লশকর প্রস্তুত করিলেন, উহার সংখ্যা ও ধরণ কি ছিল?

উত্তর ঃ সর্বমোট সংখ্যা ছিল ১২০৮০ জন। উহার মধ্যে দুই হাজার ছিল মক্কার নওমুসলিম, ৮০ জন কাফের এবং অবশিষ্টরা ছিল মদীনার ফৌজ।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর এই ফৌজ কত তারিখে মক্কা হইতে রওনা হয়?

উত্তর ঃ ৬ই শাওয়াল।

প্রশ্ন ঃ মক্কার খলীফা কাহাকে বানানো হয়?

উত্তর ঃ হযরত আত্তাব বিন উছাইদকে।

প্রশ্ন ঃ ঐ সময় তাহার বয়স কত ছিল?

উত্তর ঃ পূর্ণ আঠার বৎসর।

টীকা

১। পবিত্র মক্কায় আক্রমণ এবং উহাতে জয় হওয়া গোটা আরবের অধিবাসীদের জন্য লজ্জার বিষয় ছিল। (এই কারণে) নিশ্চই সমগ্র আরববাসী মোকাবেলার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হইল আরবের বহু গোত্রই ইসলামের সত্যতার পরিচয় জানিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু কিছুটা কোরাইশদের ভয় এবং কিছুটা নিজেদের পুরাতন মর্যাদাবোধের প্রশ্ন তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণ করিতে সাহস যোগাইতেছিল না। তবে এই কথাও স্মরণ ছিল যে, যদি এই আহবান সত্য হইয়া থাকে তবে নিশ্চই তাহারা কোরাইশদের উপর জয়ী হইবে। সুতরাং মক্কা বিজয়ের পর দলে দলে বিভিন্ন গোত্র ইসলামে প্রবেশ করিতে শুরু করিল এবং অল্প দিনের মধ্যেই (তাহাদের সংখ্যা) হাজার ছাড়াইয়া লক্ষ পর্যন্ত পৌঁছাইল।

প্রশ্ন ঃ যুদ্ধের তফসিল বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ (ইসলামী) বাহিনীর সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষের অধিকাংশ পাহাড়ে লুকাইয়া পড়িল। পরে ইসলামী লশকর যখন হোনাইনের ময়দানে পৌঁছাইল, তখন পাহাড় হইতে বাহির হইয়া তাহারা (মুসলিম বাহিনীর উপর) ঝাপাইয়া পড়িয়া তীর বর্ষণ করিতে লাগিল। এই অতর্কিত আক্রমণের ফলে প্রথম দিকে ইসলামী ফৌজে কিছুটা পশ্চাৎপদতা দেখা দেয়। কিন্তু রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তলোয়ার উত্তোলন করিয়া নামিয়া পড়িলেন এবং (যুদ্ধে উৎসাহ বর্দ্ধক) গজল পরিবেশন ও তলোয়ার ঘুরাইতে শুরু করিলেন। আর তাঁহার হুকুম অনুযায়ী হযরত আব্বাস (রাঃ) বাহিনীর সরদারদিগকে এক বীরত্বপূর্ণ আওয়াজ দ্বারা আহবান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকদের মনোযোগ ময়দানের দিকে এমনভাবে আকৃষ্ট হইল, যেমন সিংহী তাহার শাবকদের দিকে ছুটিয়া যায়। নিমিষের মধ্যে ময়দানের রং পাল্টাইয়া গেল।

প্রশ্ন ঃ ফলাফল কি হইল?

উত্তর ঃ মুসলমানদের বিজয়, সকল সম্পদ তাহাদের হস্তগত এবং ছয় সহস্রাধিক মানুষ বন্দী হইল।

প্রশ্ন ঃ কি পরিমাণ সম্পদ ছিল এবং উহা কি করা হইল?

উত্তর ঃ চব্বিশ হাজার উট, চল্লিশ সহস্রাধিক বকরী এবং চার হাজার উকিয়া রৌপ্য– যাহা প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার সমান হইবে। উহা মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু মক্কার মুসলমানদিগকে অধিক পরিমাণ দেওয়া হয়।

প্রশ্ন ঃ হোনাইনের যুদ্ধে কাফেররা কিভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছিল?

উত্তর ঃ নিজেদের সকল পশু, ধন-সম্পদ, এবং নারী ও শিশুদেরকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল, যেন পরাজয় হইলে বাল-বাচ্চা ও সম্পদের কারণে

কেহ পালাইয়া না যায় এবং লড়াই করিতে করিতে সেখানেই জীবনপাত করে।

প্রশ্ন ঃ এই যুদ্ধে মুসলমানদের পিছু হটার অন্য কোন কারণও ছিল কি?

উত্তর ঃ প্রকৃতপক্ষে উহার অন্য একটি কারণও ছিল এবং উহা এই যে, কতিপয় মুসলমানের মধ্যে নিজেদের সংখ্যাধিক্যের কারণে অহমিকাও পয়দা হইয়াছিল।

প্রশ্ন ঃ এই গায়েবী সতর্কতা দ্বারা কি জানা গেল?

উত্তর ঃ ইহা জানা গেল যে, মুসলমানদের নিজেদের সংখ্যাস্বল্পতা ও সংখ্যাধিক্যের প্রতি খেয়াল করা উচিত নহে, তাহাদের ভরসা কেবল আল্লাহর উপর হওয়া উচিত।

প্রশ্ন ঃ জাহেরী ছামানের প্রতি কি একেবারেই লক্ষ্য করা হইবে না?

উত্তর ঃ তদ্‌বির হিসাবে জাহেরী ছামানও জরুরী বটে। যেমন, আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেনঃ

وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَّ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ

অর্থঃ আর প্রস্তুত কর তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য হইতে এবং পালিত ঘোড়া হইতে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর।

কিন্তু কস্মিনকালেও উহার উপর অহংকার করিবে না। অর্থাৎ– সংখ্যাধিক্যের উপরও যেন অহংকার না হয় এবং স্বল্পতার কারণেও যেন (মনে) দুর্বলতা না আসে। সর্বাবস্থায় যেন আল্লাহর উপর ভরসা থাকে।

প্রশ্ন ঃ এই সুযোগে যদি কোন বিশেষ গায়েবী সাহায্য হইয়া থাকে তবে উহা বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মোকাবেলা করিতেছিলেন, তখন তিনি এক মুষ্টি মাটি লইয়া শত্রুদের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। আল্লাহ পাকের কুদরত এইগুলিকে প্রতিপক্ষের সকলের চোখে প্রবিষ্ট করিয়া দিল। ফলে তাহাদের চক্ষু বন্ধ হইয়া গেল এবং গোটা ফৌজের পা স্খলিত হইয়া গেল।

প্রশ্ন ঃ এই সময় এই গায়েবী সাহায্যের হেকমত কি?

উত্তর ঃ উহার পরিপূর্ণ এলেম তো আল্লাহ পাকেরই জানা আছে। কিন্তু দৃশ্যতঃ (এই ক্ষেত্রে) মুসলমানদের জন্য একটি শিক্ষা হইল– সংখ্যাধিক্য তাহাদের জন্য কার্যকর নহে। আল্লাহর সাহায্যই তাহাদের কার্য সম্পাদনকারী।

প্রশ্ন ঃ এই যুদ্ধে কত জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করে এবং কতজন কাফের নিহত হয়?

উত্তর ঃ সর্বমোট চার জন বা ছয় জন মুসলমান শহীদ হয় এবং একাত্তর জন কাফের নিহত হয়।

সারাংশ

মক্কা (মুসলমানদের হাতে) জয় হওয়া সকল আরববাসীদের জন্য বড় লজ্জার বিষয় ছিল। কিন্তু যেহেতু ইসলামের হক্কানিয়াত ও সত্যতা সম্পর্কে সকলেরই আন্দাজ হইয়া গিয়াছিল, এই কারণে এই বিজয় দ্বারা কোন গ্লানি পয়দা হয় নাই। তবে হাওয়াজিন এবং ছাকিফ গোত্র যাহারা নিজেদেরকে বড় বাহাদুর মনে করিত, (ঐ গোত্রদ্বয়) যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিল এবং বিবি-বাচ্চা ও সকল পশুসহ সর্বশক্তি লইয়া ইসলামী লশকরের উপর আক্রমণ করার জন্য যাত্রা করিল।

এই সংবাদ পাইয়া ৬ই শাওয়াল রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মক্কা হইতে রওনা হইলেন। হযরত আত্তাব বিন উছাইদকে মক্কার খলীফা নিযুক্ত করা হয়। শত্রুপক্ষ ঐ দিকে পাহাড়ের উপর লুকাইয়া রহিল এবং ইসলামী বাহিনী মধ্যখানে আসার পর অতর্কিতে তাহাদের উপর ঝাপাইয়া পড়িল। ফলে প্রথম দিকে মুসলমানদের পা কিছুটা টলটলায়মান হইয়া গেল। কিন্তু রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং বড় বড় ছাহাবীগণ জমিয়া রহিলেন। তিনি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হইয়া খচ্চর হইতে নামিয়া আসিলেন এবং তলোয়ার ঘুরাইতে শুরু করিলেন।

তাঁহার আদেশক্রমে হযরত আব্বাস (রাঃ) আওয়াজ দিলে সকল মুসলমান (ছুটিয়া আসিয়া) একত্রিত হইলেন। অতঃপর অল্প সময়ের মধ্যেই ময়দানের রং পাল্টাইয়া গেল এবং মুসলমানদের বিজয় অর্জিত হইল। চার জন বা ছয় জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন, একাত্তর জন কাফের নিহত হয় এবং বিপুল পরিমাণ সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়।

তায়েফ অবরোধ

ইসলামে প্রথম বারের মত

ক্ষেপনাস্ত্র ব্যবহার

প্রশ্ন ঃ উহার পর (উপরোক্ত ঘটনার পর) রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কারণে তায়েফ তাশরীফ লইয়া গেলেন এবং সেখানে গিয়া কি করিলেন?

উত্তর ঃ তায়েফ যেহেতু হাওয়াজিন ও বনী ছাকীফ গোত্রের আখড়া ও আশ্রয়স্থল ছিল এবং তাহারা হোনাইন হইতে পলায়ন করিয়া তায়েফে দুর্গবদ্ধ হইয়া ছিল, এই কারণেই রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে তাশরীফ লইয়া গেলেন এবং আনুমানিক আঠার দিন উহা অবরোধ করিয়া রাখিলেন। তায়েফবাসীরা মুসলমানদের উপর অসংখ্য

তীর নিক্ষেপ করে, ফলে বহু মুসলমান আহত হয় এবং বার জন শহীদও হয়। তো উহার জবাবেই ইসলামী ফৌজ ক্ষেপনাস্ত্র ব্যবহার করে যাহা সেই যুগের যেন তোপ ছিল। উহা হইতে পাথর নিক্ষেপ করা হইত। ইসলামে ইহাই ছিল ক্ষেপনাস্ত্রের প্রথম ব্যবহার।

প্রশ্ন ঃ ক্ষেপনাস্ত্র ব্যবহারের সিদ্ধান্ত কে দিয়াছিলেন?

উত্তর ঃ হযরত সালমান ফারসী।

প্রশ্ন ঃ ঐ অবরোধের ফলাফল কি হয়?

উত্তর ঃ হাওয়াজিন ও বনু ছাকিফ গোত্র নিজেদের অহংকারের পরিপূর্ণ বদলা পাইয়াছে বটে, কিন্তু নিয়মিত বিজয় অর্জিত হয় নাই।

প্রশ্ন ঃ তায়েফবাসীগণ কবে এবং কিভাবে মুসলমান হয়?

উত্তর ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় ফেরত চলিয়া আসেন তখন তায়েফবাসীদের পক্ষে একটি প্রতিনিধি দল তাঁহার খেদমতে হাজির হয় এবং নিজেরাই আবেদন করিয়া ইসলাম গ্রহণে ভাগ্যবান হয়।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ প্রতিনিধি দলকে কোথায় অবস্থান করান?

উত্তর ঃ মসজিদে।

প্রশ্ন ঃ মসজিদে কেন অবস্থান করান?

উত্তর ঃ যেন কোরআন শরীফ শুনিতে পারে এবং মুসলমানদের অবস্থা দেখিতে পারে যে, তাহারা কি অবস্থা হইতে কি অবস্থায় পরিবর্তিত হইয়াছে।

প্রশ্ন ঃ হোনাইনের বন্দীদেরকে কি করা হয়?

উত্তর ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তায়েফ হইতে

ফিরিয়া আসিতেছিলেন তখন "জিইররানা" নামক স্থানে তাহাদের একটি প্রতিনিধি দল তাঁহার খেদমতে হাজির হইয়া বন্দীদের মুক্তির আবেদন করে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু বন্দীদেরকেও মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন, এই কারণে তিনি ঐ আবেদন মুসলমানদের নিকট উত্থাপন করেন। ঐ আবেদন সঙ্গে সঙ্গেই গ্রহণ করা হয় এবং সকল বন্দীদেরকে ফেরত দেওয়া হয়।

প্রশ্ন ঃ এই ছফরে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ওমরা করিয়াছেন কি? (যদি করিয়া থাকেন তবে) উহা কোথা হইতে এবং কবে করেন?

উত্তর ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিইররানা নামক স্থানে অবস্থানকালে এহরাম বাঁধেন এবং রাতে মক্কা শরীফ গমন করিয়া ওমরা আদায় করতঃ সকাল হওয়ার পূর্বেই ফিরিয়া আসেন।

প্রশ্ন ঃ এই ছফরে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবে মদীনায় পৌছান?

উত্তর ঃ অষ্টম হিজরীর ৬ই জিক্বাআদাহ।

প্রশ্ন ঃ অষ্টম হিজরীতে কয়টি গাযওয়া ও সারিয়া অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর ঃ উপরে বর্ণিত চারটি যুদ্ধ ব্যতীত দশটি বাহিনী রওনা করানো হয়। উহা ব্যতীত অন্য কোন যাওয়া হয় নাই।

সারাংশ

হাওয়াজিন ও ছাকিফ গোত্রের লোকেরা হোনাইন হইতে পলায়ন করিয়া তায়েফের দুর্গসমূহে আসিয়া আত্মগোপন করে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনুমানিক আঠার দিন উহা অবরোধ করিয়া রাখেন। এই সময় তাহারা মুসলমানদের উপর অসংখ্য তীর বর্ষণ করিলে বারজন মুসলমান

শহীদ এবং বহু আহত হয়। উহার জবাবে ক্ষেপনাস্ত্র ব্যবহার করা হয় এবং আঠার দিন পর অবরোধ উঠাইয়া লওয়া হয়। তাহাদের অহংকারের পরিপূর্ণ জবাব দেওয়া হয় বটে কিন্তু নিয়মিত বিজয় অর্জিত হয় নাই।

অতঃপর তাহাদের একটি প্রতিনিধি দল মদীনা আসিয়া হাজির হয়। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে মসজিদে অবস্থান করান যেন কোরআন শরীফের তেলাওয়াত ও তাঁহার বয়ান শুনিতে পায় এবং মুসলমানদের আমল- আচরণ দেখিবার ফলে তাহাদের উপর উহার আছর পড়ে। সুতরাং কিছু দিনের মধ্যেই তাহারা মুসলমান হইয়া ফিরিয়া যায়।

তায়েফ হইতে ফিরিয়া রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জিইররানা নামক স্থানে পৌছান, তখন তাহাদের একটি প্রতিনিধি দল আসিয়া হোনাইনের কয়েদীদের মুক্তির জন্য আবেদন করে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁহাদের আবেদন) মঞ্জুর করেন এবং ছয় হাজার কয়েদীকে বিনামূল্যে (মুক্তিপণ ব্যতীত) মুক্ত করিয়া দেন। জিইররানা হইতে তিনি রাতে একটি ওমরাও আদায় করেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৬ই জিক্বাআদাহ্ মদীনায় ফিরিয়া আসেন।

নবম হিজরী

গাযওয়ায়ে তবুক, প্রতিনিধি দলের আগমন এবং আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ গাযওয়া কোন্‌টি ছিল?

উত্তর ঃ গাযওয়ায়ে তবুক।

প্রশ্ন ঃ তবুক (নামক) স্থানটি মদীনা হইতে কত দূরত্বে এবং কোন্ দিকে অবস্থিত?

উত্তর ঃ আনুমানিক ১৪ মঞ্জিল দূরে, সিরিয়া অঞ্চলে।

প্রশ্ন ঃ এই গাযওয়া কাহাদের সঙ্গে হয়?

উত্তর ঃ রোমানদের সঙ্গে, যাহাদের অধিকাংশ ছিল খৃষ্টান।

প্রশ্ন ঃ উহার কারণ কি ছিল?

উত্তর ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন যে, রোমের বাদশাহ (হিরাক্লিয়াস) এবং মূতার পরাজিত খৃষ্টানরা মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিল।

প্রশ্ন ঃ এই সময় সাধারণ মুসলমানদের হালাত এবং মৌসুমী অবস্থা কি ছিল?

উত্তর ঃ প্রচণ্ড গরম এবং দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করিতেছিল। মুসলমানগণ নিদারুণ অভাবগ্রস্ত ছিল।

প্রশ্ন ঃ এই যুদ্ধের ছামান কিভাবে (সংগ্রহ) করা হয়?

উত্তর ঃ চাঁদার মাধ্যমে, যাহা ছাহাবায়ে কেরাম নিজ নিজ অবস্থা অপেক্ষাও অধিক দিয়াছিলেন। যেমন হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাঃ) ঘরের যাবতীয় ছামান আনিয়া রাখিয়া দিলেন, যাহার মূল্য ছিল চার হাজার দেরহাম। অর্থাৎ আনুমানিক এক হাজার টাকা। হযরত ফারূকে আজম ঘরের অর্ধেক ছামান আনিয়া হাজির করিলেন। হযরত ওসমান গনি (রাঃ) দশ হাজার দিনার, তিনশত উট এবং প্রচুর সম্পদ আনিয়া হাজির করিলেন। অনুরূপভাবে অপরাপর ছাহাবায়ে কেরাম নিজেদের অবস্থার তুলনায় আরো বেশী অংশগ্রহণ করেন। মহিলাগণ নিজেদের অলংকার খুলিয়া খুলিয়া দান করিয়া দিলেন।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ফৌজের সংখ্যা এবং সমরোপকরণ কি ছিল?

উত্তর ঃ ইসলামী ফৌজের সংখ্যা ছিল বিশ হাজার এবং হাতিয়ার ছিল ত্রিশ হাজার।

প্রশ্ন ঃ বাহিনীর প্রধান কে ছিলেন এবং মদীনার খলীফা কে নিযুক্ত হন?

উত্তর ঃ বাহিনীর প্রধান ছিলেন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মোহাম্মদ বিন মাসলামাকে মদীনার খলীফা নিযুক্ত করা হয়। আর হযরত আলী (রাঃ)-কে পারিবারিক দেখাশোনার জন্য রাখিয়া আসা হয়।

প্রশ্ন ঃ মদীনা হইতে কত তারিখে যাত্রা করা হয়?

উত্তর ঃ ৯ম হিজরীর ৫ই রজব, রোজ বৃহস্পতিবার, মোতাবেক ১০ই অক্টোবর ৬৩০ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন ঃ যুদ্ধ হইয়াছে কি-না এবং ফলাফল কি দাঁড়ায়?

উত্তর ঃ যুদ্ধ হয় নাই। কারণ, সেখানে কেহই ছিল না এবং হিরাক্লিয়াস বাদশাহ হেম্‌স চলিয়া গিয়াছিল। এই ছফরে রোমানদের উপর বিস্তর প্রভাব পড়ে। সুতরাং আয়লার গভর্ণর ইউহান্না বিন রুআইবিদ এবং সেই সঙ্গে হরবা, আন্দুহ, মায়নিয়া ইত্যাদির গভর্ণরগণও রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া হাজরি হন এবং তাঁহার সঙ্গে সন্ধি করিয়া নিয়মিত কর প্রদানের অঙ্গীকার করেন। অতঃপর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে নিরাপত্তা দান করেন।

প্রশ্ন ঃ এই শহরটি কোন্ দেশে?

উত্তর ঃ সিরিয়াতে।

প্রশ্ন ঃ এই সময় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালেদ বিন ওলীদকে কোথায় পাঠান? তিনি যেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন উহার কি হয়?

উত্তর ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালেদ বিন ওলীদকে খৃষ্টান উকাইদিরের নিকট পাঠাইয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা রাতে শিকাররত অবস্থায় তাহার সাক্ষাত পাইবে। পরে হুবহু এইরূপই হইল এবং

হযরত খালেদ (রাঃ) তাহাকে বন্দী করিয়া তাঁহার খেদমতে আনিয়া হাজির করিলেন।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথায় কত দিন অবস্থান করেন এবং কবে মদীনায় তাশরীফ আনেন?

উত্তর ঃ পনের বা বিশ দিন অবস্থানের পর রমজান মাসে মদীনায় ফিরিয়া আসেন।

প্রশ্ন ঃ মসজিদে জেরারের হাকীকত কি এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাকে কি কারণে এবং কবে জ্বালাইয়া দেন?

উত্তর ঃ মোনাফেকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরামর্শ করার জন্য কোবাতে মসজিদের নামে একটি ঘর নির্মাণ করিয়াছিল, উহাকে মসজিদে জেরার বলা হইয়াছে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ছফর হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় উহাকে জ্বালাইয়া দেওয়ার হুকুম করেন।

প্রশ্ন ঃ এই বৎসর আরো কয়টি গাযওয়া সংঘটিত হয় এবং কয়টি বাহিনী রওনা করানো হয়?

উত্তর ঃ কোন গাযওয়া হয় নাই। তবে তিনটি বাহিনী রওনা করানো হয়।

সারাংশ

যখন জানা গেল যে, বাদশাহ হিরাক্লিয়াস মূতার যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রস্তুতি লইতেছে, তখন শুরুতেই রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ত্রিশ হাজার মুসলিম ফৌজ লইয়া ৯ম হিজরীর রজম মাসে মদীনা হইতে যাত্রা করেন। গরমের মৌসুম ও দুর্ভিক্ষাবস্থায় মুসলমানগণ সীমাহীন দৈন্যদশাগ্রস্ত ছিল। চাঁদা করিয়া সৈনিকদের আবশ্যকীয় (ছামানের) যোগান দেওয়া হয়। পুরুষ ও মহিলা ছাহাবীগণ নিজেদের অবস্থার তুলনায় অনেক বেশী চাঁদা প্রদান করেন।

এই লশকর যখন তবুক এলাকায় পৌঁছায় তখন সেখানে কেহই ছিল না। বাদশাহ হিরাক্লিয়াস হেম্‌স চলিয়া গিয়াছিল। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথায় পনের দিন অবস্থানের পর রমজান মাসে মদীনায় ফিরিয়া আসেন। এই অবস্থানকালেই উকাইদির নবাবকে গ্রেফতার করিয়া আনা হয় এবং অন্যান্য নবাবদের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করা হয়। প্রত্যাবর্তনের সময় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে জেরারকে জ্বালাইয়া দেওয়ার হুকুম করেন– যাহা মোনাফেকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরামর্শ করার জন্য নির্মাণ করিয়াছিল।

শব্দার্থ ঃ

(মূল উর্দূ কিতাবের পাঠকদের জন্য)

تقریبا – প্রায়, আনুমানিক, কাছাকাছি, অনুরূপ। قحط – দুর্ভিক্ষ, অভাব, আকাল, দূর্মূল্যতা। حیثیت – অবস্থা, সামর্থ্য, পদমর্যাদা, ক্ষমতা, সম্পদ, আমদানী, মালিকানা, ঢং, পদ্ধতি। دیگر – দ্বিতীয়, অন্য, অপর, অপরাপর, অপরাহ্ন, বিকাল। نگرانی – দেখাশোনা, পর্যবেক্ষণ, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, প্রহরা। بندش – গ্রন্থি, বন্ধনকার্য, বন্ধন, পরিকল্পনা, যথারীতি, ধারণা, খেয়াল, ষড়যন্ত্র, বানোয়াট, দূরত্ব, অপবাদ, শব্দের গাঁথুনি।

হজ্ব-ব্যবস্থাপনা এবং বারাআতের ঘোষণা

প্রশ্ন ঃ এই বৎসরের অন্য বড় বড় ঘটনা কি?

উত্তর ঃ বড় বড় ঘটনা এই–

(১) একের পর এক আরবের সকল বড় বড় গোত্রের প্রতিনিধি দল আগমন করতঃ দ্বীন ও ঈমানের অর্থ ও লক্ষ্য সম্পর্কে অবগত হইয়া পরিপূর্ণ নিশ্চিত হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণে ভাগ্যবান হয় এবং নিজ নিজ গোত্রে

ফিরিয়া গিয়া তাহাদিগকেও ইসলাম দ্বারা ভাগ্যবান বানায়। গোটা আরব হইতে কুফর ও শিরক নিশ্চিহ্ন হইয়া দ্বীন ও ইসলামের বিস্তার ঘটে। এইভাবেই ইসলাম যেন আরবের জাতীয় ধর্মে পরিণত হয়।

(২) হজ্ব ফরজ হয়।

(৩) হজ্বের ব্যবস্থাপনা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করেন। এই দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য তিনি হযরত আবু বকর ছিদ্দিককে 'আমীর' নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন। তাহার সঙ্গে তিনশত মুসলমানের একটি বাহিনী দেওয়া হয়।

(৪) এই হজ্বের সময় আরবের মোশরেকদের সম্পর্কে ইসলামী হুকুমতের পলিসি (নীতি) ঘোষণা করা হয়– যাহার হেদায়েত (বা নীতি–নির্ধারণী উপদেশ) সুরা বারাআতে নাজিল হইয়াছিল। উহার সারকথা এই–

(ক) মোশরেকদের সঙ্গে নির্দিষ্ট মেয়াদে যেই চুক্তি হইয়াছে উহার পরিপূর্ণ পাবন্দি করা হইবে। কিন্তু শর্ত হইল– যদি স্বয়ং মোশরেকরা নিজেরাই উহা ভঙ্গ না করে।

(খ) যাহাদের সঙ্গে কোন চুক্তি হয় নাই, কিংবা চুক্তি হইয়াছিল কিন্তু উহার কোন নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ হয় নাই অর্থাৎ– যে কোন সময় ঐ চুক্তি শেষ হইয়া যাইতে পারিত, অথবা চুক্তি হইয়াছিল বটে, কিন্তু মোশকেরকরাই উহা ভঙ্গ করিয়াছিল, অর্থাৎ– উহার পাবন্দি করে নাই; এই জাতীয় সকলকেই আরো চার মাসের সুযোগ দেওয়া হইতেছে। এই সময়-সীমার মধ্যে তাহারা যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পারে। (নিজেদের ইচ্ছামত) চলাফিরা করার ব্যাপারে তাহারা পরিপূর্ণ নিরাপদ। উহার পর (এই সময়-সীমার পর) সেই ভূখণ্ডে তাহাদের বসবাসের কোন অধিকার থাকিবে না– ইসলাম যেই ভূখণ্ডের জাতীয় ধর্ম হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে।

(গ) যে কোন অবস্থায় কোন মোশরেক যদি অপনার নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করে, তবে তাহাকে নিরাপত্তা প্রদান করিবেন, যেন সে আল্লাহ্‌র কথা শুনিতে পারে এবং ইসলামের হাকীকত সম্পর্কে অবগত হইতে পারে। অতঃপর সে যেখানে নিজের জন্য নিরাপদ মনে করিবে তাহাকে সেখানেই পৌঁছাইয়া দিবেন।

(ঘ) এখন হইতে কা'বার হেরেমকে শিরকের ঐসকল অপবিত্রতা হইতে পাক করিয়া দেওয়া হইল- যাহা আরবের মোশরেকরা তথায় ছড়াইয়া রাখিয়াছিল (সম্পাদন করিয়া আসিতেছিল)। আগামীতে এই এবাদতগাহ্ (এবাদতের স্থান) কেবল আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাসী ঈমানদারদের জন্য (উন্মুক্ত) থাকিবে। আগামী বৎসর হইতে আর কোন মোশরেক কা'বার বাসনা করিতে পারিবে না (অর্থাৎ আগের মত খানায়ে কা'বায় প্রবেশ করিয়া তাহাদের ইচ্ছামত মনগড়া এবাদত করিতে পারিবে না)।

প্রশ্ন ঃ এই ঘোষণার পর কোন মোশরেককে বহিষ্কার কিংবা হত্যা করা হইয়াছিল কি?

উত্তর ঃ উহার কোন সুযোগই হয় নাই। কারণ, এই ঘোষণা এমন সময় করা হয়, যখন গোটা আরববাসী ইসলামের (দাওয়াত কবুল করার) মাধ্যমে ভাগ্যবান হইয়া গিয়াছিল। তবে নিঃসন্দেহে খায়বরের ইহুদীরা (তখনো) অবশিষ্ট ছিল এবং চুক্তি অনুযায়ী দীর্ঘ দিন সেখানে ছিল।

প্রশ্ন ঃ এই ঘোষণা কে করিতেন?

উত্তর ঃ হযরত আলী (রাঃ) ঐ ঘোষণা করিতেন, যিনি বিশেষভাবে ঐ কাজের জন্যই প্রেরীত হইয়াছিলেন।

প্রশ্ন ঃ হযরত আবু বকর ছিদ্দিককে আমীর বানাইয়া পাঠাইবার পর বিশেষভাবে ঐ ঘোষণার জন্য আবার হযরত আলী (রাঃ)-কে কেন পাঠানো হইল?

উত্তর ঃ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আমীর হিসাবে হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) নিজেও ঐ ঘোষণা দিতে পরিতেন। কিন্তু আরবের দস্তুর বা সাধারণ নিয়ম ছিলঃ এই জাতীয় ঘোষণা তখনই গ্রহণযোগ্য হইত, যখন ঐ কাজের প্রধান জিম্মাদার স্বয়ং উহা ঘোষণা করিতেন কিংবা তাহার এমন কোন আত্মীয় ঐ ঘোষণা করিত, যিনি ঐ প্রধান জিম্মাদারের ওলী এবং ওয়ারিশ হন। হযরত আলী (রাঃ) যেহেতু রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই ছিলেন এই কারণেই তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে উহা ঘোষণা করার জন্য পাঠাইলেন, যেন খোদ আরবের দস্তুর অনুযায়ী (ঐ ঘোষণাটি) পরিপূর্ণরূপে প্রামাণ্য হয় এবং কাফের ও মোশরেকদের পক্ষ হইতে কোন প্রকার টাল-বাহানা করার সুযোগ না থাকে। অপরাধ ও শাস্তির ক্ষেত্রে ইসলামের সতর্কতা অবলম্বনের ক্ষেত্রেও ইহাই কাম্য ছিল যে, এই জাতীয় ঘোষণার সময় যেন সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

প্রশ্ন ঃ এই সময় কি অন্য কোন বিষয়েরও ঘোষণা দেওয়া হয়?

উত্তর ঃ অপর দুইটি বিষয়ও ঘোষণা করা হয়। প্রথমতঃ বিবস্ত্র অবস্থায় কেহ কাবাঘর তাওয়াফ করিতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ কাফেররা আল্লাহর নিকট যাবতীয় নেয়মত হইতে মাহরূম হইবে এবং তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

প্রশ্ন ঃ ওয়াফ্দ (প্রতিনিধি দল) কাহাকে বলা হয়?

উত্তর ঃ ওয়াফ্দ এমন জামায়াতকে বলা হয় যাহারা কোন উদ্দেশ্য লইয়া কাহারো নিকট গমন করে।

প্রশ্ন ঃ এই বৎসর অর্থাৎ ৯ম হিজরীতে কি কারণে এত প্রতিনিধি দলের আগমন হয়?

উত্তর ঃ ইহা (পূর্বেই) জানা গিয়াছে যে, হোদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে

(আরবের) জমিন মুসলমানদের জন্য সংকুচিত ছিল। তাহাদের জন্য পথ ছিল রুদ্ধ এবং পদে পদেই ছিল বিপদ। কিন্তু সন্ধির ফলে এই সকল প্রতিবন্ধক অপসারিত হয়। এই সুযোগে ইসলামী ধ্যান-ধারণার প্রসার ঘটাইয়া মিথ্যা অপবাদসমূহ নির্মূল করা হয়। কিন্তু মক্কার কাফেরদের প্রাধান্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং তাহাদের সেই পুরাতন মর্যাদাবোধ অপরাপর গোত্রসমূহকে মুসলমান হওয়ার পথে এখনো প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল। পরে অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর যখন এই জালেম শক্তি বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে, তখনই ইসলামী জেহাদের উদ্দেশ্যের বিকাশ ঘটে।[১] অর্থাৎ– দুর্বলদের পক্ষে নিজেদের ইচ্ছামত নিজেদের ভালাই ও কল্যাণের দ্বীন গ্রহণ করা সহজ হইয়া যায়। সুতরাং বিভিন্ন প্রতিনিধি দল আগমন করিয়া স্বেচ্ছায় ইসলাম দ্বারা ভাগ্যবান হয় (ইসলাম গ্রহণ করে)।

টীকা

১। এই কথা সর্বদা স্মরণ রাখিবার মত যে, ইসলামী জেহাদের উদ্দেশ্য হইল পৃথিবী হইতে ফেৎনা-ফাসাদ নির্মূল করিয়া দেওয়া। উহার উদ্দেশ্য কখনো মানুষকে জবরদস্তী মুসলমান বানানো নহে। অন্যথায় বিজিত দেশসমূহে কোন একজন কাফেরেরও অস্তিত্ব থাকিত না। অন্ততঃ মক্কা বিজয়ের সময় তথাকার অধিবাসীদিগকে নিরাপত্তা দেওয়া হইত না। বরং এমন ঘোষণা দেওয়া হইত, যে মুসলমান না হইবে তাহাকে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করা হইবে। ইহা একটি বিস্ময়কর ঘটনা যে, বড় বড় শক্তিশালী প্রতিপক্ষ মোকাবেলার সময় মুসলমান হয় নাই। মক্কা বিজয়ের ঘটনা উহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বনু ছাকিফ ও হাওয়াজিন গোত্রদ্বয় ঐ সময়ও মোকাবেলার জন্য আঁট ধরিয়াছিল। তাহারাও পরে আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করে। কবীলায়ে বনু হানিফের সরদার ছুমামা বিন উছামাকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু তাহাকে মুক্তি দানের অনেক পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

সারাংশ

এই বৎসরের অপরাপর বড় ঘটনাসমূহের মধ্যে (একটি হইল, এই বৎসর) ইসলামী হজ্ব আদায় করা হয়। হযরত আবু বকর ছিদ্দিককে হজ্বের ব্যবস্থাপনার জন্য তিনশত মুসলমানের এক বাহিনীর প্রধান এবং হজ্বের আমীর বানাইয়া পাঠানো হয়। এই হজ্বেই হযরত আলী (রাঃ) ঐ প্রসিদ্ধ খোদায়ী ঘোষণা প্রচার করেন, যাহার হেদায়েত পবিত্র কোরআনের সুরা তওবাতে বিবৃত হইয়াছিল। পরে যেহেতু কোরাইশী কাফেরদের শক্তি খর্ব হইয়া গিয়াছিল এবং ইসলাম গ্রহণকারী গোত্রসমূহের পথ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং বিভিন্ন গোত্রসমূহের প্রতিনিধি দল রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া হাজির হয়।

শব্দার্থ ঃ

(মূল উর্দূ কিতাবের পাঠকদের জন্য)

پامال کرنا – বরবাদ করা, ভঙ্গ করা, পদদলিত করা, মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া, বিরাণ করা। مزید – বৃদ্ধি, বেশী, প্রসার, বর্ধন। آلودگی – অপবিত্রতা,মলিনতা, কদর্যতা, ময়লা, নাপাকী। قصد – বাসনা, ইচ্ছা, অভিপ্রায়, নিয়ত, উদ্দেশ্য, মর্জি, খাহেশ, প্রচেষ্টা, উদ্যোগ। اعتبار – আস্থা,

টীকা (পূর্বের পৃষ্ঠার পর)

ওয়াসাল্লামের জামাতা হযরত আবুল আস এবং চাচা হযরত ইবনে আব্বাসকে গ্রেফতার করা হয়, কিন্তু ঐ সময় তাহারা ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। বরং মুক্ত হওয়ার পর নিজেদের বাড়ীতে গিয়া স্বেচ্ছায় তাহারা ইসলাম গ্রহণ করেন। এই ধরনের অসংখ্য ঘটনা এই কথার প্রকাশ্য প্রমাণ বহন করিতেছে যে, ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তলোয়ার তো দূরের কথা, বরং কোন প্রকার বল প্রয়োগ করাও অনুমোদন করা হয় নাই।

বিশ্বাস, গ্রহণযোগ্য, নিশ্চয়তা, ভরসা, সমাদর, গুণগ্রাহিতা। دستور – নিয়ম, সাধারণ নিয়ম, রীতি, দেশাচার, রেওয়াজ, প্রথা, কানুন, বিধান, পরামর্শদাতা, উজীর, সচিব, নমুনা, উদাহরণ, কমিশন, জিলা। حجت – দলিল, প্রমাণ, প্রামাণ্য, বাদানুবাদ, আলোচনা, বিতর্ক। برهنه – উলঙ্গ, বিবস্ত্র, অনাবৃত, উন্মুক্ত। تنگ – সংকীর্ণ, সংকুচিত, অল্পপরিসর, আঁটসাট, অপ্রশস্ত, অনুদার, কম, স্বল্প পরিমাণ, হেয়, নীচ, বিপদগ্রস্ত, বিত্তহীন, গরীব, অসহায়, অপারগ, চিন্তিত, দুঃখিত, দুষ্কর। افسر – প্রধান কর্মকর্তা, প্রধান, বিচারক, কর্মচারী, অফিসার।

দশম হিজরী

পূর্বাকাশে পুনরায় সূর্যোদয়

রাসূল (সঃ)-এর হজ্ব

প্রশ্ন ঃ দশম হিজরীতে কয়টি গাযওয়া সংঘটিত হয় এবং কয়টি বাহিনী রওনা করানো হয়?

উত্তর ঃ কোন গাযওয়া হয় নাই; তবে দুইটি বাহিনী রওনা করানো হয়।

প্রশ্ন ঃ হজ্ব কবে ফরজ হয় এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবে হজ্ব আদায় করেন?

উত্তর ঃ পঞ্চম, নবম অথবা দশম হিজরীতে হজ্ব ফরজ হয়। এই বিষয়ে ওলামাদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। তবে যাহাই হউক, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশম হিরীতেই হজ্ব আদায় করেন।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ হজ্বের নাম কি এবং কি কারণে ঐ নাম রাখা হয়?

উত্তর ঃ ঐ হজ্বের নাম হইল 'হাজ্জাতুল বিদা' অর্থাৎ বিদায় হজ্ব। কারণ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার তিন মাস পরই ইন্তেকাল ফরমান।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা হইতে কবে রওনা হন?

উত্তর ঃ ২৫শে জিক্বাআদাহ, ২১শে ফেব্রুয়ারী ৬৩২ খৃষ্টাব্দ, রোজ শনিবার বাদ জোহর।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফ কবে পৌঁছান?

উত্তর ঃ ৪ঠা জিলহজ্ব সোমবারে তিনি মক্কায় উপস্থিত হন।

প্রশ্ন ঃ ঐ বৎসর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কতজন মুসলমান হজ্ব আদায় করেন?

উত্তর ঃ প্রায় লক্ষাধিক মুসলমান।

প্রশ্ন ঃ ঐ হজ্বের সময় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ কোন্ স্থানে কয়টি ভাষণ দেন?

উত্তর ঃ তিনটি ভাষণ দেনঃ

(১) ৯ই জ্বিলহজ্ব, আরাফাতের মাঠের মধ্যস্থলে নিজের উটনীর উপর সওয়ার হইয়া। ঐ উটনীর নাম ছিল কাস্ওয়া।

(২) ১০ই জিলহজ্ব মীনাতে।

(৩) ১১ই জিলহজ্ব মীনাতে।

প্রশ্ন ঃ ঐসকল ভাষণের মূল কথা কি ছিল?

উত্তর ঃ মূল কথা ছিল এই–

(১) বিষয়গুলি ভালভাবে বুঝিয়া লও; সম্ভবতঃ এই বৎসরের পর আমি এবং তোমরা আর একত্রি হইতে পরিব না।

(২) স্মরণ রাখিও, তোমাদের জান-মাল, তোমাদের ইজ্জত-আব্রু পরস্পরের জন্য এমনভাবে হারাম, যেমন আজকের এই দিবস, এই শহর এবং এই মাসকে তোমরা হারাম মনে কর।

(৩) হে লোকসকল! শীঘ্রই তোমাদেরকে আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাজির হইতে হইবে। স্মরণ রাখিও, সেখানে তোমাদেরকে তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে।

(৪) জাহেলী যুগের সকল তরীকা পদদলিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(৫) জাহেলী যুগের কাহারো খুনের প্রতিশোধ ভবিষ্যতে গ্রহণ করা হইবে না।

(৬) যত সুদ ছিল সব মাফ। ভবিষ্যতে (উহার দাবী) সম্পূর্ণ বাতিল ঘোষণা করা হইল।

(৭) আমার (ইন্তেকালের) পর তোমরা কাফের হইয়া যাইও না। একে অপরকে হত্যা করিয়া ফিরিও না।

(৮) আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী যে তোমাদের উপর হুকুমত করিবে, তাহার পরিপূর্ণ আনুগত্য করিও।

(৯) স্বীয় পরওয়ারদিগারের এবাদত, নামায, রোযা এবং যাহাকে তোমরা নিজেদের আমীর বানাইবে তাহার আনুগত্য করিও; জান্নাত তোমাদের।

(১০) নারীদের অধিকার সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করিও। তাহাদের হক সমূহের প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখিও। তোমাদিগকে এক বিশেষ জিম্মাদারীর সহিত তাহাদের অভিভাবক বানানো হইয়াছে। নারীগণও পুরুষদের পরিপূর্ণ আনুগত্য করিবে। তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘরে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবে না।

(১১) আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি বস্তু রাখিয়া যাইতেছি, যতদিন উহা ধারণ করিয়া রাখিবে (ততদিন) কস্মিনকালেও পথভ্রষ্ট হইবে না। একটি হইল আল্লাহর কিতাব এবং অপরটি আমার তরীকা।

(১২) যাহারা এখানে উপস্থিত তাহারা আমার পয়গাম অন্যদের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে। কারণ, অনেক সময় প্রথম (শ্রবণকারী)-দের তুলনায় পরবর্তীরা অধিক সংরক্ষণকারী ও বুদ্ধিমান হইয়া থাকে।

(সমাপ্তি) হে লোক সকল! কেয়ামতের দিন আমার সম্পর্কে তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে। বল, (তখন) কি জবাব দিবে? সকলে বলিলঃ আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি আল্লাহর হুকুম আমাদের নিকট পৌঁছাইয়াছেন, তাবলীগ ও রেসালাতের হক আদায় করিয়াছেন, আমাদের মঙ্গলের কথা ভালভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আকাশের দিকে অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করিয়া) বলিলেনঃ আয় আল্লাহ, সাক্ষি থাকিও! আয় আল্লাহ, সাক্ষি থাকিও!! আয় আল্লাহ, সাক্ষি থাকিও!!!

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানীতে কয়টি উট জবাই করেন?

উত্তর ঃ ১০০ উট জবাই করেন। খোদ নিজের হাত মোবারকে ৬৩টি এবং হযরত আলী (রাঃ) ৩৭টি।

প্রশ্ন ঃ ঐ আয়াত যাহাতে ইসলাম এবং আল্লাহ পাকের নেয়ামত পূর্ণাঙ্গ হওয়া এবং ইসলামের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়, উহা কবে নাজিল হয়?

উত্তর ঃ ১০ম হিজরীর ৯ই জিলহজ্ব, আরাফা দিবসে জুমুআর দিন।

সারাংশ

১০ম হিজরী ২৫ অথবা ২৬ জিক্বাআদাহ্ রোজ শনিবার পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরজ হজ্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে মদীনা হইতে রওনা হইয়া ৪ঠা জিলহজ্ব পবিত্র মক্কায় পৌছান এবং হজ্ব আদায় করেন। এই হজ্বে তাঁহার সঙ্গে লক্ষাধিক মুসলমান শরীক ছিল।

৯, ১০ এবং ১১ ই জিলহজ্ব তিনি (সমবেত ইসলামী জনতার উদ্দেশ্যে) বক্তব্য রাখেন; সেই সারগর্ভ বক্তব্যের সমষ্টিতে যেন এলেম ও মায়রেফাত এবং দ্বীন-দুনিয়ার ভালাই ও কল্যাণের সমুদ্র ভরিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

কোরবানীতে তিনি ১০০ উট জবাই করেন এবং ঐ সময় ৯ই জিলহজ্ব ঐ আয়াতটি নাজিল হয় যাহাতে দ্বীন পুর্ণাঙ্গ হওয়া, মুসলমানদের উপর আল্লাহর নেয়মত সম্পন্ন হওয়া এবং ইসলামের উপর আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির সুসংবাদ ঘোষিত হইয়াছে।

শব্দার্থ ঃ

(মূল উর্দূ কিতাবের পাঠকদের জন্য)

آفتاب – সূর্য, রবি, দিবাকর। رحلت – ইন্তেকাল, মৃত্যু, ওফাত, বিদায়, যাত্রা, পরলোক গমন। عنقریب – শীঘ্র, নিকট-ববিষ্যৎ, সত্বর, প্রায়, উদ্যত। قطعاً – সম্পূর্ণরূপে, নিশ্চিতরূপে, সর্বতোভাবে, কস্মিনকালেও, বিন্দুমাত্রও। اطاعت – আনুগত্য, তাবেদারী, বন্দেগী, ফরমাবরদারী, বশ্যতা, ভক্তি, শ্রদ্ধা।

শেষ ভাষণে একটি জরুরী শিক্ষা

উপলব্ধিকর, স্মরণ রাখ এবং আমল কর

বিদায়ী ভাষণের সপ্তম অনুচ্ছেদটি পুনরায় পাঠ করঃ "আমার (ইন্তেকালের) পর তোমরা কাফের হইয়া যাইও না। একে অপরকে হত্যা করিয়া ফিরিও না।" আঁহযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই পবিত্র বাণীর স্পষ্ট তাৎপর্য হইল– পরস্পরকে হত্যা করা ইহা কাফেরদের কাজ; কোন মুসলমান কখনো এইরূপ করিতে পারে না।

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীকে অন্তরে বদ্ধমূল করিয়া লওয়াই আজকের (মূল) শিক্ষা। এই শিক্ষার তাৎপর্যকে অন্তরে ধারণ কর এবং সারা জীবন উহার উপর আমল কর। দুশমনী ও শত্রুতা এবং পরস্পরকে হত্যা করা– কি কারণে ঈমানদারদের পক্ষে সম্ভব নহে? এই কারণে সম্ভব নহে যে, উহা ঈমান ও ইসলামী চরিত্রের পরিপন্থী। ঈমান ও ইসলামের মূল উপাদান ঐক্য ও একতা দ্বারা গঠিত। ইসলামের শিরা-উপশিরায় ঐক্য, একতা, পরস্পরের সাহায্য-সহানুভূতি ও কল্যাণকামনায় পরিপূর্ণ। নামাজ-রোজা-হজ্ব ও জাকাত হইল ইসলামের মৌলিক ফরজ। উহার একেকটি ফরজকে লইয়া দেখ (অনুসন্ধান করিয়া দেখ)ঃ এবাদতের প্রান্তের সহিত ঐক্য, একতা, অনুকম্পা ও সম্প্রীতি এবং শান্তি ও নিরাপত্তার সূত্র কেমনভাবে সংশ্লিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যদি এই সূত্র টুটিয়া যায়, তবে এবাদতের প্রান্তও ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়। (বিষয়টি) ভালভাবে উপলব্ধি করুন।

নামাজ

নামাজ হইল ইসলামের প্রধান ও ব্যাপকধর্মী ফরজ। সকল মুসলমানই অবগত যে, জামায়াতে শরীক হওয়া প্রতিটি মোমেন পুরুষের জন্যই জরুরী বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে। এমনকি কোন কোন আলেম জামায়াত

ব্যতীত পুরুষদের নামাজ জায়েজ বলিয়াই স্বীকার করেন নাই।

জামায়াত এবং একতা

প্রকাশ থাকে যে, জামায়াতের মাধ্যমে–

(১) প্রতিদিন পাঁচবার মহল্লাবাসীদের সম্মিলন হয়।

(২) উহার ফলে (পরস্পর) ছালাম-কালামও হয়।

(৩) পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়।

(৪) কেহ অসুস্থ থাকিলে তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করা যায়।

(৫) কেহ বিপদগ্রস্ত থাকিলে তাহার প্রতি সহানুভূতি (প্রকাশ) করা যায়। এই সকল বিষয় হইল ঐক্যের মৌলিক নীতি এবং অনুগ্রহ, সম্প্রীতি ও পার্থিব শান্তির বুনিয়াদ। বিশেষতঃ যখন এই কথা স্মরণ থাকিবে যে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

(১) চোগলখোর ও গীবতকারী জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।

(২) মোমেনকে গালাগাল দেওয়া পাপের কাজ এবং খুনাখুনি করা কুফরী।

(৩) একে অন্যকে উপহাস করা হারাম।

(৪) যেই ব্যক্তি কাহারো মুসীবত দূর করিয়া দেয় কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক তাহার মুসীবত দূর করিয়া দিবেন।

(৫) অহংকার হইল আল্লাহর সমকক্ষতার দাবী। অহংকারী ব্যক্তি আল্লাহর কাপড় লইয়া টানাটনী করে। কেননা, মাহাত্ম্য কেবল তাহারই অধিকার।

(৬) অণু পরিমাণ অহংকারও বেহেশ্‌তের পথে বিরাট অন্তরায়।

(৭) মুসলমান তো সেই, যাহার মুখ ও হাতের অনিষ্ট হইতে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।

(৮) মোমেন তো সেই, যাহার অনিষ্ট হইতে আল্লাহ পাকের গোটা সৃষ্টি নিরাপদ থাকে।

(৯) শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি যাহার কল্যাণ ব্যাপক, যে গোটা মাখলুকাতের কল্যাণ কামনা করে।

(১০) ঐ ব্যক্তি ইসলামী দলভুক্ত নহে, যে বড়কে ইজ্জত করে না, ওলামাদের সম্মান করে না এবং ছোটদেরকে স্নেহ করে না।

এক ইমাম

এক মসজিদে এক ওয়াক্তে যত নামাজীই হাজির হইবে তাহারা সকলে একই ইমামের পিছনে তাহার অধীন হইয়া নামাজ পড়িবে– চাই মসজিদ যত বড়ই হউক এবং সমবেত লোকদের সংখ্যা যত বেশীই হউক। এই ক্ষেত্রে কয়েক জন ইমাম বানানো যাইবে না। কারণ, মুসলমান একটি দেহের মত, উহা খণ্ড খণ্ড করার উপায় নাই। আল্লাহর সামনে হাজির হওয়ার সময় অধিক সংখ্যককে এককের ছুরতে হাজির হওয়া বিধেয়। উহার পদ্ধতি এই যে, পেশ ইমাম একজন হইবেন এবং সকলে তাঁহার অনুগত হইবে।

এক কেবলা

এই ঐক্যের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতেই এক দিকে হুকুম হইতেছেঃ নামাজের কাতার যেন সম্পূর্ণ সোজা থাকে। একজনের পায়ের গিঁঠ অপর জনের গিঁঠের বরাবর থাকিবে। গোলাম হউক বা প্রভু, গরীব হউক চাই আমীর, বিত্তহীন কিংবা মুকুটধারী বাদশাহ– যখন নামাজে দাঁড়াইবে তখন পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া (দাঁড়াইবে)।

এমনিভাবে একটি বিশেষ দিকের প্রতি কেন্দ্র নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, সকলের সেজদা উহার দিকেই হইতে হইবে। যেন পূর্ব-পশ্চিম,

দক্ষিণ-উত্তর, ইউরূপ-এশিয়া- মোটকথা, নগর-দেশ ও জাতীয়তার বিভিন্নতা ও ভেদাভেদ দূরীভূত হইয়া এক সুন্দর আত্মীয়তার (বন্ধনে) যেন সকলে সম্পৃক্ত হইয়া যায়। এমন অবস্থার সংমিশ্রণ যেন না হয় যে, কেহ 'লাত'-এর পূজা করিত, কেহ বা উজ্জার। কারণ প্রকৃত অবস্থা তো হইল- আল্লাহ পাক সকল দিকে এবং সকল স্থানেই মওজুদ আছেন। তাঁহার উদ্দেশ্যেই সেজদা ও নামাজ। খানায়ে কাবার উদ্দেশ্যেও সেজদা করা হয় না এবং হজরে আসওয়াদকেও চুম্বন করা হয় না। খানায়ে কাবা একটি ঘরের নাম, আর হজরে আসওয়াদ একটি পাথর মাত্র।

রোজা

নামাজের পর ইসলামের দ্বিতীয় ফরজ হইল রোজা। উহাতে দিনভর অভুক্ত ও পিপাসার্ত থাকিতে হয়, যেন আল্লাহ পাকের হুকুমের তা'মীল হয় এবং বাদশাহ ও আদরে লালিত সৌভাগ্যবান লোকেরা গরীব-মিসকীন ও ভুখা-ফাকা মানব সম্প্রদায়ের অন্তরের ব্যথা অনুভব করিতে পারে এবং কুদরতী ভাবেই তাহাদের সমবেদনার বীজ বিত্তবানদের অন্তরে বপন হইয়া যায়। কিন্তু এই বীজ মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়ার জন্য বপন করা হয় না, বরং উহার উপর আমল করাই মূল উদ্দেশ্য।

সুতরাং রমজান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব জাতির সমবেদনার প্রশস্ত পথে এক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। আর সেই পদক্ষেপই হইল সদকায়ে ফিত্‌র আদায় করা। অর্থাৎ যতক্ষণ ২৭ ছটাক গম কিংবা ৫৪ ছটাক যব গরীবকে দান করা না হইবে, ততক্ষণ যেন রোজা ঝুলন্ত থাকে। না এদিকে হয়, না সেদিকে। সদকায়ে ফিত্‌রের পরেই উহা গ্রহণযোগ্যতার স্তরে আসে।

জাকাত

জাকাত হইল একটি তাৎক্ষণিক আমল। অর্থাৎ উহা যেন রমজানের

শিক্ষার একটি সাময়িক পরীক্ষাবিশেষ। এতদ্ব্যতীত তাহাদের নিকট কিংবা তাহাদের এলাকায় যেইসকল বিত্তহীন লোকেরা বসবাস করে তাহাদের জন্য শতকরা আড়াই টাকা হারে একটি নির্দিষ্ট ভাতা নির্ধারণ করা হইয়াছে– যাহা 'জাকাত' নামে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু "আগে স্বজন পরে গুরু জন" প্রবাদের নিয়ম অনুযায়ী কেবল মুসলমানদের মধ্যেই (জাকাত বিতরণ) সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে। কিন্তু মুসলমানদের শান, মর্যাদা ও মহানুভবতায় বলা হইয়াছে, তাহাদের সদয় হস্ত হইতে শুধু মানুষই নহে; কোন প্রাণীও যেন বঞ্চিত না থাকে।

সেই সঙ্গে আরো তাকীদ করা হইয়াছে যে, শতকরা আড়াই টাকার অতিরিক্ত আরো কিছু অংশ গরীবদের জন্য জরুরী মনে করিবে। যেই পরিমাণ দান করিবে (সেই পরিমাণই) ছাওয়াব প্রাপ্ত হইবে। শতকরা এই আড়াই টাকার ভাতা একদিকে যেমন বিত্তবানদিগকে গরীবদের প্রতি স্বক্রিয় সহানুভূতিশীল বানাইয়া দিয়াছে, অন্য দিকে গরীবদিগকেও তাহাদের প্রতি অনুগ্রহশীল বিত্তবানদের জন্য নিবেদিতপ্রাণ বানাইয়া দিয়াছে। অর্থাৎ গরীবদেরও পেট ভরিল এবং তাহাদের উজার করা "ভালবাসা" বিত্তবানদের ধন-সম্পদকে চোর-ডাকাতদের হাত হইতে রক্ষা করিল। তাহারা নিশ্চিন্তে ঘুমাইবে আর মহল্লার গরীব শ্রেণীর লোকেরা তাহাদের হেফাজত করিবে যে, (এই বিত্তবানেরা) আমাদের প্রতি অনুগ্রহকারী, তাহাদের সম্পদে আমাদেরও অংশ আছে। পূঁজিপতির প্রশ্ন উত্থাপনকারীই যখন কেহ রহিল না, সুতরাং উহার প্রশ্ন আর কি থাকিবে? (পবিত্র কোরআনের ভাষায়) ইহাই হইল–

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰا وَ يُرْبِى الصَّدَقٰتِ

অর্থঃ আল্লাহ্ পাক সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন।

জুমুআর নামাজ

নামাজের ব্যাপারে জামায়াতের আকারে মহল্লায় মহল্লায় যেই ঐক্যের সমিতি ও কমিটি বানানো হইয়াছিল, উহারই উন্নতির দ্বিতীয় স্তর হইল জুমুআর নামাজ। অর্থাৎ জুমুআর নামাজ হইল গোটা শহরের সম্মিলিত সমাবেশ– যাহাতে গ্রামের প্রতিনিধিরাও সমান অংশ লইতে পারে।

দুই ঈদ

তৃতীয় পর্যায়ে রাখা হইয়াছে দুই ঈদের নামাজ, যাহা জুমুআর নামাজ হইতেও আরো ব্যাপক। তবে উহাতে আশেপাশের গ্রামের লোকদের অংশগ্রহণ আবশ্যক করা হয় নাই রটে। কারণ, ইসলাম মানুষকে অধিক কষ্টও দেয় না। কিন্তু (ঈদের জামায়াতের) শান ও মর্যাদা এবং এই বাৎসরিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের প্রেরণা গ্রামের মানুষকেও আকর্ষণ করিয়া এখানে আনিয়া কার্যতঃ তাহাদিগকে হাজির করিয়া দেয়। এইভাবেই উহা শহর এবং উহার আশেপাশের সম্মিলিত কন্‌ফারেন্সে পরিণত হয়।

হজ্ব

কিন্তু এখনো কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদের সম্মিলন অবশিষ্ট রহিয়াগিয়াছে। প্রাচ্য ও পশ্চাত্যের সকলকে এখনো একত্র করা হয় নাই। মানব গোষ্ঠির পোশাকী ব্যবধানের এখনো অবসান হয় নাই। সুতরাং ঐ কাবা ঘর– যাহা মুসলমানদের স্বভাবগত ও ভৌগলিক বিভিন্নতা ও ভেদাভেদ (দূরীভূত করার) কেন্দ্রবিন্দু ছিল এবং কুদরতীভাবেই উহা পৃথিবীর স্থলভাগের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল, তা ছাড়া উহার প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন তিনি– যিনি কেবল অধিকাংশ মানব জাতিরই নহে; বরং উহা হইতেও আরো উর্ধ্বে, গোটা আদম সন্তানের পিতা ছিলেন। (কেননা, হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্‌সালামকেও খানায়ে কা'বার প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি হযরত আদম আলাইহিস্‌সালামের স্থাপিত ভিত্তির উপরই কাজ

করিয়াছেন– কালের বিবর্তন যেই ভিত্তিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছিল)।

হজ্বের নামে একটি বাৎসরিক কন্‌ফারেন্সের ভিত্তি স্থাপন করা হয়– যাহাতে অংশ গ্রহণ করার জন্য ভূপৃষ্ঠের সকল মুসলমানকে আহবান করা হইয়াছে। এই জামায়াতে প্রতিনিধিত্ব (অংশগ্রহণ) করার জন্য ইসলামের সঙ্গে অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার পাশাপাশি আজাদ এবং বালেগ হওয়ার শর্ত আরোপ করা হইয়াছে। এখানে নারী-পুরুষের ভেদাভেদও করা হয় নাই। তবে যাবতীয় খরচ আগন্তুকদের নিজেদের দায়িত্বেই রাখা হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে সেই কোরবানীর কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহা তাহাদের পিতা হযরত ইব্রাহীম এবং হযরত ইসমাইল (আঃ) আল্লাহর সামনে পেশ করিয়াছিলেন। কেবল এতটুকু পার্থক্য রাখা হইয়াছে যে, ছেলের স্থলে পশুকে তাহার প্রতিনিধি বানানো হইয়াছে, যেন জবাই করার পাশাপাশি ঐ স্থলাভিষিক্তের সম্প্রদায়ের উপর মোহাব্বতও পরিপূর্ণ হয়।

এই সময় তিনি অন্ততঃ তিনটি ভাষণ দান করেন। উহাতে যাবতীয় জরুরী বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হইয়াছে। তা ছাড়া সেই সকল বিষয়ের উপর যাহা–

(১) কোন বিশ্বসম্রাট বিভিন্ন দেশ এবং বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণের প্রজাদের কন্‌ফারেন্স হইতে

(২) কোন সেনাপতি নিজের সকল ফৌজের সমাবেশ হইতে, কোন বিশ্ব সম্প্রদায়ের সম্মিলিত কন্‌ফারেন্স হইতে এবং–

(৩) কোন বড় ধরনের ব্যবসা (প্রতিষ্ঠান) বিশ্বপ্রদর্শনী হইতে হাসিল করিতে পারে; উহা এই হজ্ব হইতে হাসিল হইয়াছে।

পোশাকী বিভিন্নতার বিলোপসাধন করিয়া আমীর ও গরীবদের মর্যাদাগত পার্থক্যও এখানে মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহজীব-তমদ্দুন ও সংস্কৃতির চাকচিক্যও পরিহার করিয়া কেবল ঐ পোশাকই রাখা হইয়াছে

যাহা কোন অনুন্নত জাতির পক্ষেও সহজলভ্য হয়। অর্থাৎ সেলাই বিহীন লুঙ্গি ও চাদর। ইহাই হইল ঐক্য (প্রতিষ্ঠার) হেকমত যাহা (হজ্বে সম্পাদিত) ঐ সকল ফরজ হইতে নির্গত হয়। আমাদের অবশ্যকর্তব্য হইল উহা উপলব্ধি করা, অন্তরে ধারণ করা এবং উহার উপর আমল করা। নিজেরা ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং অপরকেও ঐক্যবদ্ধ হইতে আহবান করা, যেন পৃথিবী শান্তি ও নিরাপত্তার ভাণ্ডারে পরিণত হয় এবং মুসলমানগণ নিজেদের সেই ফরজ সম্পাদন করিতে পারে যাহার ভিত্তিতে তাহাদিগকে "শ্রেষ্ঠ উম্মত" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

শব্দার্থ ঃ

(মূল উর্দূ কিতাবের পাঠকদের জন্য)

خطبہ – ভাষণ, বক্তৃতা, ওয়াজ, নসীহত, জুমুআ এবং ঈদের দিন সমবেত মুসল্লীদের উদ্দেশ্য প্রদত্ব ভাষণ, ঠিকানা, পুস্তকের ভূমিকা। اتفاق – ঐক্য, একতা, ঐকমত্য, মিলন, মিলমিশ, মোহাব্বত, দোস্তী, হঠাৎ, ঘটনাক্রম। سلامتی – শান্তি, নিরাপত্তা, সুস্থতা, জীবণ, হায়াত, অবস্থান, উপস্থিতি। فسق – পাপাচার, পাপের কাজ, পাপ, অপরাধ, অন্যায়, অবাধ্যতা। ذرّہ – অল্প, সামান্য, অণু, অনুপরিমাণ, বস্তুর ক্ষুদ্র অংশ। افضل – শ্রেষ্ঠ, পরমোৎকৃষ্ট, অতি উত্তম, খুব ভাল। خارج – বহিষ্কৃত, (দলভুক্ত নহে এইরূপ) পরিত্যক্ত, বাহিরের, পৃথক, কাফের, মোরতাদ। قلاش – বিত্তহীন, গরীব, কাঙ্গাল, নির্লজ্জ। حجر – পাথর, প্রস্তর, পাষাণ। فوری – তাৎক্ষণিক, তৎক্ষণাত, উপস্থিত ক্ষেত্রে, সঙ্গে সঙ্গে। محسن – উপকারী, সাহায্যকারী, অনুগ্রহশীল, সহযোগিতাকারী, দাতা, মুরব্বী, পৃষ্ঠপোষক। انجمن – সমিতি, কমিটি, সংঘ, সভা, আসর, ক্লাব, সংগঠন, মাহফিল, মিলনায়তন, ভোজনোৎসব। بانی – প্রতিষ্ঠাতা, ভিত্তি স্থাপনকারী, উদ্বোধনকারী, যে শুরু করিয়াছে, অবিষ্কর্তা, মূল, কারিগর। امتداد – প্রবর্ধন, বাড়ানো, দীর্ঘীকরণ,

সুদীর্ঘতা, (এখানে 'বিবর্তন')। تمدن – সামাজিক জীবন, সামাজিকতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, মিলিয়া মিশিয়া থাকিবার নিয়ম। تهذيب – সভ্যতা, ভদ্রতা, শিষ্টতা, পরিমার্জতা, জীবনযাত্রার উৎকর্ষ, তমদ্দুন।

একাদশ হিজরী

নবুওয়ত-সন্ধ্যা

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্ব হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সর্বশেষ কোন্ লশকরটি প্রেরণ করিয়াছিলেন?

উত্তর ঃ উহা ছিল ঐ লশকর যাহার প্রধান ছিলেন হযরত উসামা (রাঃ)। উহাকে জায়েশে উসামা বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ হযরত উসামা (রাঃ) কে ছিলেন এবং তাহার বয়স তখন কত ছিল?

উত্তর ঃ তিনি ছিলেন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাহবুব[১] (প্রিয়) অর্থাৎ– তাঁহার আজাদকৃত গোলাম হযরত যায়েদ বিন হারেছার ছেলে। তখন তাহার বয়স ছিল ১৭।

টীকা

১। হয়ত স্মরণ থাকিবে যে, মূতার যুদ্ধে তাহার পিতা হযরত জায়েদ বিন হারেছাকে সেনাপ্রধান বানানো হইয়াছিল। এই উসামাই মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটের উপর তাঁহার পাশাপাশি সওয়ার ছিলেন। আজ এই উসামাকেই হযরত আবু বকর ছিদ্দিক এবং হযরত ওমরের মত মহান বুজুর্গদের প্রধান বানাইয়া পাঠানো হইতেছে। শুধু ইহাই নহে; বরং তাহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ হইল তাহাকে "মাহবুবে রাসূলুল্লাহ" উপাধি দেওয়া। এই দৃষ্টান্তের পরও কি পৃথিবী ইসলামী সাম্যের কথা স্বীকার করিবে না?

প্রশ্ন ঃ এই লশকর কোথায় পাঠানো হইতেছিল?

উত্তর ঃ সিরিয়ার দিকে।

প্রশ্ন ঃ এই লশকর কবে সিরিয়া পৌছায় এবং কি কারণে বিলম্ব হয়?

উত্তর ঃ এই লশকর মদীনা হইতে রওনা হইয়া কিছুদূর যাওয়ার পরই রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্বর শুরু হয় এবং পরে তিনি ওফাতপ্রাপ্ত হন। সুতরাং এই লশকর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় যাত্রাও করিতে পারেন নাই। পরে হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) উহাকে রওনা করান।

১	২	৩	৪
ক্রঃ নং	গাযওয়া বা সারিয়ার নাম, তারিখ, মাস ও সন।	ইসলামী বাহিনীর প্রধান এবং মদীনার খলীফার নাম (যদি গাযওয়া হইয়া থাকে)।	ইসলামী বাহিনীর সংখ্যা, যুদ্ধের ছামান, পতাকা কার নিকট ছিল?
১	সারিয়ায়ে হযরত হামযা (রাঃ)। রমজা, ১ম হিজরী।	হযরত হামযা (রাঃ)	৩০ জন মোহাজের। হযরত আবু মারছাদ কুরজ বিন হোছাইন গানাবী (রাঃ) পতাকাবাহী ছিলেন।
২	সারিয়ায়ে হযরত ওবায়দা ইবনুল হারেছ (রাঃ)। শাওয়াল ১ম হিজরী।	হযরত ওবায়দা ইবনুল হারেছ (রাঃ)।	৬০ জন মোহাজের। আবদে মানাফের প্রপৌত্র হযরত মাতাহ্ বিন উছাছা পতাকাবাহী ছিলেন।
৩	গাওয়ায়ে আব্ওয়া বা গাযওয়ায়ে ওয়াদ্দান। ছফর, ২য় হিজরী।	স্বয়ং রাসূল (সঃ) বাহিনীপ্রধান ছিলেন। মদীনার খলীফা ছিলেন হযরত ছাআদ বিন ওবাদাহ।	হযরত হামযা (রাঃ) পতাকাবাহী ছিলেন।
৪	গায়ওয়ায়ে বাওয়াত। রবিউল আউয়াল, ২য় হিজরী।	বাহিনীপ্রধান স্বয়ং রাসূল (সঃ)। মদীনার খলীফা ছাআদ বিন মোআজ (রাঃ)।	দুইশত ছাহাবী। হযরত ছাআদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) পতাকাবাহী ছিলেন।

৫	৬	৭	৮
প্রতিপক্ষ কে ছিল? তাহাদের সংখ্যা, বাহিনী প্রধানের নাম এবং যুদ্ধের ছামান।	যুদ্ধের ফলাফল। মুসলমান এবং প্রতিপক্ষের ক্ষতির পরিমাণ।	যুদ্ধের কারণ।	বিশেষ মন্তব্য।
সিরিয়া হইতে ব্যবসার পণ্য লইয়া আগত কোরাইশী কাফেলা। বাহিনী প্রধান– আবু জাহেল। সংখ্যা ৩০০	যুদ্ধ হয় নাই। আপসরফা হইয়া যায়।	উদ্দেশ্য ছিল কোরাইশদের ব্যবসায় বিঘ্ন ঘটানো, যেন তাহাদের জুলুমের শক্তি হ্রাস পায়।	ইহা ইসলামের প্রথম সামরিক দল; যাহারা তলোয়ার দ্বারা যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বাহির হয়।
কোরাইশী কাফের। বাহিনীপ্রধান আবু সুফিয়ান। সংখ্যা– ২০০	যুদ্ধ হয় নাই, তবে তীর বিনিময় হয়।	মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে আবু সুফিয়ান দুইশত মানুষ লইয়া বাত্‌নে রাবেগ নামক স্থানে আসিতেছিল।	হযরত ছাআদ বিন ওয়াক্কাস (রাঃ) তীর নিক্ষেপ করেন। ইহাই ছিল ইসলামের প্রথম তীর।
কোরাইশী কাফেলা।	যুদ্ধ হয় নাই।	উদ্দেশ্য ছিল কোরাইশী কাফেলার উপর আক্রমণ করা।	এই ছফরে রাসূল (সঃ) বনু জামরা গোত্রের সঙ্গে একটি চুক্তি করেন। তাহাদের প্রধান ছিল আমর বিন মাখশী।
কোরাইশী কাফেলা। একশত মানুষ, আনুমানিক দেড় হাজার উট। বাহিনী প্রধান– উমাইয়া বিন খাল্‌ফ।	যুদ্ধ হয় নাই। কাফেলা চলিয়া যায়।	উদ্দেশ্য ছিল কোরাইশী কাফেলার উপর আক্রমণ করা।	

১	২	৩	৪
ক্রঃ নং	গাযওয়া বা সারিয়ার নাম, তারিখ, মাস ও সন।	ইসলামী বাহিনীর প্রধান এবং মদীনার খলীফার নাম (যদি গাযওয়া হইয়া থাকে)।	ইসলামী বাহিনীর সংখ্যা, যুদ্ধের ছামান, পতাকা কার নিকট ছিল?
৫	সরিয়ায়ে আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ (রাঃ) অথবা সারিয়ায়ে নাখলা। রজব, ২য় হিজরী।	হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ (রাঃ)	১২ জন মোহাজের
৬	গাযওয়ায়ে বদরে কোবরা। অর্থাৎ বদরের বড় যুদ্ধ। ১৭ রমজান, শুক্রবার, ২য় হিজরী।	রাসূল (সঃ) হযরত ওসমান বিন আফ্‌ফান (রাঃ)-কে মদীনাতে রাখিয়া আসিলেন। কারণ, রাসূল (সঃ)-এর কন্যা হযরত ওসমানের স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ ছিলেন।	আনাসর ও মোহাজের মিলিয়া মুসলমানদের মোট সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। সমর সম্ভারের মধ্যে ছিল– দুইটি ঘোড়া, সত্তরটি উট এবং কয়েকটি তলোয়ার। বড় পতাকাটি ছিল হযরত মাস্‌আব বিন ওমায়েরের নিকট। আনসারদের পতাকা ছিল হযরত ছাআদ বিন মোআজের নিকট। একটি বড় পতাকা হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট ছিল।

৫	৬	৭	৮
প্রতিপক্ষ কে ছিল? তাহাদের সংখ্যা, বাহিনী প্রধানের নাম এবং যুদ্ধের ছামান।	**যুদ্ধের ফলাফল। মুসলমান এবং প্রতিপক্ষের ক্ষতির পরিমাণ।**	**যুদ্ধের কারণ।**	**বিশেষ মন্তব্য।**
সিরিয়া হইতে আগত কোরাইশী কাফেলা। বাহিনী প্রধান– ওমর বিন হাজরামী এবং আব্দুল্লাহ বিন মুগীরার দুই ছেলে ওসমান ও নওফেল।	মুসলমানদের বিজয় হয়। কাফেরদের ১জন নিহত, দুইজন বন্দী। গনীমতের মাল হস্তগত হয়।	আসলে কোরাইশী কাফেলার সংবাদ লওয়ার জন্য নাখলা নামক স্থানে পাঠানো হইয়াছিল। সেখানে ঘটনাক্রমে যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি হয়।	এই হত্যা, বন্দী এবং গনীমতের মাল ইসলামের প্রথম ঘটনা।
কোরাইশদের সশস্ত্র সৈন্য সংখ্যা ছিল ৯৫০ জন অথবা পূর্ণ এক হাজার। সাতশত উট, এক শত ঘোড়া। বাহিনী প্রধান ছিল আবু জাহেল।	মুসলমানদের বিজয় অর্জিত হয়। ৮ জন আনসার এবং ৬ জন মোহাজের শহীদ হন। এদিকে ৭০ জন কাফের নিহত এবং অপর ৭০ জন বন্দী হয়।	সিরিয়া হইতে আগত আবু সুফিয়ানের কাফেলাকে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই ফৌজ বাহির হইয়াছিল। কিন্তু আবু সুফিয়ান চলিয়া যায় এবং তাহার ইশারায় মক্কা হইতে এক বিশাল বাহিনী মুসলমানদিগকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে বদরে আসিয়া উপস্থিত হয়।	হযরত ওসমান যদিও যুদ্ধে শরীক হইতে পারেন নাই; কিন্তু রাসূল (সঃ) বলিয়াছেনঃ যেহেতু সে আল্লাহর রাসূলের কাজে নিয়োজিত, সুতরাং সে জেহাদের ছাওয়াব পাইবে। বদরের পরাজয়ে কাফেররা অত্যন্ত মর্মাহত হয়। আবু জাহেলসহ তাহাদের সরদারগণ নিহত হয়। ভবিষ্যতে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে এবং আবু সুফিয়ান

১	২	৩	৪
ক্রঃ নং	গাযওয়া বা সারিয়ার নাম, তারিখ, মাস ও সন।	ইসলামী বাহিনীর প্রধান এবং মদীনার খলীফার নাম (যদি গাযওয়া হইয়া থাকে)।	ইসলামী বাহিনীর সংখ্যা, যুদ্ধের ছামান, পতাকা কার নিকট ছিল?
৭	গাযওয়ায়ে বনু কাইনুকা'। শাওয়াল, ২য় হিজরী।	বাহিনীপ্রধান স্বয়ং রাসূল (সঃ)। মদীনার খলীফা হযরত আবু লুবাবা (রাঃ)।	
৮	গাযওয়ায়ে গাত্‌ফান অথবা আম্মার বা জিআমর। রবিউল আউয়াল, ৩য় হিজরী।	বাহিনীপ্রধান স্বয়ং রাসূল (সঃ)। মদীনার খলীফা হযরত ওসমান (রাঃ)।	

৫	৬	৭	৮
প্রতিপক্ষ কে ছিল? তাহাদের সংখ্যা, বাহিনী প্রধানের নাম এবং যুদ্ধের ছামান।	যুদ্ধের ফলাফল। মুসলমান এবং প্রতিপক্ষের ক্ষতির পরিমাণ।	যুদ্ধের কারণ।	বিশেষ মন্তব্য।
			প্রতিশোধ গ্রহণের পূর্বে মাথা ধুইবে না বলিয়া শপথ গ্রহণ করে। মদীনাতে এই যুদ্ধের বিজয়ের সংবাদ এমন সময় আসে, যখন রাসূল (সঃ)-এর কন্যা হযরত রোকাইয়াকে দাফন করিয়া লোকেরা হাতের মাটি পরিষ্কার করিতেছিল।
বনু কাইনুকা' গোত্র– যাহাতে সাতশত যোদ্ধা ছিল।	পনের দিন অবরোধ ছিল। পরে মদীনা হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার শর্তে অবরোধ উঠাইয়া লওয়া হয়।	মুসলমানগণ যখন বদরে যায়, তখন তাহারা মদীনায় বিদ্রোহ করিয়াছিল এবং অধিক ফেতনার আশংকা ছিল।	এই সকল লোকেরা সাধারণতঃ ব্যবসায়ী এবং স্বর্ণকার ছিল।
বনু ছা'লাবা এবং বনু মোহারেব। অস্ত্রসহ ৪৫০ জন আরোহী। বাহিনী প্রধান– দু'ছুর বিন হারেছ মোহারেবী।	শত্রুপক্ষ ভীত হইয়া পাহাড়ে পলায়ন করে।	কোরাইশী ষড়যন্ত্রের ফলে দু'ছুর ইসলামের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে মদীনা আক্রমণ করিয়াছিল।	দু'ছুর বড় বিস্ময়করভাবে মুসলমান হইয়া ফিরিয়া যায়। কিতাবে বিস্তারিত বিবরণ আছে।

১	২	৩	৪
ক্রঃ নং	গাযওয়া বা সারিয়ার নাম, তারিখ, মাস ও সন।	ইসলামী বাহিনীর প্রধান এবং মদীনার খলীফার নাম (যদি গাযওয়া হইয়া থাকে)।	ইসলামী বাহিনীর সংখ্যা, যুদ্ধের ছামান, পতাকা কার নিকট ছিল?
৯	গাযওয়ায়ে ওহোদ। ৬ শাওয়াল, ৩য় হিজরী।	বাহিনীপ্রধান স্বয়ং রাসূল (সঃ)। মদীনার খলীফা হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ)।	মুজাহিদদের সংখ্যা এক হাজার। কিন্তু উহার মধ্য হইতে তিনশত মোনাফেক চলিয়া গেলে সাতশত অবশিষ্ট থাকে। হযরত মাসআব বিন ওমায়ের পতাকাবাহী ছিলেন। ঘোড়া সর্বমোট ৫০টি।
১০	সারিয়ায়ে বীরে মাউনা। ছফর, ৪র্থ হিজরী।	হযরত মুনজির বিন আমর আনসারী।	৭০ জন। রণসম্ভার কিছুই ছিল না।
১১	গাযওয়ায়ে বনু নাজির। রবিউল আউয়াল, ৪র্থ হিজরী।	বাহিনীপ্রধান স্বয়ং রাসূল (সঃ)। মদীনার খলীফা হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ)।	হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট পতাকা ছিল।

৫	৬	৭	৮
প্রতিপক্ষ কে ছিল? তাহাদের সংখ্যা, বাহিনী প্রধানের নাম এবং যুদ্ধের ছামান।	**যুদ্ধের ফলাফল। মুসলমান এবং প্রতিপক্ষের ক্ষতির পরিমাণ।**	**যুদ্ধের কারণ।**	**বিশেষ মন্তব্য।**
কোরাইশী কাফের। বাহিনী প্রধান– আবু সুফিয়ান। সৈন্য সংখ্যা তিন হাজার। সাতশত লৌহবর্ম, দুইশত ঘোড়া এবং তিন হাজার উট।	মুসলমানদের পরাজয় এবং সত্তর জন শহীদ হয়। কাফেরদের পক্ষে ২২ বা ২৩ জন নিহত হয়। তবে কাফেরদের উপর অবশ্যই প্রভাব বিস্তার হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে তাহারা পুনরায় আক্রমণ করিতে সাহস করে নাই।	বদরের প্রতিশোধ গ্রহণ এবং নিজেদের শপথ পূরণ করার উদ্দেশ্যে মক্কার কাফেররা আক্রমণ করিয়াছিল।	হযরত মাসআব বিন ওমায়ের মাহাদাত বরণ করিলে হযরত আলী (রাঃ) পতাকা গ্রহণ করেন।
যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নহে, বরং তাবলীগ করার জন্য 'নজদ' যাইতেছিলেন। পথে আমের, রুউলু এবং উসাইয়্যা গোত্রের লোকেরা আক্রমণ করিয়া সকলকে শহীদ করিয়া দেয়। এক ব্যক্তি আহত হইয়া পড়িয়া ছিলেন, তাহাকেও মৃত মনে করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং পরে তিনি সুস্থ হইয়া মদিনা আসিয়া এই দুর্ঘটনার সংবাদ দেন। ঘটনা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মর্মাহত হন। পরে ঐ গোত্র মুসলমান হইয়া যায়।			
বনু নাজিরের গোত্র। বাহিনী প্রধান– হুইয়াই ইবনে আখতাব।	ছয় দিন অবরোধ করিয়া রাখা হয়। অবশেষে মদীনা ত্যাগ করিতে সম্মত হয় এবং উটের মাধ্যমে বহনযোগ্য ছামান ব্যতীত অন্য সকল ছামান রাখিয়া যাইতে রাজী হয়।	রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করার কারণে।	তাহাদের ভূ-সম্পদ এবং অস্ত্র দখল করা হয়। অস্ত্রের মধ্যে ছিল– ৩৪০ টি তলোয়ার, ৫০টি লৌহবর্ম এবং ৫০টি শিরস্ত্রাণ।

১	২	৩	৪
ক্রঃ নং	**গাযওয়া বা সারিয়ার নাম, তারিখ, মাস ও সন।**	**ইসলামী বাহিনীর প্রধান এবং মদীনার খলীফার নাম (যদি গাযওয়া হইয়া থাকে)।**	**ইসলামী বাহিনীর সংখ্যা, যুদ্ধের ছামান, পতাকা কার নিকট ছিল?**
১২	গাযওয়ায়ে খন্দক বা গাযওয়ায়ে আহ্যাব। জিলকদ, ৫ম হিজরী।	মদীনাতে থাকিয়া যুদ্ধ করা হয়।	তিন হাজার।
১৩	গাযওয়ায়ে বনু কোরাইজা। জিলহজ্ব ৫ম হিজরী।	বাহিনী-প্রধান স্বয়ং রাসূল (সঃ)। মদীনার খলীফা হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ)।	হযরত আলীর নিকট পতাকা ছিল।
১৪	গাযওয়ায়ে হোদায়বিয়া। জিলকদ, ৬ষ্ঠ হিজরী।	বাহিনীপ্রধান স্বয়ং রাসূল (সঃ)।	মুসলমানদের সংখ্যা ১৪০০ কিন্তু যুদ্ধের

৫	৬	৭	৮
প্রতিপক্ষ কে ছিল? তাহাদের সংখ্যা, বাহিনী প্রধানের নাম এবং যুদ্ধের ছামান।	**যুদ্ধের ফলাফল। মুসলমান এবং প্রতিপক্ষের ক্ষতির পরিমাণ।**	**যুদ্ধের কারণ।**	**বিশেষ মন্তব্য।**
গোটা আরবের মোশরেক এবং ইহুদীদের বড় জামায়াত– বনু কোরাইজার ইহুদী। সৈন্য সংখ্যা আনুমানিক ১৫ হাজার। বাহিনী প্রধান– আবু সুফিয়ান।	মামুলী ধরনের তীর বিনিময় ও তলোয়ার চালনা হয়। মুসলিম পক্ষে ৬ জন শহীদ এবং ১০ জন কাফের প্রাণ হারায়। ১৫ দিন পর ব্যর্থকাম হইয়া তাহারা ফিরিয়া যায়।	গোটা আরবের ইহুদী ও মোশরেকেরা সম্মিলিত আক্রমণের মাধ্যমে ইসলামের মূলোৎপাটন করিতে চাহিয়াছিল।	হযরত সালমান ফারসীর মতামত অনুযায়ী মদীনার চতুর্দিকে পরিখা খনন করা হয়।
বুন কোরাইজার গোত্র। বাহিনী প্রধান– কাআব বিন আসাদ।	২৫ দিন অবরোধ করিয়া রাখা হয়। ৪০০ হত্যা এবং ২০০ বন্দী করা হয়।	খন্দকের যুদ্ধের সময় চুক্তি ভঙ্গ করিয়া মক্কার কাফেরদের দলে ভিড়িয়া গিয়াছিল।	বনু কোরাইজার ইহুদীরা নিজেদের এবং রাসূল (সঃ)-এর বিষয়টি হযরত সাআ'দ বিন মোআ'জের উপর সোপর্দ করিলে তিনি ইহুদীদের ধর্ম অনুযায়ী ফায়সালা করেন যে, যুদ্ধ করিতে সক্ষম ব্যক্তিদের প্রাণদণ্ড, নারী ও শিশুরা বন্দী এবং সম্পদ রাজেয়াপ্ত।
			রাসূল (সঃ) কাবা ঘর জেয়ারত

১	২	৩	৪
ক্রঃ নং	গাযওয়া বা সারিয়ার নাম, তারিখ, মাস ও সন।	ইসলামী বাহিনীর প্রধান এবং মদীনার খলীফার নাম (যদি গাযওয়া হইয়া থাকে)।	ইসলামী বাহিনীর সংখ্যা, যুদ্ধের ছামান, পতাকা কার নিকট ছিল?
			পরিকল্পনা না থাকায় কোন সরঞ্জামও ছিল না।
১৫	গাযওয়ায়ে খায়বর। মোহররম, ৭ম হিজরী।	বাহিনীপ্রধান স্বয়ং রাসূল (সঃ)। মদীনার খলীফা হযরত সিবা বিন আবী উরফাতা (রাঃ)।	১৪০০ অথবা ১৬০০। হযরত আলী (রাঃ) পতাকাবাহী ছিলেন।
১৬	গাযওয়ায়ে মূতা। জুমাদাল উলা, ৮ম হিজরী।	হযরত জায়েদ ইবনুল হারেছ (রাঃ)।	তিন হাজার মুসলমান। পতাকা ছিল হযরত জায়েদ ইবনুল হারেছের

৫	৬	৭	৮
প্রতিপক্ষ কে ছিল? তাহাদের সংখ্যা, বাহিনী প্রধানের নাম এবং যুদ্ধের ছামান।	যুদ্ধের ফলাফল। মুসলমান এবং প্রতিপক্ষের ক্ষতির পরিমাণ।	যুদ্ধের কারণ।	বিশেষ মন্তব্য।
			করিতে গিয়াছিলেন। কাফেররা অনুমতি দেয় নাই; তবে ১০ বৎসর মেয়াদী পরস্পর একটি চুক্তি হয়।
খায়বরের ইহুদী সম্প্রদায়। কেনানা বিন আবী হাকীক ইত্যাদি প্রধান ছিল।	মুসলমানদের বিজয় হয় এবং সকল দুর্গ ইত্যাদি দখলে আসে। ৯৩ জন কাফের নিহত এবং ১৮ জন মুসলমান শহীদ হয়। আহত–৫	ইহুদীরা মদীনা হইতে উচ্ছেদ হইয়া খায়বরকে নিজেদের ষড়যন্ত্রের আখড়া বানাইয়াছিল।	হযরত আলী খায়বরের সেই ফটক একা উঠাইয়া নিক্ষেপ করেন যাহা সত্তর জনেও উত্তোলন করিতে পারে নাই। ইহুদীদিগকে এই শর্তে খায়বরে নিরাপদে থাকিতে দেওয়া হয় যে মুসলমানগণ যখনই ইচ্ছা করিবেন তখনই চলিয়া যাইতে হইবে। তবে এই অন্তবর্তীকালীন সময়ে উৎপন্ন ফসলের একটি অংশ মুসলমানদিগকে দিতে হইবে।
গাচ্ছানী খৃষ্টান এবং কাফের। বাহিনী প্রধান ছিল শারজিল	মুসলমানদের বিজয় হয়। ১২ জন শাহাদাত বরণ করে	বসরার শাসক শারজিল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি	রাসূল (সঃ) এই বাহিনীর ৩ জনের নাম নির্দিষ্ট করিয়া

১	২	৩	৪
ক্রঃ নং	গাযওয়া বা সারিয়ার নাম, তারিখ, মাস ও সন।	ইসলামী বাহিনীর প্রধান এবং মদীনার খলীফার নাম (যদি গাযওয়া হইয়া থাকে)।	ইসলামী বাহিনীর সংখ্যা, যুদ্ধের ছামান, পতাকা কার নিকট ছিল?
			নিকট। অতঃপর হযরত জাফর এবং তাহার পর হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার নিকট। সবশেষে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ পতাকা গ্রহণ করেন।
১৭	মক্কা বিজয়। রমজান, ৮ম হিজরী।	বাহিনীপ্রধান স্বয়ং রাসূল (সঃ)। মদীনার খলীফা আবু রুহ্‌ম কুলছুম বিন হোসাইন গেফারী অথবা হযরত আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম (রাঃ)।	১০ হাজার মুসলমান পতাকা ছিল একাধিক।
১৮	গাযওয়ায়ে হোনাইন। আওসাত অথবা হাওয়াযিন। শাওয়াল, ৮ম হিজরী।	বাহিনীপ্রধান স্বয়ং রাসূল (সঃ)। মদীনার খলীফা আবু রুহ্‌ম কুলছুম বিন হোসাইন গেফারী অথবা হযরত আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম (রাঃ)।	১২ হাজার।

৫	৬	৭	৮
প্রতিপক্ষ কে ছিল? তাহাদের সংখ্যা, বাহিনী প্রধানের নাম এবং যুদ্ধের ছামান।	যুদ্ধের ফলাফল। মুসলমান এবং প্রতিপক্ষের ক্ষতির পরিমাণ।	যুদ্ধের কারণ।	বিশেষ মন্তব্য।
গাচ্ছানী এবং তাহাদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হইতে দেড় লাখ।	এবং অবশিষ্টরা নিরাপদে চলিয়া আসিতে সক্ষম হয়। সংঘর্ষে কাফেরদের উপর মুসলমানদের প্রভাব বিস্তার হয়।	ওয়াসাল্লামের দূত হযরত হারেছ বিন ওমায়েরকে হত্যা করিয়াছিল।	বলিয়াছিলেনঃ প্রয়োজনে একের পর এক তাহারা পতাকা গ্রহণ করিবে। পরে পর পর তিনজনেই শাহাদাত বরণ করিলে হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ পতাকা গ্রহণ করেন।
মক্কার কাফের সম্প্রদায়।	যুদ্ধ হয় নাই। শুধু একটি বাহিনীর সঙ্গে মামুলী ধরনের সংঘর্ষ হয়। তাহাতে ২ জন মুসলমান শহীদ এবং ২৭ বা ২৮ জন কাফের নিহত হয়।	মক্কার কাফেররা ৬ষ্ঠ হিজরীতে হোনাইনে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছিল।	মক্কার সেইসকল অধিবাসী যাহারা আজীবন হত্যাযোগ্য অপরাধী ছিল, রাসূল (সঃ) তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া ঘোষণা করিলেনঃ অতীতে যাহা হইয়াছে তাহা আজ বিস্মৃত।
হাওয়াযিন, ছাকিফ ইত্যাদি গোত্রের সকল মানুষ। বাহিনী। প্রধান মালিক বিন আউফ নাফারী।	মুসলমানদের বিজয় হয়। ছয় সহস্রাধিক বন্দী, বহু সম্পদ হস্তগত এবং ৭১ জন কাফের নিহত হয়। সর্বমোট ছয়	মক্কা বিজয়ের কারণে তাহাদের মধ্যে আত্মগ্লানী পয়দা হয় এবং এই কারণেই উজ্জিত হইয়া মুসলমানদের	যুদ্ধের জন্য এমন ভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করে যে, নারী, শিশু এবং যাবতীয় সম্পদ লইয়া ময়দানে হাজির হয়। পরে উহা

১	২	৩	৪
ক্রঃ নং	**গাযওয়া বা সারিয়ার নাম, তারিখ, মাস ও সন।**	**ইসলামী বাহিনীর প্রধান এবং মদীনার খলীফার নাম (যদি গাযওয়া হইয়া থাকে)।**	**ইসলামী বাহিনীর সংখ্যা, যুদ্ধের ছামান, পতাকা কার নিকট ছিল?**
১৯	গাযওয়ায়ে তায়েফ। শাওয়াল, ৮ম হিজরী।	বাহিনীপ্রধান স্বয়ং রাসূল (সঃ)। মদীনার খলীফা আবু রুহ্‌ম কুলছুম বিন হোসাইন গেফারী অথবা হযরত আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম (রাঃ)।	১২ হাজার।
২০	গাযওয়ায়ে তবুক। রজব, ৯ম হিজরী।	বাহিনীপ্রধান স্বয়ং রাসূল (সঃ)। মদীনার খলীফা মোহাম্মদ বিন মাসলামা আনসারী (রাঃ)। শিশু-সন্তানদের দেখা-শোনার দায়িত্ব দেওয়া হয় হযরত আলী (রাঃ)-কে।	৩০ হাজার মুসলমান। ১০ হাজার ঘোড়া।

৫	৬	৭	৮
প্রতিপক্ষ কে ছিল? তাহাদের সংখ্যা, বাহিনী প্রধানের নাম এবং যুদ্ধের ছামান।	**যুদ্ধের ফলাফল। মুসলমান এবং প্রতিপক্ষের ক্ষতির পরিমাণ।**	**যুদ্ধের কারণ।**	**বিশেষ মন্তব্য।**
	জন মুসলমান শহীদ হয়।	উপর আক্রমণ করিয়া বসে।	মুসলমানদের হস্তগত হয়। উহার মধ্যে ২৪ হাজার উট, ৪০ হাজার কবরী এবং ৪০ হাজার টাকা মূল্যের রূপা ছিল।
বনু ছাকিফ ইত্যাদি। বাহিনী প্রধান– উরওয়াহ বিন মাসউদ ইত্যাদি।	দুর্গে আবদ্ধ হইয়া গেলে ১ মাস অবরোধ করিয়া রাখা হয়। পরে রাসূল (সঃ) ফিরিয়া যান।	হোনাইনের পলাতকরা শক্তি সঞ্চয় করিয়া এখানে আগমন করিয়াছিল।	ক্ষেপণাস্ত্র (হস্ত চালিত) ব্যবহার করা হয়। উহা যেন সেই যুগের কামান ছিল।
রোমের হিরাক্লিয়াস ও কায়ছার।	যুদ্ধ হয় নাই। প্রতিপক্ষের সৈন্য ফিরিয়া যায়। তবে তাহাদের উপর খুব প্রভাব পড়িয়াছিল।	এমন সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল যে, মূতার যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হিরাক্লিয়াস প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছে।	মুসলমানরা বেশ অভাবগ্রস্ত ছিল। এই কারণে ইহাকে অভাবের গাযওয়াও বলা হয়। চাঁদার মাধ্যমে যুদ্ধের ছামান সংগ্রহ করা হয়। এই ক্ষেত্রে মুসলমানগণ এক বিরল আগ্রহের পরিচয় দেন।

রাসূল (সঃ)-এর ওফাত

নবুওয়ত-সূর্য দৃষ্টির অন্তরালে

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবে অসুস্থ হন?

উত্তর ঃ ১১ হিজরীর ২৯শে ছফর, রোজ মঙ্গলবার, ২৬শে মে ৬৩২ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্ন ঃ কি রোগ হইয়াছি?

উত্তর ঃ প্রথমে মাথা ব্যথা শুরু হইয়া পরে শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড জ্বর ছিল। জ্বরের মাত্রা এত অধিক ছিল যে, এইরূপ আর কাহাকেও দেখা যায় নাই।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত দিন অসুস্থ ছিলেন?

উত্তর ঃ ১৩ দিন।

প্রশ্ন ঃ পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে পড়িতে পারেন নাই?

উত্তর ঃ ১৭ ওয়াক্ত।

প্রশ্ন ঃ ঐসকল নামাজ কে পড়ান?

উত্তর ঃ হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ)।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সময় প্রথম বয়ানটি কি কারণে করেন?

উত্তর ঃ আনসারদের সান্ত্বনার জন্য।

প্রশ্ন ঃ উহার পরিস্থিতি কি ছিল এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর হইতে কি উপায়ে মসজিদে গমন করেন?

উত্তর ঃ হযরত ছিদ্দিকে আকবর এবং হযরত আব্বাস (রাঃ) দেখিতে পাইলেন, আনসারগণ বসিয়া কান্না করিতেছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিলেন, (পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) মজলিশের ঐ প্রদীপের কথা স্মরণ হইতেছে, আমরা যাহার পতঙ্গ ছিলাম।

হযরত আব্বাস (রাঃ) খেদমতে হাজির হইয়া আনসারদের মনোবেদনা সম্পর্কে অবহিত করিলেন। প্রিয় উম্মতের রূহানী পিতা স্বীয় নয়নমণি ও রূহানী সন্তানদের মনোকষ্ট কখন সহ্য হইত? (অর্থাৎ কখনো সহ্য হইত না)। যদিও হাঁটিতে কষ্ট হইতেছিল, তবুও হযরত আব্বাসের ছেলে হযরত ফজল এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর কাঁধে হাত রাখিয়া মসজিদে তাশরীফ লইয়া গেলেন। হযরত আব্বাস আগে আগে (হাঁটিতে) ছিলেন। মসজিদে গমন করিয়া রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের প্রথম ধাপেই উপবেশন করিলেন। অতঃপর একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। আফ্সোস! ইহাই ছিল তাঁহার শেষ বৈঠক।

প্রশ্ন ঃ ঐ ভাষণে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এরশাদ করেন?

উত্তর ঃ উহার সারসংক্ষেপ ছিল এই– আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আমার ওফাতের কল্পনায় আপনারা শঙ্কিত। আমার পূর্বে পৃথিবীর কোন নবী-রাসূল কি নিজের উম্মতের মধ্যে চির দিন অবস্থান করিয়াছেন? সেই (বিদায়ের) সময় অবশ্যই আসিবে এবং এইভাবে আপনারাও দুনিয়া ত্যাগ করিবেন এবং শীঘ্রই আমার সঙ্গে মিলিত হইবেন। আমাদের মিলনের জায়গা হইবে হাউজে কাউছার। যেই ব্যক্তি উহা দ্বারা তৃপ্ত হইতে চায়, সে যেন নিজের হাত ও মুখকে অর্থহীন এবং অপ্রয়োজনীয় কাজ হইতে বিরত রাখে। (আনসারদিগকে লক্ষ্য করিয়া) আপনারা মোহাজেরদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিবেন এবং মোহাজেরদেরও কর্তব্য হইল (আনসারদের সঙ্গে) আন্তরিক আরচরণ করা।

মানুষ যদি ভাল হয় তবে তাহাদের বাদশাহ্ ও শাসকও ভাল হয়। আর অন্যায় পথ অবলম্বন করিলে আল্লাহ পাক তাহাদের উপর জালেম শাসক চাপাইয়া দেন।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার পর পুনরায় (বাহিরে) তাশরীফ আনিয়াছিলেন কি? তখন কি করিয়াছিলেন?

উত্তর ঃ তিনি আরেকবার দর্শন দান করিয়া (সকলকে) ধন্য করেন।

তিনি বসিয়া নামাজ পড়ান এবং হযরত ছিদ্দিকে আকবর তাঁহার বরাবর কিছু পিছনে দাঁড়াইয়াছিলেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর বলিতেন এবং হযরত ছিদ্দিকে আকবর উহা উচ্চ স্বরে সকলের নিকট পৌঁছাইতেছিলেন। নামাজ শেষে তিনি বসিয়া বসিয়া কিছু নসীহত করেন। আফ্‌সোস! ইহাই ছিল তাঁহার সর্বশেষ বহির্গমন।

নসীহত প্রসঙ্গে তিনি এরশাদ করেনঃ আমার সবচাইতে উপকারকারী হইল আবু বকর। আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহাকেও যদি আমি 'খলীল' (বা একান্ত বন্ধু) বানাইতাম তবে সে আবু বকরই হইত। (কিন্তু মানুষের জন্য আল্লাহ পাকের ন্যায় খলীল বা সত্যিকার বন্ধু আর কেহ হইতে পারে না, সুতরাং) এখন সে আমার ভাই ও বন্ধু।

আরো এরশাদ হইলঃ আবু বকরের (ঘর সংলগ্ন) দরওয়াজা ব্যতীত এই মসজিদের অন্য সকল দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন চিকিৎসা গ্রহণ করিয়াছিলেন কি-না এবং উহা কি চিকিৎসা ছিল?

উত্তর ঃ জ্বরের মাত্রা বৃদ্ধির সময় কয়েকবার গোসল করেন। যেন পানির মাধ্যমে তিনি চিকিৎসা গ্রহণ করেন। তবে কিছু ঔষধও ব্যবহার করানো হয়।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নশ্বর পৃথিবী হইতে কি বারে এবং কোন সময় বিদায় গ্রহণ করেন?

উত্তর ঃ ১২ই রবিউল আউয়াল, ৮ই জুন ৬৩২ খৃষ্টাব্দ রোজ সোমবার, দ্বিপ্রহরে।

প্রশ্ন ঃ অন্তিম সময়ে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করিতেছিলেন?

উত্তর ঃ তাঁহার নিকট একটি পানির পেয়ালা ছিল। উহাতে হাত চুবাইয়া মুখ মুছিতেছিলেন। জবান মোবারকে তখন এই দোয়া জারী ছিল—

اللهم اعنى على سكرات الموت

অর্থঃ আয় আল্লাহ! মৃত্যুযন্ত্রণায় আমাকে সাহায্য কর।

ওফাতের কিছুক্ষণ পূর্বে মেসওয়াক করেন এবং নিম্নের দোয়া পাঠ করিতে করিতে পৃথিবীর দৃশ্যপট হইতে অদৃশ্য হইয়া যানঃ

اللهم بالرفيق الاعلى

অর্থঃ আয় আল্লাহ! আমি সবচাইতে উপকারী বন্ধুকেই পছন্দ করি।

انا لله و انا اليه راجعون

يا رب صل وسلم دائما ابدا + على حبيبك خير خلق كلهم

প্রশ্ন ঃ ওফাতের সময় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাটের উপর কে বসা ছিলেন?

উত্তর ঃ মোহ্তারামা হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ)।

প্রশ্ন ঃ ওফাতের সময় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মোবারক কি দ্বারা আবৃত করা হয়?

উত্তর ঃ উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ একটি হিবরাহ্ অর্থাৎ চাদর দ্বারা ঢাকিয়া দেন। ইহাও বর্ণিত আছে যে, ফেরেস্তাগণ ঐ চাদর দ্বারা আবৃত করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন ঃ ওফাতের সংবাদে ছাহাবীগণের উপর কি প্রভাব পড়ে।

উত্তর ঃ মূর্ছা এবং আত্মহারা অবস্থা ছড়াইয়া পড়ে। এমনকি হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) ওফাতের কথা বিশ্বাসই করিতে পারেন নাই। হযরত ওসমান (রাঃ) নির্বাক হইয়া যান এবং হযরত আলী (রাঃ) কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া যেন একেবারেই স্তব্ধ হইয়া যান।

প্রশ্ন ঃ এই সময় কোন্ কোন্ মহান ব্যক্তি সর্বাধিক ধৈর্য ধারণ করিয়াছিলেন?

উত্তর ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) এবং আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ)।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স কত হইয়াছিল?

উত্তর ঃ চান্দ্র মাস হিসাবে ৬৩ বৎসর ৩ দিন।

প্রশ্ন ঃ ইন্তেকালের সময় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিধানে কি ধরনের ও কি কি কাপড় ছিল?

উত্তর ঃ দুইটি কাপড়। একটি চাদর এবং একটি লুঙ্গি। এই দুইটি কাপড়ই মোটা এবং উহার বিভিন্ন স্থানে তালি লাগানো ছিল।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিভাবে গোসল দেওয়া হয়?

উত্তর ঃ কাপড় না খুলিয়াই দেহ মোবারকে পানি ঢালিয়া কাপড়ের উপর হইতেই হাত মলিয়া দেওয়া হয়।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কে কে গোসল দান করেন?

উত্তর ঃ হযরত আব্বাস এবং তাঁহার দুই ছেলে ফজল ও কাছাম, হযরত আলী, হযরত উছামা এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজাদকৃত গোলাম হযরত শাকরান রাজিয়াল্লাহু আনহুম আজমায়ীন।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফনে কি রঙ্গের কি কি কাপড় ছিল?

উত্তর ঃ সাদা রং এর তিনটি কাপড় ছিল। তহবন্দ, জামা ও চাদর।

প্রশ্ন ঃ ঐ কাপড় কোথাকার তৈরী ছিল?

উত্তর ঃ ইয়ামানের ছাহুল শহরের।

প্রশ্ন ঃ সেলাই করা ছিল, না সেলাই বিহীন?

উত্তর ঃ সেলাই ছাড়াই জড়াইয়া দেওয়া হয়।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ কে পড়ান।

উত্তর ঃ কেহই নহে। বরং একাকী পড়া হয় এবং কেহই ইমাম হয় নাই। উহার ছুরত ছিল এইঃ জানাজা মোবারক হুজরার ভিতরে রক্ষিত ছিল, দশ জন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া ছালাম ও নামাজ পড়িত এবং পরে একই নিয়মে অন্য দশজন যাইত।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর কোথায় প্রস্তুত হয়?

উত্তর ঃ হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ)-এর হুজরায়, যেখানে তিনি ওফাতপ্রাপ্ত হন।

প্রশ্ন ঃ কবর সেখানে কেন বানানো হয়?

উত্তর ঃ আম্বিয়া আলাইহিমুস্‌সালামগণ সম্পর্কে ইহাই নিয়ম যে, তাঁহারা যেখানে ওফাতপ্রাপ্ত হন, সেখানেই দাফন করা হয়।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর বগলী হয়, না সিন্দুক কবর?

উত্তর ঃ বগলী।

প্রশ্ন ঃ তাঁহার কবরে কিসের গাঁথুনী স্থাপন করা হয়?

উত্তর ঃ কাঁচা ইটের।

প্রশ্ন ঃ কয়টি ইট লাগানো হয়?

উত্তর ঃ নয়টি।

প্রশ্ন ঃ কবে দাফন করা হয়?

উত্তর ঃ ওফাতের দেড় দিন পর মঙ্গল ও বুধবারের মধ্যবর্তী রাতে।

প্রশ্ন ঃ কবর মোবারক জমিনের সঙ্গে মিশানো, না কিছুটা উঁচু। উটের পিঠের মত, না অন্য কোন ধরনের?

উত্তর ঃ এক বিঘত উঁচু উটের পিঠের মত।

প্রশ্ন ঃ কাঁচা না পাকা?

উত্তর ঃ কাঁচা।

প্রশ্ন ঃ ঐ হুজরাতে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আর কে কে সমাহিত?

উত্তর ঃ ছিদ্দিকাইন। অর্থাৎ ছিদ্দিকে আকবর এবং ফারূকে আজম (রাঃ)।

প্রশ্ন ঃ সেখানে আরো জায়গা অবশিষ্ট আছে কি?

উত্তর ঃ একটি কবরের জায়গা অবশিষ্ট আছে।

প্রশ্ন ঃ উহাতে কে সমাহিত হইবেন?

উত্তর ঃ হযরত ঈসা (আঃ)– যিনি এখন জীবিত আছেন এবং আল্লাহ পাকের হুকুমে আকাশে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। আল্লাহর হুকুমে তিনি দাজ্জালের যুগে জমিনে অবতরণ করিবেন। পরে ওফাতপ্রাপ্ত হইয়া ঐ খালি স্থানে সমাহিত হইবেন।

শব্দার্থ ঃ

(মূল উর্দূ কিতাবের পাঠকদের জন্য)

اوجهل – আড়াল, পর্দা, হেজাব, গোপন, অদৃশ্য, অন্তরাল। تصور – কল্পনা, ধ্যাণ, ভাবনা, চিন্তা, মোরাকাবা, অন্তরে কোন বস্তুর ছবি অঙ্কন করা। خليل – অকৃত্রিম বন্ধু। খলীল বলা হয় এমন বন্ধুকে যাহার ভালবাসায় অপর কাহারো বিষয় কল্পনা করারও অবকাশ হয় না। فانى – নশ্বর, নাশশীল, অনিত্য, অস্থায়ী, মরণশীল, ধ্বংসশীল, অতি বৃদ্ধ। ششدر – হতভম্ব, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, স্তব্ধ, হয়রান, পেরেশান, ছয় দরওয়াজার ঘর। ضبط – বাধা, দমন, নিয়ন্ত্রণ, ধৈর্য ধারণ, বাজেয়াপ্ত করণ, পুনরুদ্ধার, দখল, দেখাশোনা, রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থা, বন্দোবস্ত, হেফাজত, বন্দী, ক্রোক।

এক নজরে পূর্ণাঙ্গ সীরাত মোবারক

(সন-তারিখসহ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ এবং উহার আসবাব)

পবিত্র জন্ম

৯ই রবিউল আউয়াল সোমবার, মোতাবেক ২০শে এপ্রিল ৫৭১ খৃষ্টাব্দ। সময়ঃ সকাল সূর্যোদয়ের পূর্বে।

সম্মানিত পিতা

পিতার নাম আব্দুল্লাহ। তাঁহার বংশ পরম্পরা এইঃ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মোত্তালেব বিন হাশেম বিন আব্দে মানাফ বিন কুসাই বিন কিলাব। তিনি ২৪ বৎসর বয়স পান। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের দুই মাস পূর্বে সিরিয়ার ছফর হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় মদীনায় (মাতুলালয়ে) কিছুদিনের জন্য যাত্রাবিরতি করেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন।

সম্মানিতা মাতা

মাতার নাম আমেনা। তাঁহার বংশ পরম্পরা এইঃ আমেনা বিন্‌তে ওহাব বিন আব্‌দে মানাফ বিন জোহরা বিন কিলাব। মদীনা হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় আবওয়া নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। তখন এই একক মোতি মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বয়স ছিল ছয় বৎসর।

দুধ-মাতা

কয়েকদিন ছুআইবা তাঁহাকে দুধ পান করান। পরে হযরত হালীমা ছা'দিয়া এই সম্পদ লাভ করেন।

অভিভাবক

সম্মানিতা মাতার ইন্তেকালের পর তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত স্বীয় দাদা খাজা আব্‌দুল মোত্তালেবের তত্ত্বাবধানে থাকেন। দাদার ইন্তেকালের পর চাচা খাজা আবু তালেব তাঁহার দেখা-শোনা করেন।

বিবাহ

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন ২৫ বৎসর, তখন খাদীজা নাম্নী, মক্কার এক সম্ভ্রান্ত খান্দানের বিধবা মহিলা বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। ইতিপূর্বেই এই মহিলার দুই দুইটি বিবাহ হইয়াছিল এবং তিনি কয়েকজন সন্তানের জননী ছিলেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। হযরত খাদীজা ছিলেন এক বিত্তবান মহিলা। এই (পাত্র) নির্বাচনের মাধ্যমেই তিনি স্বীয় বুদ্ধিমত্তা, পবিত্র অন্তকরণ ও পরহেজগারীর স্বাক্ষর রাখেন।

সন্তানাদি

হযরত খাদীজার গর্ভে কাসেম ও তাহের নামে দুইটি ছেলে-সন্তান জন্মগ্রহণ করেন এবং শৈশবেই তাহারা ইন্তেকাল করেন। জয়নব, কুলছুম, রোকাইয়া ও ফাতেমা- এই চার কন্যা-সন্তান বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে বিবাহের পর তাহারা ইন্তেকাল করেন। ইবরাহীম নামে হযরত মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে অপর একটি ছেলে-সন্তান জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনিও শৈশবেই ইন্তেকাল করেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় কন্যাদের মধ্যে একমাত্র হযরত ফাতেমা জীবিত ছিলেন। তাঁহার দুই ছেলে হযরত হাছান-হোছাইনের মাধ্যমে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের ধারা জারী হয়।

নবুওয়তের কিছু পূর্বে

নবুওয়তের পূর্বে বিবাহ্-শাদী এবং ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যস্ততাও ছিল এবং সেই সঙ্গে তাঁহার উপর আল্লাহর স্মরণের প্রাবল্যও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। অবশেষে তিনি নির্জনতা পছন্দ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার এই নিয়ম হইয়া গেল যে, তিনি কিছু নাস্তা (ছাতু) পানি সঙ্গে লইয়া হেরা পর্বতে চলিয়া যাইতেন এবং সেখানেই আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন থাকিতেন। অধিকাংশ সময় এইরূপ হইত যে, হযরত খাদীজার স্মরণ হইত, তাঁহার নাস্তা হয়ত শেষ হইয়া গিয়াছে। পরে তিনি নিজে গিয়া ছাতু ও পানি ইত্যাদি দিয়া আসিতেন।

নবুওয়ত ঃ চাঁদের হিসাবে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স মোবারক যখন চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইয়া এক চল্লিশ বৎসর শুরু হয়, তখন ৯ই রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১২ই ফেব্রুয়ারী ৬১০ খৃষ্টাব্দ রোজ সোমবার তিনি নবুওয়ত লাভ করেন এবং

সূরা 'ইকরা'-এর প্রথম কয়টি আয়াত (عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত) তাঁহার উপর নাজিল হয়। ঐ সময় তিনি হেরা পর্বতের সেই নির্জনবাস গুহায় ছিলেন, যেই স্থান হইতে খানায়ে কা'বা স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়।

সর্বপ্রথম মুসলমান

আজাদ পুরুষদের মধ্যে হযরত আবু বকর ছিদ্দিক, আজাদ নারীদের মধ্যে হযরত খাদীজা, বুদ্ধিমান ছেলেদের মধ্যে হযরত আলী, গোলামদের মধ্যে হযরত জায়েদ বিন হারেছা এবং দাসীদের মধ্যে হযরত উম্মে য়ামন রাজিয়াল্লাহু আনহুম (সর্বপ্রথম মুসলমান হন)।

প্রতিরোধ ও নির্যাতন

মক্কার অধিবাসীরা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাবলীগ ও আত্মশুদ্ধি (কার্যক্রমের) কঠোর বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। (এই ক্ষেত্রে তাহারা) সকল দিক হইতে পথ রুদ্ধ করিয়া দেয় এবং ইসলাম গ্রহণকারীদিগকে বিবিধ উপায়ে কষ্ট দেয়। এমনকি (তাহাদের নির্যাতনে) কতিপয় মুসলমান শাহাদাতও বরণ করেন এবং যাহারা জীবিত ছিলেন তাহাদের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। এই পর্যায়ে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দেন যে, যেই সকল মুসলমান (কাফেরদের নির্যাতনে) অপারগ এবং অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা ইচ্ছা করিলে মক্কা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় লইতে পারে। সুতরাং (এই পর্যায়ে) আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত শুরু হয়।

আবিসিনিয়ায় হিজরত

নবুওয়তের পঞ্চম বর্ষে প্রথমবার ১১ জন পুরুষ এবং ৫ জন মহিলা মক্কা ত্যাগ করিয়া আবিসিনিয়া যাইতে হয়। পরে তাহারা একটি মিথ্যা গুজবের ভিত্তিতে কয়েক মাস পরই ফিরিয়া আসে। পরবর্তীতে নবুওয়তের সপ্তম বৎসর ৮৩ জন পুরুষ এবং ১৮ জন মহিলা মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া আবিসিনিয়া হিজরত করিতে হয়। মক্কার কাফেররা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। কিন্তু আবিসিনিয়ার বাদশাহ আসহামা (উপাধি নাজ্জাশী)-কে মুসলমানগণ যখন ইসলামের হাকীকত বুঝাইল, তখন তিনি নিজে মুসলমান হইয়া তাহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া গেলেন।

বয়কট এবং আবু তালেব উপত্যকায় অবস্থান

মুসলমানদিগকে অতিষ্ঠ করা এবং কষ্ট দেওয়ার একটি অবস্থা এই ছিল যে, মক্কার সকল অধিবাসী ঐক্যবদ্ধ হইয়া রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার সাহায্যকারীদিগকে পরিপূর্ণরূপে বয়কট করিয়া বসিল। এমনকি তাহাদের সঙ্গে যাবতীয় লেনদেন বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে অনাহারে মারিবার অঙ্গীকার করিল। পরে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার সঙ্গীগণ বাধ্য হইয়া "আবু তালেব উপত্যকা" নামে নিজেদের এক খান্দানী ভূমিতে গিয়া আশ্রয় লইলেন। উহা ছিল পাহাড়ের একটি ঘাটি। নবুওয়তের সপ্তম বৎসর (আনুমানিক মোহররম মাসে) এই বয়কট শুরু হয় এবং তিন বৎসর পর্যন্ত এই অবরোধ বলবৎ থাকে। (এই সময় মুসলমানগণ) বাবলা গাছের পাতা, ডগা, উহার ফল, শিকড় কিংবা কোন শিকার পাইলে উহা দ্বারা দিনগুজরান করিয়াছেন।

যখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বয়স ৫০ বৎসর হয় তখন এই বয়কট শেষ হয়। ঐ বৎসরই হযরত খাদীজা এবং খাজা আবু তালেব ইন্তেকাল করেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ বৎসরটির নাম রাখেন "শোকের বৎসর"।

তায়েফ ছফর

খাজা আবু তালেব যদিও মুসলমান ছিলেন না, কিন্তু তিনি আশৈশব রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভিভাবক ছিলেন এবং তাঁহার উন্নত চরিত্র ও সৎস্বভাবের কথা স্বীকার করিতেন। আর জীবনভর তাঁহার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন।

আবু তালেব যেহেতু কোরাইশের সরদার ছিলেন এবং লোকেরা তাহাকে মান্য করিত, এই কারণে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও কিছুটা নিরাপত্তা ছিল। তা ছাড়া হযরত খাদীজার বংশীয় গৌরব ও ব্যক্তিত্বও তাঁহার নিরাপত্তার কারণ ছিল। কিন্তু এই দুই জনের ইন্তেকালের পর কোরাইশরা স্বাধীনভাবে তাঁহাকে কষ্ট দিতে লাগিল। পরে তিনি তায়েফ অঞ্চলকে দ্বীন প্রচারের কেন্দ্র বানাইবার ইচ্ছা পোষণ করিলেন। কিন্তু তথাকার লোকেরা মক্কার অধিবাসীদের চাইতেও আরো নির্মম আচরণ করিল। পরে তিনি আরো কয়েকটি জনপদে তাশরীফ লইয়া গেলেন, কিন্তু তথাকার লোকেরাও তাঁহার কদর করিল না। বরং আরো অধিক কষ্ট দিল।

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসিমুখে সেইসকল কষ্ট বরদাশ্ত করিয়া লইলেন এবং বদদোয়ার পরিবর্তে তাহাদের জন্য কল্যাণের দোয়া করিলেন যে, তাহারা অবুঝ– আমাকে চিনে না। তাহাদের ব্যাপারে নিরাশ হইলেও তাহাদের বংশধরদের ব্যাপারে কোন নৈরাশ্যতা নাই; তাহারা নিশ্চই ইসলাম কবুল করিবে। অবশেষে তিনি আরবের এক সরদারের আশ্রয় লইয়া পুনরায় মক্কাতেই ফিরিয়া আসিলেন।

মে'রাজ

এই সময় আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মে'রাজের ঐ সম্পদ দান করা হয় যাহা না ইতিপূর্বে কাহারো ভাগ্যে হইয়াছে, না পরবর্তীতে। গোটা মানব জাতির মধ্যে ইহা কেবল তাঁহারই বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত সৌভাগ্য ছিল।

মদীনা তাইয়্যেবায় ইসলাম
এবং আকাবার বাইআত

হযরত আসআদ বিন জারারাহ এবং জাকওয়ান বিন আবদে কায়েস (রাঃ) সেই মাদানী যাহারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণে সৌভাগ্যবান হন। তাহারা ১০ম নববী সনে হজ্বের মওকায় মক্কা মোআজ্জমায় আসিয়াছিলেন। তথায় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যে প্রভাবিত হইয়া তাহারা ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তাহাদের প্রচেষ্টায় মদীনায় ইসলামের বিকাশ শুরু হয় এবং পরের বছর হজ্ব মৌসুমে মদীনার ৬ বা ৮ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন।

তৃতীয় বৎসর অর্থাৎ দ্বাদশ নববী বর্ষের হজ্ব মৌসুমে ১২ জন ব্যক্তি মক্কায় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া বাইআত গ্রহণ করেন। ইহাকে আকাবার প্রথম বাইআত বলা হয়। পরের বৎসর অর্থাৎ ত্রয়োদশ নববী বর্ষে ৭৩ ব্যক্তি হজ্বে আসিয়া ইসলাম গ্রহণে সৌভাগ্যবান হন এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদীনায় তাশরীফ লইয়া যাইতে বার বার অনুরোধ করেন। (এই নও মুসলিমগণ) এই বিষয়েও অঙ্গীকার করেন যে, সকল বিষয়ে তাহারা নিবেদিতপ্রাণ হইয়া আনুগত্য করিবেন। ইহাকে আকাবার দ্বিতীয় বাইআত বলা হয়।

হিজরত

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স তখন ৫৩ বৎসর। নবুওয়ত প্রাপ্তির ১৩

বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। ২৬, ২৭ ছফর মোতাবেক ৯, ১০ সেপ্টেম্বর ৬২২ খৃষ্টাব্দ, রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবারের মধ্যবর্তী রাতে রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের উদ্দেশ্যে স্বীয় বাসভবণ হইতে রওনা হইয়া ছুর পাহাড়ের গুহায় গিয়া তিন দিন অবস্থান করেন। পরে ১লা রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১৩ই সেপ্টেম্বর ৬২২ খৃষ্টাব্দ রোজ সোমবার ছুর পর্বতের গুহা হইতে যাত্রা করিয়া তিন দিন পর মক্কা হইতে মদীনার দুরত্ব অতিক্রম করেন। পরে ৪ঠা রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১৬ই সেপ্টেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার কোবা অবতরণ করেন। সেখানে পূর্ব হইতেই ছাহাবীগণ মওজুদ ছিলেন। এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং মুসলমানদের প্রকাশ্য সভায় বক্তব্য রাখেন।

হিজরত ছফরের সঙ্গী

হিজরতের ছফরে হযরত আবু বকর ছিদ্দিক ছিলেন একজন নিবেদিত প্রাণ সঙ্গী। তাছাড়া খাদেম হিসাবে হযরত আবু বকরের গোলাম হযরত আমের বিন ফুহাইরা এবং পথপ্রদর্শক হিসাবে হযরত আব্দুল্লাহ বিন উরাইকিত সঙ্গে ছিলেন।

মদীনা তাইয়্যেবায় প্রবেশ

১২ই রবিউল আউয়াল মোতাবেক ২৪শে সেপ্টেম্বর, দিবসটি ছিল শুক্রবার। আঁহযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোবা হইতে সওয়ার হইয়া বনী ছালেম গোত্রের আবাসিক এলাকায় পৌছাইবার পর জুমুআর সময় হয়। এখানে তিনি একশত মানুষের সঙ্গে জুমুআর নামাজ আদায় করেন। ইহাই ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম জুমুআ।

সর্বপ্রথম সারিয়া

ইসলামের সর্বপ্রথম সারিয়া (মুজাহিদ বাহিনী) এই বৎসর রমজান মাসে (মার্চ, ৬২৩ খৃষ্টাব্দ) হযরত হামজার নেতৃত্বে আবু জাহেলের মোকাবেলায় প্রেরণ করা হয়। আবু জাহেল তিনশত মানুষের একটি সশস্ত্র কাফেলা লইয়া সিরিয়া হইতে ব্যবসার পণ্যসহ প্রত্যাবর্তন করিতেছিল। কিন্তু পরে সংঘর্ষের সুযোগ হয় নাই।

আল্লাহর পথে সর্বপ্রথম তীর

হযরত সাআদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) সর্বপ্রথম সেই মুজাহিদ যিনি আল্লাহর পথে সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করেন। ঐ বৎসরই তিনি শাওয়াল মাসে (এপ্রিল, ৬২৩ খৃষ্টাব্দ) হযরত ওবায়দা ইবনুল হারেছের নেতৃত্বে মুসলমানদের একটি সশস্ত্র পর্যবেক্ষক দলের সঙ্গে আবু সুফিয়ানের মোকাবেলায় বাত্নে রাবেগ গিয়াছিলেন (তখনই এই তীর নিক্ষেপ করেন)।

গাযওয়ায়ে ওয়াদ্দান

ইহাই সর্বপ্রথম গাযওয়া যাহার নেতৃত্ব দেন স্বয়ং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইহাকে গাযওয়ায়ে আবওয়াও বলা হয়। এই সময় যুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি হয় নাই।

সর্বপ্রথম গনীমত

হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহাশের বাহিনীই সর্বপ্রথম সারিয়া যাহারা গনীমতের মাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) লাভ করেন। এই বাহিনী ২য় হিজরীর রজব মাসে (ডিসেম্বর ৬২৩ খৃষ্টাব্দ) এক কোরাইশী কাফেলার মোকাবেলায় নাখলা গিয়াছিল।

অন্যান্য ঘটনা

১ম হিজরীতে মসজিদে কোবা এবং পরে মসজিদে নববী নির্মিত হয়। এই নির্মাণকাজে ছাহাবাদের সঙ্গে কাদা-মাটির কাজে উভয় জগতের সরদার হযরত রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বরাবর শরীক ছিলেন। তাছাড়া এই হিজরীতেই আজানের তা'লীম দেওয়া হয় এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ছালাম ও হযরত ছালমান ফারসী (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন।

গাযওয়ায়ে বদর

২য় হিজরীর ১৩ই রমজান, মোতাবেক ৮ই মার্চ ৬২৪ খৃষ্টাব্দ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা হইতে যাত্রা করিয়া ১৬ই রমজান দিবাগত রাতে বদর মৌজায় গিয়া পৌছান– যাহাকে ক্বালীবে বদর অর্থাৎ "বদর কূপ" বলা হয়। পরের দিন ১৭ই রমজান মোতাবেক ১৩ই মার্চ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধকেই বদর যুদ্ধ বলা হয়– যাহা হক ও বাতেলের এক চূড়ান্ত লড়াই ছিল। এই যুদ্ধে মাত্র ৩১৩ জন নিরস্ত্র মুসলমান এবং প্রতিপক্ষে ছিল সাড়ে নয়শত সশস্ত্র বাহিনী।

এই গাযওয়ায় ৮ জন আনসারী ও ৬ জন মোহাজেরসহ মোট ১৪ জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন এবং শত্রুপক্ষের ৭০ জন নিহত এবং অপর ৭০ জন বন্দী হয়। নিহতদের মধ্যে আবু জাহেলসহ সেই ১১ জন সরদারও ছিল যাহারা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার পরামর্শ দিয়াছিল।

এই যুদ্ধে যাহারা বন্দী হয় তাহাদের নিকট হইতে সাধারণ জরিমানা উসুল করিয়া

তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আর যাহারা জরিমানার অর্থ দিতে পারে নাই তাহাদের দ্বারা কিছু দিন (মুসলিম শিশুদেরকে) শিক্ষা দান– এই জাতীয় কাজ গ্রহণ করা হয় এবং পরে তাহাদেরকেও ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

২য় হিজরীর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ

(১) ২য় হিজরীর ১৭ই রমজান বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উহার কিছুদিন পরই রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা হযরত রোকাইয়া ইন্তেকাল করেন। তিনি হযরত ওসমানের সঙ্গে (বৈবাহিক সূত্রে) আবদ্ধ ছিলেন।

(২) বাইতুল মোকাদ্দাসের পরিবর্তে খানায়ে কাবাকে মুসলমানদের কেবলা নির্ধারণ করা হয়।

(৩) রোজা (৪) জাকাত (৫) সদকায়ে ফিত্‌র (৬) ঈদ ও কোরবানী ঈদের নামাজ (৭) কোরবানীর হুকুম এবং– (৮) হযরত আলী (রাঃ)-এর সঙ্গে সাইয়্যেদাহ্ হযরত ফতেমার বিবাহ এই সনেই সম্পন্ন হয়।

গাযওয়ায়ে ওহোদ

৩য় হিজরীর ৭ই শাওয়াল মোতাবেক ২৩শে মার্চ ৬২৫ খৃষ্টাব্দ রোজ শনিবার ওহোদ পাহাড়ের নিকট সেই যুদ্ধ সংঘটিত হয় যাহা 'গাযওয়ায়ে ওহোদ" নামে প্রসিদ্ধ। এই যুদ্ধে মক্কার তিন হাজার সশস্ত্র ও শক্তিশালী যোদ্ধা আক্রমণ করিয়াছিল। (তাহাদের বিপক্ষে ছিল) সাতশত নিরস্ত্র মুসলমান। এই যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় হয় এবং সত্তর জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। শত্রুপক্ষের ২২ বা ২৩ জন নিহত হয় এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দান্দান মোবারক শহীদ হয়।

অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ ও প্রসিদ্ধ ঘটনাসমূহ

(১) এই বৎসর রবিউল আউয়াল মাসে গাযওয়ায়ে গাতফান অনুষ্ঠিত হয়। তবে এই গাযওয়াতে যুদ্ধ হয় নাই। গোত্রপ্রধান দু'ছুর পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উন্নত চরিত্রে প্রভাবিত হইয়া মুসলমান হইয়া যায়।

(২) এই একই বৎসর শরাব হারাম হয়। (৩) শাবান মাসে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হযরত হাফসার বিবাহ সম্পন্ন হয়। (৪) রমজান মাসে বিবাহ হয় হযরত জয়নবের সঙ্গে এবং (৫) সাইয়্যেদানা হযরত হাছান (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

৪র্থ হিজরী

(১) এই বৎসর গাযওয়ায়ে বনু নাজির সংঘটিত হয়। বনু নাজির পরাজিত হয় এবং চুক্তিভঙ্গের কারণে তাহাদিগকে মদীনা হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়। তাহারা নিজেদের যাবতীয় বিষয়-সম্পদ সঙ্গে লইয়া গান-বাদ্য করিতে করিতে (মদীনা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র) চলিয়া যায়।

(২) এই বৎসরই বীরে মাউনার (হৃদয় বিদারক) ঘটনা সংঘটিত হয়। উহাতে ৭০ জন হাফেজে কোরআন ছাহাবীকে প্রতারণামূলকভাবে ঘেরাও করিয়া শহীদ করা হয়। শুধু হযরত কায়া'ব বিন জায়েদ প্রাণে রক্ষা পান।

(৩) এই বৎসর সাইয়্যেদানা হযরত হোছাইন (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

৫ম হিজরী

(১) পঞ্চম হিজরীর জিক্বাআদাহ (মার্চ ৬২৭ খৃষ্টাব্দ) মাসে গাযওয়ায়ে খন্দক অনুষ্ঠিত হয়। উহাকে গাযওয়ায়ে আহযাবও বলা হয়। উহাতেই খন্দক (পরিখা) খনন করিয়া মদীনার হেফাজত করা হয়।

(২) জিলহজ্ব মাসে বনু কোরাইজাকে ২৫ দিন পর্যন্ত অবরোধ করিয়া রাখা হয়। বনু কোরাইজা অবশেষে হযরত ছাআদ বিন মোয়াজকে 'সাসিল' নিযুক্ত করে এবং তাহার ফায়সালা অনুযায়ী তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হয়।

(৩) এই বৎসরই গাযওয়ায়ে জাতুর রোকা' (৪) গাযওয়ায়ে দুমাতুল জান্দাল এবং (৫) গাযওয়ায়ে বনু মোস্তালাক অনুষ্ঠিত হয়। (৬) জুমাদাল উলা মাসে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৌহিত্র অর্থাৎ– হযরত রোকাইয়ার ছেলে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওসমান (রাঃ) ইন্তেকাল করেন। (৭) মদীনাতে ভূমিকম্প (৮) চন্দ্রগ্রহণ (৯) ৮ই জুমাদাল উলা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে উম্মুল মোমেনীন হযরত উম্মে ছালামার বিবাহ এবং (১০) এই বৎসরই জিক্বাআদাহ মাসে হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ উম্মাহাতুল মোমেনীনভুক্ত হন।

৬ষ্ঠ হিজরী

ষষ্ঠ হিজরীর জিক্বাআদাহ মাসে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৪শত ছাহাবী সঙ্গে লইয়া ওমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি যখন মক্কার ১ মঞ্জিল দূরে অবস্থিত হোদায়বিয়া মৌজায় পৌছান, যাহা হোদায়বিয়া কুপের নিকটে এবং মক্কা হইতে

১৯ মাইল দূরত্বে অবস্থিত, তখন কোরাইশরা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সামনে অগ্রসর হইতে নিষেধ করে।

এখানে যুদ্ধের আশঙ্কা ছিল। এক দিকে ছিল মাত্র ১৪ শত মুসলমান- যাহারা নিজেদের দেশ হইতে বহু দূরে ছিল। তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধের ছামান এবং উহার কোন আয়োজনও ছিল না। আর প্রতিপক্ষে ছিল গোটা আরবের কাফের সম্প্রদায়, যাহারা নিজেদের শহরে পরিপূর্ণ এতমিনান এবং সাজ-সরঞ্জামসহ নিরাপদে ছিল।

এই নাজুক পরিস্থিতিতে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন যে, যদি সংঘর্ষ বাঁধে তবে একে একে সকলেই কোরবান হইয়া যাইব, কিন্তু মোকাবেলা হইতে পিছপা হইব না। এই অঙ্গীকারকেই "বাইআতে রেজওয়ান" বলা হয়। কিন্তু পরে এক পর্যায়ে সন্ধির আলোচনা শুরু হয়। এই ক্ষেত্রে যদিও মুসলমানদিগকে কিছুটা মূল্য দিতে হয় (নতি স্বীকার করিতে হয়) যাহা হযরত ওমরের মত ছাহাবীগণের মনপূত ছিল না, কিন্তু রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধি করাকেই পছন্দ করিলেন।

সুতরাং দীর্ঘ পর্যালোচনার পর মক্কার কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে দশ বছর মেয়াদী এক সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তিতে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তদীয় ছাহাবীগণ এই বৎসর এইভাবেই চলিয়া যাইবেন এবং পরবর্তী বৎসর আসিয়া ওমরা আদায় করিবেন।

'সন্ধি' বিজয়ে প্রমাণিত হয়

এই সন্ধির ফলে মক্কার কাফেরদের ব্যাপারে মুসলমানগণ নিরাপত্তা লাভ করিলে তাবলীগের পরিধির বিস্তার ঘটে। আরবের বিভিন্ন গোত্রে ধর্মপ্রচারক পাঠানো হয় এবং অন্যান্য দেশের রাজা-বাদশাহগণের নিকটও নির্ভরযোগ্য মোবাল্লেগ বা ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র যথারীতি সীল-মোহর করিয়া পাঠানো হয়। তা ছাড়া খোদ আরবের লোকদের পক্ষেও ঠাণ্ডা মাথায় ইসলামের হাকীকত সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। উহার ফল এই হইল যে, এক বৎসরেই মুসলমানদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইল, যাহা এই পর্যন্ত বিশ বৎসর নবুওয়তের যুগেও হয় নাই।

৭ম হিজরী

হোদায়বিয়ার ছফর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর এক মাসও অতিক্রম হইতে পারে নাই;

এরই মধ্যে খায়বর গমন করিতে হয়। কারণ খায়বরের ইহুদীরা অন্যান্য গোত্রকে সঙ্গে লইয়া মদীনা মোনাওয়ারার উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা করিল। খায়বর মদীনা হইতে তিন মঞ্জিল বা ৪৮ মাইল দূরে অবস্থিত।

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সকল মুজাহিদগণকে সঙ্গে লইয়া যাহারা হোদায়বিয়ার বাইআতে রেজওয়ানে শরীক ছিলেন, ৭ম হিজরীর মোহররম মাসে (মে ৬২৮ খৃষ্টাব্দ) খায়বর আক্রমণ করিলেন। এখানে ইহুদীদের বড় বড় দুর্গ ছিল। আল্লাহ পাক সকল দুর্গেই বিজয় দান করিলেন।

কিন্তু ইহুদীদিগকে তাৎক্ষণিকভাবেই তথা হইতে বহিষ্কার করা হয় নাই। বরং তাহাদিগকে এই সুযোগ দেওয়া হয় যে, যতদিন তাহারা মুসলমানদের জন্য হুমকির কারণ না হইবে, ততদিন তাহারা ঐ শহরেই বসবাস করিবে। তাহাদের ভূখণ্ড ও যাবতীয় বিষয়-সম্পদ যদিও মুসলানদের মালিকানা বলিয়া ঘোষণা করা হয়, কিন্তু উহা মুসলমানদের দখলে আনা হয় নাই; বরং ইহুদীদের দখলেই বহাল থাকে। তবে তাহাদের উৎপন্ন ফসলে মুসলমানদের একটি অংশ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়।

খায়বর বিজয়ের পর ফাদাকের ইহুদীরাও ঐ সকল শর্তের উপরই সন্ধি করিল। তা ছাড়া অত্র হিজরীর জিলক্বদ মাস মোতাবেক ৬২৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে হোদায়বিয়া সন্ধির শর্ত অনুযায়ী রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবায়ে কেরামগণ মক্কা গমন করিয়া ওমরা আদায় করেন।

৮ম হিজরী

অষ্টম হিজরীর জুমাদাল উলা মোতাবেক ৬২৯ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে সিরিয়ার 'মূতা' নামক স্থানে রোমের খৃষ্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ হয়। কেননা বসরার প্রশাসক শারজিল আন্তর্জাতিক স্বীকৃত বিধান লংঘন করিয়া রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত হযরত হারিছ বিন ওমায়েরকে শহীদ করিয়াছিল (এই কারণেই মুসলমানগণ উহার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাহাদের উপর আক্রমণ করিয়াছিল)।

মুসলিম মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার। আর তাহাদের মোকাবেলায় (শত্রু সৈন্য) ছিল আনুমানিক দেড় লক্ষ। মুসলিম ফৌজের তিন সেনাপ্রধান হযরত জায়েদ বিন হারেছা, হযরত জাফর তাইয়্যার এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাজিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন একের পর এক শাহাদাত বরণ করেন। পরে হযরত খালেদ বিন ওলীদ

যুদ্ধের পতাকা ধারণ করেন এবং মুসলিম যোদ্ধাদেরকে দেড় লক্ষ কাফেরদের বেষ্টনী হইতে উদ্ধার করেন। এই যুদ্ধে মোট ১২ জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন।

মক্কা বিজয়

মক্কার কোরাইশ কর্তৃক হোদায়বিয়ার সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গের কারণে অষ্টম হিজরীর ১০ই রমজান মোতাবেক ১লা জানুয়ারী রোজ সোমবার আছরের নামাজের পর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে ১০ সহস্র সংখ্যক ইসলামী লশকর মক্কার দিকে যাত্রা করে। এই লশকর ১৯শে রমজান 'মাররুজ্জাহ্‌রান' নামক স্থানে পৌঁছাইবার পর তাবু স্থাপন করে। মক্কার নিকটবর্তী এই স্থানটি বর্তমানে "ওয়াদী ফাতেমা" নামে প্রসিদ্ধ। মক্কার অধিবাসীরা নিজেদের অসহায়ত্ব প্রকাশ করিলে রাহমাতুল লিল আলামীন তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন। ২০শে রমজান মোতাবেক ১১ই জানুয়ারী ৬৩০ খৃষ্টাব্দ রোজ বৃহস্পতিবার এই সুবিশাল বিজয়ী লশকর মক্কায় প্রবেশ করে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উটনীর উপর সওয়ার ছিলেন। তাঁহার পিছনে বসা ছিলেন নওজওয়ান হযরত উসামা। উসামা হইলেন মূতায় শাহাদাত প্রাপ্ত হযরত জায়েদ ইবনুল হারেছার পুত্র।

কিন্তু এই বিজয়ী বেশে মক্কার প্রবেশকালে শাহে কাওনাইন মাহবুবে রাব্বুল আলামীনের বিনয়-বিনম্র আচরণ এমন ছিল যে, তাঁহার দৃষ্টি ছিল নীচের দিকে নিবদ্ধ এবং মাথা মোবারক এতটা ঝুকিয়া ছিল যে, তাহার পাগড়ি মোবারকের প্রান্ত উটের হাওদা স্পর্শ করিতেছিল। অন্তর ছিল আল্লাহর সরণে নিবিষ্ট এবং জবান মোবারকে জারী ছিল সুরা ফাতাহ এর তেলাওয়াত। খানায়ে কাবায় প্রবেশ করিয়া তিনি আল্লাহ পাকের সিজদা শোকর আদায় করেন এবং উহার অভ্যন্তরে অবস্থিত ৩৬০টি মূর্তিকে হাতের ছড়ির ইশারায় ভূপাতিত করেন।

পরে যখন বাহিরে তাশরীফ লইয়া আসেন তখন সেখানে সেইসকল লোকেরা উপস্থিত ছিল– সারা জীবন যাহারা পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেওয়া এবং ইসলামের মূলোৎপাটনের কাজে নিয়োজিত ছিল। তিনি সমবেত সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ আজ তোমাদের সঙ্গে কি ধরনের আচরণ হওয়া উচিত?

তাহারা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল– একজন শরীফ খান্দান, উন্নত চরিত্রের অধিকারী ও সদাশয় ব্যক্তির উপর ভরসা করা যাইতে পারে। তিনি এরশাদ করিলেনঃ আজ সকলে

মুক্ত, যাহা হইয়াছে সব বিস্মৃত। আরো এরশাদ হইলঃ হে কোরাইশ সম্প্রদায়! আল্লাহ পাক জাহেলী যুগের সকল বংশীয় অহংকার দূর করিয়া দিয়াছেন। আমরা সকলে আদমের সন্তান, আর আদম ছিলেন মাটির তৈরী। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন–

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ

হে লোকসকল! আমি তোমাদিগকে এক পুরুষ ও এক স্ত্রীলোক হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমাদিগকে সম্প্রদায় ও গোত্রসমূহে বিভক্ত করিয়াছি, যেন তোমরা পারস্পরিক পরিচয় পাইতে পার। কিন্তু আল্লাহর নিকট কেবল তাহারাই অধিক সম্মান পাওয়ার যোগ্য যাহারা আল্লাহকে অধিক ভয় করে।

মক্কা বিজয়ের পরে শাওয়াল মাসে গাযওয়ায়ে হোনাইন সংঘটিত হওয়ার পর তায়েফ অবরোধ করা হয়। এই অবরোধেই (হস্তচালিত) ক্ষেপনাস্ত্র ব্যবহার করা হয়। উহা যেন দুর্গ বিধ্বংসী কামানের প্রাথমিক পর্যায় ছিল। এই ছফরে জিইররানা নামক স্থান হইতে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতারাতি মক্কা গমন করিয়া ওমরাও আদায় করেন।

অতঃপর ৬ই জিক্বাআদাহ মোতাবেক ২৫শে ফেব্রুয়ারী ৬৩০ খৃষ্টাব্দ রোজ রবিবার তিনি মদীনা তাইয়্যেবা ফিরিয়া আসেন।

৯ম হিজরী

মদীনাতে এই সংবাদে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় যে, রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াস এবং মূতার খৃষ্টানরা এক লক্ষ সৈন্য লইয়া মদীনা আক্রমণের এরাদা (পরিকল্পনা) করিতেছে। রোমানদের এই পরিকল্পনা নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে আঁহযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবম হিজরীর ৬ই রজব মোতাবেক ১৯শে অক্টোবর ৬৩০ খৃষ্টাব্দ রোজ বৃহস্পতিবার মদীনা হইতে সিরিয়ার দিকে যাত্রা করেন। তাঁহার সঙ্গে ছিল ২০ হাজার মুজাহিদ।

মদীনা হইতে ১৪ মঞ্জিল দূরে অবস্থিত সিরিয়া অঞ্চলের তবুকে পৌঁছাইবার পর তিনি জানিতে পারিলেন যে, সংবাদটি ছিল ভিত্তিহীন গুজব। এই কারণে এখানে কোন যুদ্ধ হয় নাই। তবে এই সুবিশাল মুসলিম বাহিনীর (রণপ্রস্তুতির কারণে) প্রতিপক্ষের অন্তরে ইসলাম ও মুসলমানদের গুরুত্ব স্থান পায়। সুতরাং কতিপয় খৃষ্টান নবাব আসিয়া রাসূল

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সন্ধি ও নিরাপত্তার চুক্তি করিয়া লয়।

রমজান মাসে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় ফিরিয়া আসেন। পরে মসজিদে জেরার বিলোপ সাধন করান। ইহা ছিল ঐ ঘর যাহার নাম মসজিদ দেওয়া হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা ছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার একটি কেন্দ্র।

এই বৎসরই আরবের বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধি দল আসিয়া নিজেরাও মুসলমান হয় এবং অন্যদের জন্যও ইসলামের মোবাল্লেগ বা প্রচারক হইয়া প্রত্যাবর্তন করে। এই বৎসরই রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্ব-ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সরাসরি নিজে গ্রহণ করেন এবং উহা বাস্তবায়নের জন্য হযরত আবু বকর ছিদ্দিককে হজ্বের আমীর বানাইয়া প্রেরণ করেন।

এই বৎসর মোশরেকদের ব্যাপারে ইসলামী প্রশাসনের পলিসি ঘোষণা করা হয়। হজ্ব মৌসুমে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে হযরত আলী এই ঘোষণা প্রচার করেন।

১০ম হিজরী

এই বৎসর খোদ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কা তাশরীফ লইয়া যান। ২৫শে জিক্বাআদাহ্ মোতাবেক ২৬শে ফেব্রুয়ারী ৬৩২ খৃষ্টাব্দ রোজ শনিবার জোহরের নামাজের পর মদীনা হইতে যাত্রা করিয়া ৪ঠা জিলহজ্ব মোতাবেক ২রা মার্চ ৬৩২ খৃষ্টাব্দ রোজ রবিবার তিনি পবিত্র মক্কা পৌঁছান। এই সময় লক্ষাধিক মুসলমান তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

১১ তম হিজরী

এই বৎসর হযরত উসামা বিন জায়েদের নেতৃত্বে সিরিয়ার দিকে অগ্রবর্তী দল হিসাবে একটি বাহিনী রওনা করানো হয়। এই বাহিনী প্রথম মঞ্জিলে থাকিতেই রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত প্রাপ্ত হন।

হযরত ছিদ্দিকে আকবর খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর সর্বপ্রথম রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (উপরোক্ত বাহিনী প্রেরণের) এরাদার বাস্তবায়ন করেন। ঐ বাহিনী প্রেরণের তাৎক্ষণিক ফল এই হয় যে, মক্কার বহু বিদ্রোহী কবীলা দমন হয়।

ওফাত

পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২৯শে ছফর রোজ মঙ্গলবার একটি জানাজা হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। পথে মাথা ব্যথা শুরু হয়। গৃহে আসিবার পর ভিষণ জ্বর দেখা দিয়া ১৩ দিন অসুস্থ ছিলেন। পরে ১২ই রবিউল আউয়াল ১১ হিজরী, ৮ই জুন ৬৩২ খৃষ্টাব্দ রোজ সোমবার চাশতের সময় اللهم بالرفيق الاعلى পাঠ করিতে করিতে ইন্তেকাল করেন।

انا لله و انا اليه راجعون

ওসীয়ত

الصلاة و ما ملكت ايمانكم নামাজ এবং তোমাদের অধীনস্ত লোকদের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখ।

و اخر دعونا ان الحمد الله رب العالمين

শব্দার্থ ঃ
(মূল উর্দূ কিতাবের পাঠকদের জন্য)

پیدائش জন্ম, সৃষ্টি, উৎপাদন, উপার্জন। سرپرست – পৃষ্ঠপোষক, মুরব্বী, সহায়তাকারী, অভিভাবক, পরিচালক, দায়িত্বশীল। دولت مند – ধনী, বিত্তবান, আমীর, অর্থশালী, সম্পদশালী, ভাগ্যবান। اولاد – সন্তানাদি, বালবাচ্চা, ছেলেমেয়ে, বংশ। دوبھر – দুষ্কর, কঠিন, ব্যর্থ, অতিষ্ঠ, অপছন্দ। شعب – উপত্যকা, পাহাড়ী পথ, গিরিপথ, ফাটল, নিম্নভূমি, খান্দান, গোত্র, কবীলা। ستانا – কষ্ট দেওয়া, জ্বালাতন করা, বিরক্ত করা, উত্যক্ত করা, দুঃখ দেওয়া। برتاؤ – ব্যবহার, আচরণ, রীতিনীতি, চরিত্র। یکم – মাসের প্রথম তারিখ, পহেলা। موضع – ভূমিখণ্ড, গ্রাম, স্থান, বাড়ী, গ্রামসমষ্টি, পরগণার বিভাগ বা অংশ। اهم – গুরুত্বপূর্ণ, জরুরী, গুরুতর, অত্যাবশ্যক, জটিল, কঠিন, দুষ্কর। بدعهدى – চুক্তি ভঙ্গ করণ, ওয়াদা

খেলাফী, বিশ্বাসঘাতকতা, ধোঁকাবাজী। تكميل - পূর্ণ করা, বাস্তবায়ন করা, আঞ্জাম দেওয়া, সমাপ্তি, সমাধান। سركش - বিদ্রোহী, অবাধ্য, উদ্ধত, অহংকারী, অকৃতজ্ঞ, নাফরমান। عليل - অসুস্থ, পীড়িত, রুগ্ন, বিমার, দুঃখী।

অধম দোয়ার মোহ্‌তাজ

মোহাম্মদ মিয়া উফিয়া আনহু

২৮ রবিউল আউয়াল ১৩৮০ হিঃ

২১ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ ইং

☆ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ☆

তারীখুল ইসলাম

মূল উর্দূ

মাওলানা সৈয়্যদ মোহাম্মদ মিয়া সাহেব

অনুবাদক

হাফেজ ক্বারী মুফতী রশিদ আহমদ

ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

বি, এ, অনার্স ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট- ঢা. বি.

প্রাক্তন শিক্ষক ঃ বড় কাটরা মাদ্রাসা, চকবাজার, ঢাকা

প্রবন্ধকার ঃ সীরাত বিশ্বকোষ, ই. ফা. বাংলাদেশ

পরিচালক ঃ ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার-ফরিদপুর ও

মাদ্‌রাসা-ই ইসলামিয়া দাঃ উঃ ফরিদপুর

বরুড়া. কুমিল্লা, বাংলাদেশ।

আশরাফিয়া লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা-১২১১

অনুবাদকের আরজ

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি আমাকে করিয়াছেন মুসলিম জাতির অন্তরভুক্ত। আর স্বীয় মনোনীত ধর্ম ইসলাম এর জ্ঞানাহরণে দান করিয়াছেন তাওফীক। অতঃপর আপন প্রিয় রাসূল মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর 'একান্ত ব্যক্তিগত জীবন' তথা তাঁহার শারীরিক গঠন-আকৃতি হইতে লইয়া তাঁহার হাঁটা-চলা ও উঠা বসা, লেন-দেন ও স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিবাহ-শাদি ও স্ত্রী-পরিজন, সঙ্গী-সাথী ও আত্মীয়-স্বজন, চাকর-বাকর ও অনুচরবর্গ, ব্যবহারিক আসবাবপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি-সম্পর্কে (অনুবাদ মূলক হইলেও) কিছু লেখার জন্য দিয়াছেন তাওফীক ও সুযোগ। তাই জ্ঞাপন করিতেছি তাঁহার পাক দরবারে অশেষ শোকরিয়া।

হাদীস শরীফে আছে "মাল্লাম ইয়াশ্কুরিন্নাসা লাম্ ইয়াশ্কুরিল্লাহ"। অর্থ্যাৎ, যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, সে যথার্থরূপে আল্লাহ তা'আলারও কৃতজ্ঞতা-স্বীকার করিতে পারে না। সেই বিধায় এই মুহূর্তে আমি স্মরণ করিতেছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা-মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ সাহেব এবং আমার জীবিত ও প্রায়ত ঐ সকল আত্মী-স্বজনের কথা, যাঁহাদের অকৃত্রিম মায়া-মমতা, অক্লান্ত শ্রম ও ত্যাগ এবং আন্তরিক দো'আর ফলে আমি আজ দুই কলম লেখিতে সক্ষম হইয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি আমার ঐ সকল আসাতেযায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে, জীবনের ধাপে ধাপে যাঁহারা বিদ্যা-চর্চায় আমাকে করিয়াছেন যথাযথ পথ-প্রদর্শন। বিশেষত ঃ ঢাকার ঐতিহ্যবাহী জামি'আ রাহমানিয়ার স্বনামধন্য মোহাদ্দিস মাওলানা নোমান আহমদ সাহেব এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ সাহেব-এর স্মরণ দিয়া যাইতেছে এই মুহূর্তে আমার অন্তরে বারংবার দোলা দিয়া যাইতেছে, যাঁহারা লেখার জগতে কিছু করার জন্য আমাকে করিয়াছেন অনুপ্রাণিত এবং দিয়াছেন মূল্যবান দিক-নির্দেশনা।

সর্বশেষে ঢাকার প্রাচীনতম ইসলামী প্রকাশনা সংস্থা "আশরাফিয়া লাইব্রেরী"-এর উদ্যমী প্রকাশক শ্রদ্ধেয় মাওলানা মোঃ ইউসূফ সাহেবকে জানাইতেছি আন্তরিক মোবারকবাদ, যিনি কওমী মাদ্রাসা সমূহের পাঠ্য সূচীর অন্তর্ভূক্ত কিতাব "তারীখুল ইসলাম"-এর এই তৃতীয় খন্ডটি অনুবাদ করার জন্য আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহা ছাপার জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

আমার এই অনুবাদ-কার্যতঃ কতটুকু সফল হইয়াছে, সেই বিচার পাঠক-পাঠিকা মহলের। আমার আরজ শুধু এতটুকু যে, আমার নিজের অযোগ্যতা ও অনভিজ্ঞতার কারণে অনুবাদের ক্ষেত্রে কিছু ভুল-ত্রুটি থাকিয়া যাওয়াটাই স্বাভাবিক। সেই ক্ষেত্রে সুধী পাঠক-পাঠিকা তাহা সংশোধন পূর্বক আমাকে অবহিত করিলে নিজেকে ধন্য মনে করিব।

আল্লাহ তা'আলা অধমের এই নগন্য মেহনত ও শ্রমটুকু কবুল করুন এবং এই কিতাবটিকে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির উসিলা করুন। আমীন!

তাং
১৫ই রমাযান ১৪২১ হিঃ
১২ ডিসেম্বর ২০০০ ইং

বিনীতি
রশিদ আমদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী (ছাঃ)-এর দৈহিক গঠন

প্রশ্ন ঃ দু'জাহানের বাদশাহ (ছাঃ)-এর দৈহিক গঠন কিরূপ ছিল ?

উত্তর ঃ আমাদের প্রাণের সম্রাট নবী (ছাঃ)-এর দৈহিক-উচ্চতা ছিল মাঝারি ধরণের। খুবই সুঠাম। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল এই যে, যখন তিনি কিছু লোকের সঙ্গে হাঁটিতেন, তখন (তাঁহাকেই) সব চেয়ে উচুঁ বলিয়া মনে হইত।

শির মোবারক ঃ

শির মোবারক ছিল ঈষৎ বড়। (উহা যেন) সম্মানের প্রতীক। (যেন) নেতৃত্বের মুকুট। জ্ঞান ও দূরদর্শিতার (যেন) প্রতিচ্ছবি।

পবিত্র দেহ ঃ

পবিত্র দেহ (-এর গঠন) ছিল মজবুত (কিন্তু) কমনীয়। সৌষ্ঠবপূর্ণ। সুন্দর-সুডোল। কোন ব্যক্তি যতই গভীর ভাবে (হুজুরকে) দেখিত, (পবিত্র দেহের) সৌন্দর্য (তাহার নিকট) ততই অধিকতর মনে হইত। পবিত্র দেহে লোম ছিল খুবই কম। কিন্তু দীপ্তি ছিল প্রচুর। শির মোবারকের চুল ছিল উজ্জ্বল-কালো। কিছুটা কুঁকড়ানো। হুজুর (ছাঃ) চুল মোবারকে তৈল বা মৃগনাভি জাতীয় দ্রব্যও ব্যবহার করিতেন। একদিকে বয়ঃবৃদ্ধি, আর অন্যদিকে খোশবু জাতীয় দ্রব্যাদি ব্যবহারের কারণে তাঁহার চুলে কিছুটা রক্তিমাভ আসিয়া গিয়াছিল।

দাড়ি মোবারক ঃ

দাড়ি মোবারক ছিল ঘন। সুন্দরভাবে পরিপূর্ণ। দাড়ি ও শির মোবারকের অল্পসংখ্যক চুল পাকিয়া গিয়াছিল। কেহ কেহ (ঐগুলির) সংখ্যা ও নির্ধারণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, (হুজুরের) দাড়ি এবং মাথা মোবারকের (সর্বমোট) কুড়িটি চুল পাকা ছিল।

পবিত্র কপাল ঃ

পবিত্র কপাল ছিল প্রশস্ত এবং উজ্জ্বল। যেন সূর্যের প্রান্তদেশ। শোভা ও সৌন্দর্যের সেজদা-স্থান (অর্থাৎ, বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ সকল প্রকারের সৌন্দর্যই ছিল উহার সৌন্দর্যের সামনে মাথাবনত)।

ভ্রূ-দ্বয় ঃ

ভ্রূ-দ্বয় ছিল ঘন, লম্বা ও সরু। উহাদের মৃদু বক্রতা রামধনুর জন্য ছিল শত ঈর্ষার কারণ। সেইগুলির মধ্যে ছিল প্রশস্ততা। অর্থাৎ সৌভাগ্য ও পূণ্যের স্পষ্ট প্রমাণ। ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি শিরা ছিল। যাহা রাগের সময় ফুলিয়া উঠিত এবং (দ্রুতগতিতে) সঞ্চালিত হইতে থাকিত।

পবিত্র নয়নযুগল ঃ

পবিত্র নয়নযুগল ছিল ডাগর ডাগর (বড় বড়)। মোতির টুকরার ন্যায় উজ্জ্বল (জ্যোতির্ময়)। উহাদের মধ্যস্থিত লাল রেখাগুলি সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে মহত্ত্বের দীপ্তিকেও দ্বিগুন করিয়া তুলিত। চক্ষুদ্বয়ের মনিগুলি ছিল অত্যন্ত কাল। যেন নূরের মুক্তার ঝকঝকে পৃষ্ঠের উপর হূরের (অর্থাৎ অত্যন্ত সুন্দরী কুমারীর) গন্ডদেশের কৃষ্ণবর্ণ তিলক। চোখের পাতাগুলি ছিল ঘন ও কাল। তলোয়ারের ন্যায় বাঁকা ও দীর্ঘ।

বর্ণ ঃ

বর্ণ ছিল লাল মিশ্রিত সাদা। যাহার চমক ও দীপ্তি ছিল শ্রী-বর্ধণকারী।

পবিত্র গন্ডদেশ ঃ

পবিত্র গন্ডদেশ ছিল কোমল ও রক্তিমাভ। যেন চন্দ্রের উপর গোলাপের লালিমা। নিটোল ও পাতলা। মাংস-ঝুলা নয় (বরং অস্ফীতও স্থূল)।

পবিত্র নাসিকা ঃ

পবিত্র নাসিকা ছিল ঈষৎ উন্নত। অবশ্য এত বেশী উন্নত নয় যে, দেখিতে কুশ্রী মনে হয়। উহার উপর ছিল দীপ্তি ও আলোর এমন বিস্ময়কর উত্থান যে, দর্শক প্রথমে উহাকে উন্নত মনে করিত। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করিলে বুঝে আসিত যে, আলো ও দীপ্তির কারণে (উহাকে) উন্নত মনে হইতেছে। নাকের (দুই ছিদ্রের মাঝখানের) হাড় ছিল শ্রীমন্ডিত উন্নত।

পবিত্র মুখঃ

পবিত্র মুখ ছিল সুষম-প্রশস্ত। পবিত্রতা এবং বাকপটুত্বের পূর্বাভাস (ও ছাপ ছিল উহাতে প্রস্ফুটিত)।

দান্দান মোবারক ঃ

পবিত্র দাঁত ছিল সরু। পরিষ্কার ও স্বচ্ছ-উজ্জ্বল। সামনের দাঁতগুলি একটি হইতে অপরটি ঈষৎ ব্যবধানে অবস্থিত ছিল (অর্থাৎ সামনের দাঁতগুলির মাঝখানে সামান্য সামান্য ফাঁক ছিল)। মুচকি হাসির সময় এমন মনে হইত যেন শিলা-ধারা (-এর উপর) হইতে পাতলা পর্দা সরিয়া গেল। কথাবার্তার সময় মনে হইত- যেন তারকারাজির রশ্মি দন্ত মোবারক হইতে অঝোরে বিচ্ছুরিত হইয়া আনন্দ-উল্লাসে মাতিয়া উঠিয়াছে।

সুদর্শন-দীপ্তিময় চেহারা ঃ

সুদর্শন-দীপ্তিময় চেহারা ছিল যেন চতুর্দশ রজনীর (পূর্ণ) চন্দ্র। না, বরং চন্দ্রও উহার সামনে লজ্জিত (ও নিষ্প্রভ)। খোদার শপথ! উহা চন্দ্র হইতেও অধিক প্রিয় (ও হৃদয়গ্রাহী) ছিল। উহা ছিল লম্বা ডিম্বাকৃতির। অবশ্য ঈষৎ গোলাকৃতিপূর্ণ। (অর্থাৎ পবিত্র চেহারা বেশী গোলও ছিল না। আবার বেশী লম্বাও ছিল না। বরং মাঝারি ধরনের ছিল)। ছিল সৌন্দর্যমন্ডিত। নিরবতার সময় উহা হইতে প্রভাব ও শ্রেষ্ঠ্যত্ব ঝরিত (ও বিচ্ছুরিত হইত)। দর্শক (তাহা দেখিয়া) প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িত। কথাবার্তার সময় যেন মুক্তা বর্ষিত হইত। মমতাপূর্ণ আলাপ-আলোচনা (ও কথা-বার্তা শ্রোতার) অন্তরে ঠাঁই করিয়া লইত। অন্তরে ভালবাসার বীজ বপন করিয়া দিত। মনে হইত যেন মুক্তা-বৃষ্টি বর্ষিত হইতেছে।

গর্দান মোবারক ঃ

গর্দান মোবারক ছিল যেন ছাঁচে ঢালা। এমন পরিচ্ছন্ন (ও উজ্জ্বল) ছিল যে, মর্মর পাথরের পরিচ্ছন্নতাও উহার সামনে তুচ্ছ। এমন শুভ্র যে, চন্দ্রের সুদর্শন শুভ্রতা উহার মামনে লজ্জাবনত।

দুই কাঁধের মাঝখান ঃ

দুই কাঁধের মাঝখানে ছিল খাতামে নবুওয়াত অর্থাৎ নবুওয়াতের সিল (মোহর)।

জ্ঞানভান্ডার অর্থাৎ পবিত্র বক্ষস্থল ঃ

জ্ঞানভান্ডার অর্থাৎ পবিত্র বক্ষস্থল ছিল প্রশস্ত ও সুষম।

পেট মোবারক ঃ

পেট মোবারক বক্ষসম (উঁচু) ছিল। ছিল সামনের দিকে অবিস্তৃত (অর্থাৎ মেদবহুল নহে)।

সিনা মোবারক ঃ

সিনা মোবারকের উপরিভাগে অল্প সংখ্যক পশম ছিল। সিনার অবশিষ্টাংশ এবং পেট মোবারক পশমমুক্ত ছিল। অবশ্য শুধু সিনা মোবারক হইতে নাভি পর্যন্ত পশমের একটি সরু রেখার মত ছিল।

কাঁধ মোবারক ঃ

কাঁধ মোবারক পুরু ও মাংসল। একটি অপরটি হইতে পৃথক।

বাহু ঃ

বাহু দীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত। যেন সিংহের বাহু। বরং উহা হইতেও দৃঢ় ও মজবুত।

হাতের তালু ঃ

হাতের তালু কোমল, মাংসল ও প্রশস্ত। এত কোমল যে, রেশম এবং সিল্ক (কাপড়)ও উহাদের (কোমলতার) সামনে হেয়। সেইগুলির মধ্যে ছিল এমন সুরভি যে, আতরও উহার সামনে লজ্জিত ও হেয়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গ্রন্থি ও জোড়ঃ

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গ্রন্থি ও জোড় এবং সেইগুলির হাড্ডিসমূহ সুবৃহৎ, প্রশস্ত ও মজবুত।

পা মোবারক ঃ

পা মোবারক মাংসল। সুশোভিত সমতল। এমন পরিচ্ছন্ন ও মসৃণ যে, পানির ফোঁটা সেইগুলির উপর স্থির হইতে ভীত-কম্পিত। এত পরিষ্কার ও স্বচ্ছ যে, স্ফটিকের (অর্থাৎ কাচের) শত জীবন উহাদের জন্য উৎসর্গিত। (হাঁটার সময়) সেইগুলি শক্তি ও দ্রুততার সহিত (উপরে) উঠিত। আর বিস্তীর্ণতা, গতিশীলতা ও গাম্ভীর্যের সহিত (ভূমিতে) স্থাপিত হইত।

পায়ের গোড়ালি মোবারক ঃ

পায়ের গোড়ালি মোবারকে গোস্ত ছিল অল্প (সেগুলি ছিল অস্থূল)।

আঙ্গুল ঃ

আঙ্গুলগুলি ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ-লম্বা, সুন্দর ও শোভাময়। জন্মগত ভাবে সাজানো ও পছন্দসই।

ঘাম ও থুথু ঃ

ঘাম ও থুথুর সুগন্ধ মৃগনাভি ও আম্বর (ঘাস বিশেষ)-এর সুবাসকে ও হারমানাইত। মোহাম্মদ-প্রেমিকগণ (তাঁহার) পবিত্র থুথু নিজেদের হাতের তালুতে লইতেন। অতঃপর মৃগনাভি যেন (উহা) লুণ্ঠিত হইত। ছাহাবাগণ উহা (একে অপরের নিকট হইতে কাড়িয়া ও) ছিনাইয়া লইতেন এবং চেহারা ও মাথায় মলিতেন। পবিত্র ঘামের কোন ফোঁটাও যদি পাওয়া যাইত, তবে উহা আতরের ন্যায় (হেফাজত করিয়া) রাখিতেন।

হুজুরের প্রস্রাব-পায়খানা ঃ

মাটি (হুজুরের প্রস্রাব পায়খানাকে) গিলিয়া ফেলিত। একদা রাত্রের বেলায় হুজুর (ছাঃ) পেয়ালার মধ্যে প্রস্রাব করিয়াছিলেন। উহা তখনও ভূমিতে নিক্ষেপিত হয় নাই। এরই মধ্যে এক ব্যক্তি ভুল বশতঃ (পানি মনে করিয়া) হুজুরের ঐ প্রস্রাব পান করিয়া ফেলিল। অতপর আজীবন সেই ব্যক্তির শরীর হইতে খোশবু নির্গত হইয়াছিল।

চলন-গতি ঃ

হুজুর (ছাঃ) এর চলার গতি ছিল তীব্র। পা মোবারক কিঞ্চিৎ ব্যাপ্তি লইয়া অধঃক্ষেপিত হইত (অর্থাৎ পদক্ষেপণ ইষৎ ব্যাপ্তি পূর্ণ এবং লম্বা হইত)। তাহা জমিনের উপর স্থাপিত হইত আস্তে। কিন্তু উঠিত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে। তাঁহার হাঁটুনিতে অহঙ্কারীদের ন্যায় বাবুয়ানাও ছিল না আবার অকর্মণ্য-অলসদের মত (তাঁহার চলন-গতি) নিষ্প্রাণও ছিল না। চলাফেরার সময় (হুজুরের) দৃষ্টি নিচের দিকে থাকিত। হাঁটার সময় (তাঁহাকে) এমন মনে হইত যেন, কোন ঢালু জায়গায় অবতরণ করিতেছেন। অর্থাৎ হুজুর (ছাঃ) সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া হাঁটিতেন।

শব্দার্থ ঃ

(মূল উর্দূ কিতাবের পাঠকদের জন্য)

آقا – নেতা, অফিসার, মনিব, শাসনকর্তা। حلیہ – আপাদমস্তক নির্ধারণ, যাহা সনাক্তকরণে সহায়ক হয়, অবয়ব, আকৃতি, দৈহিক গঠন। قد – দৈর্ঘ, দেহের উচ্চতা, গড়ণ। درمیانی – মধ্যম, মাঝারি, অভ্যন্তরিন, মধ্যস্থিত। مناسب উপযুক্ত, সুঠাম, যথাযোগ্য। مناسب طور پر - পরিমিত আকারে। چند – কতক, কিছু, কতিপয়। عقل – বুদ্ধি, জ্ঞান, বোধ, যুক্তি। تدبر – চিন্তা, দূরদর্শিতা। پیکر – প্রতিচ্ছবি, ছবি, চিত্র, মুখমন্ডল, চেহারা। گٹھا ہوا – মজবুত, শক্ত, মসৃণ। خوبصورتی – সৌন্দর্য, সৌকর্য, কমনীয়তা। گبھی ہوئی – সেঁধা, প্রবেশ করান, ঢুকান, প্রবেশিত, প্রবিষ্ট, বিদ্ধ করা, ভরা, পূর্ণকরা, পরিপূর্ণ। بال – লোম, চুল, পশম, ঊর্না। پھوراپن – ঈষৎ লালিমা মিশ্রিত কাল রঙ্গ ; হরিদ্রাভ। ریش – দাড়ি, শ্মশ্রু। جمال – শোভা, সৌন্দর্য। بھوئیں – بھوں এর বহুবচন, অর্থ ঃ ভুরু, ভ্রূ। گنجان ঘন, নিবিড়। جلال - তেজ, মহত্ব। شان - মাহাত্ম্য, দীপ্তি, জাঁকজমক। جلال کی شان - তেজোদৃপ্ততা। بھرہ – অত্যন্ত কাল। آبگینہ – আয়না, কাচ, স্ফটিক ; অশ্রু ; প্রেমিকের হৃদয় ; সুরা। مخمل – মূল্যবান কাপড় বিশেষ, মখমল। بندکی – বিন্দু,কণা, ছোট ছোট বিন্দু। آبدار – পরিষ্কার, চমকদার, স্বচ্ছ, উজ্জ্বল। کہ– যেন, যেমন, যেরূপ। باریك – সূক্ষ্ম, পাতলা, মিহি ; সরু ; লঘু, হালকা, অবিস্তৃত। چھید – ছিদ্র, ফাটল, গর্ত, ভাঙ্গন, ফাঁক। معلوم – ধারণা, জ্ঞান, জ্ঞাত, প্রকাশিত। لڑی – মোতির মালা, মালা, পরম্পরা, শিকল, ধারা, জের। اولا – শিলা ; লাড্ডু। پھوٹ پھوٹ کر – অঝোরে বিচ্ছুরিত হইয়া। شوخی کرنا – লম্ফ প্রদান করা, নৃত্য করা, আনন্দ করা, উৎফুল্ল হওয়া, গর্ব করা। پرگوشت – মাংসল, পেশিবহুল, পেশল। مات – পরাজয়, হার, পরাজিত। زیبائش – সজ্জা, অলঙ্কার, শোভা, সৌন্দর্য। کشادگی – ব্যাপ্তি, বিস্তীর্ণতা, বিস্তৃতি। پھرتی – হর্ষ.

আনন্দ, উৎসাহ ; স্ফুর্তি, গতিশীলতা। متانت – দৃঢ়তা, গাম্ভীর্য। درازی – বিস্তৃতি, বিস্তীর্ণতা, দৈর্ঘ। پسندیدگی – অভিরুচি, মনোনয়ন, নির্বাচন। مظهر – দৃশ্য, প্রকাশমান, প্রদর্শনশীল ; রঙ্গমঞ্চ। عنبر – সুগন্ধীদ্রব্য বিশেষ, সমুদ্রের ঘাস বিশেষ, যাহা জ্বালাইলে খোশবু সৃষ্টি হয়। مهك – সুবাস, সুরভি। تو – তবে, তখন। بول وبراز – মল-মুত্র, প্রস্রাব-পায়খানা। رفتار – চলন, চলন-ভঙ্গি, পদক্ষেপ, গতি। تيز – গতিশীল, তীব্র, তীক্ষ্ম। كسى قدر – কিছু, অল্প, সামান্য, একটু, কিঞ্চিৎ পরিমাণ, ঈষৎ। متكبر – অহঙ্কারী, আত্মগর্বী, উদ্ধত। اكڑ – বাবুয়ানা, বিলাসিতা। پوستيوں – پوستى -এর বহুবচন, অর্থঃ অকর্মন্য অলস, আহাম্মক, হাবা। چال – গতি, চাল, চলন।

মোহরে নবুওয়ত

প্রশ্ন ঃ হুজুরের নবুওয়তের সীলমোহর কোথায় ছিল ?

উত্তর ঃ উহা ছিল দুই কাঁধের মাঝখানে। বাম দিকে ঘেঁষা। শক্ত হাড্ডির নিকটে।

প্রশ্ন ঃ উহার আকৃতি কিরূপ ছিল ?

উত্তর ঃ উহা ছিল আঁচিলের ন্যায় পবিত্র গোশ্‌তের উত্থিত একটি টুকরা। যাহা শরীরের সাধারণ বর্ণ হইতে সামান্য একটু বেশী লালিমাপূর্ণ ছিল। উহার আকৃতি ছিল কিছুটা বন্ধ মুষ্ঠির ন্যায়। উহার চতুর্দিকে ছিল বড় বড় তিল। বড় হওয়ার কারণে সেইগুলিকে আঁচিলের মত মনে হইত। আর (উহার) চতুর্পার্শ্বে পশমও ছিল।

প্রশ্ন ঃ মোহরে নবুওয়ত (আকারে) কত বড় ছিল ?

উত্তর ঃ উহা ছিল কবুতরের ডিম অথবা খাটের সঙ্গে চাদর বাঁধার কাজে ব্যবহৃত ডোরীর (সুতার) গোলাকার বোতামের সমান।

হুজুর (ছাঃ)–এর জন্মগত গুণাবলী ঃ

প্রশ্ন ঃ হুজুর (ছাঃ) এর জন্মগত এবং স্বভাবগত-মৌলিক গুণাবলী বর্ণনা কর ?

উত্তর ঃ বিশ্বপ্রভু আল্লাহ তা'আলা পূর্ব ও পরের সকলের জ্ঞান (একা) হুজুর (ছাঃ) কে দান করিয়াছিলেন। বুদ্ধিমত্তা, মেধা, দুরদর্শিতা, বিজ্ঞতা, (এবং সর্বকালীন ও সর্বজনীন) রাষ্ট্রনীতি এবং পারিবারিক ব্যবস্থাপনা (-এর সর্বোত্তম ও সুন্দর রূপ-রেখা একমাত্র) হুজুরের শিক্ষা এবং তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী (ও জীবন প্রবাহ) হইতেই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তব সত্য হইল এই যে, প্রত্যেকটি গুণই তাঁহার মধ্যে ছিল পরিপূর্ণ রূপে (বিদ্যমান)। বরং হুজুরের প্রত্যেকটি গুণ ছিল বিস্ময়কর ! (যাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না)। বীরত্ব ও সাহসিকতায় পরিপূর্ণ ছিল (তাঁহার বুক)। ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বর্ণনা করেন, যুদ্ধ যখন প্রচণ্ড আকার ধারণ করিত, আমরা তখন হুজুরের আশ্রয় গ্রহন করিতাম। হুজুর (ছাঃ) শত্রু পক্ষের খুবই নিকটে থাকিতেন। আমাদের কেহই শত্রুর অত নিকটে অবস্থান করিত না। গভীরভাবে বিবেচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, হুনাইনের যুদ্ধে একা হুজুর (ছাঃ)-ই (কাফেরদের হাত হইতে) বিজয় ছিনাইয়া আনিয়া ছিলেন। অথচ প্রতিদ্বন্দীতা ছিল হাজার হাজার কাফেরের সঙ্গে। একদা এক রাত্রিতে মদীনাবাসীদের উপর আক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা ছিল। লোকজন চিন্তিত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। তখন হুজুর (ছাঃ) একা ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে সমগ্র মদীনা প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেন এবং বলিলেন– "তোমরা বিশ্রাম কর! কোন ভয় নাই"। তোমরা পূর্বে পড়িয়াছ যে, ওহোদ এবং হুনাইনের মত (ভয়াবহ) স্থান সমূহেও হুজুরের পা মোবারক কম্পিত হওয়ার পরিবর্তে বরং আরও স্থির-অবিচল হইয়াছিল।

হুজুরের (ছাঃ) চিন্তা ও চেতনা ছিল উন্নত। সংকল্প ছিল দৃঢ়। সাহস ছিল দুরন্ত। সকল কাজে ছিল তাঁহার অসীম ধৈর্য। সকল রীতিনীতিতে তিনি ছিলেন স্থির-অবিচল। সকল কর্মকাণ্ডে তাঁহার মধ্যে ছিল পূর্ণ সময়ানুবর্তিতা ও সময়নিষ্ঠা। কোন বস্তুর আকাঙ্খা বা দুনিয়ার কোন ক্ষতি (-এর আশঙ্কা) হুজুরের সংকল্পে ফাটল সৃষ্টি করিতে পারিত না।

সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা ঃ

হুজুরের সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা কাফেরদের মধ্যেও এত প্রসিদ্ধ ছিল যে, তাহারা হুজুর (ছাঃ) কে "ছাদিক" অর্থাৎ সত্যবাদী এবং "আমীন" অর্থাৎ , বিশ্বস্ত উপাধিতে ভূষিত করিয়া রাখিয়া ছিল। হিজরতের সময় হুজুর (ছাঃ) কে হত্যার পরিকল্পনা হইতে ছিল। অথচ সেই রক্ত পিপাসা-শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও সকল আমানত হুজুর (ছাঃ)-এর নিকটই তাহারা রাখিয়া ছিল।

সাহসী ব্যক্তি সাধারণতঃ সদয়প্রাণ ও চিন্তাশীল হয় না। অথচ একজনের জন্য প্রয়োজন হৃদয়ের কঠোরতা, আবার আরেক জনের জন্য আবশ্যক নম্রতা। একজন চায় গরমি। অপর জন চায় শীতলতা। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল এই যে, উভয়গুণই হুজুরের মধ্যে ছিল সমভাবে বিদ্যমান। অগ্নি ও পানি এইখানে (অর্থাৎ হুজুরের প্রকৃতির মধ্যে) একত্রিত হইয়া গিয়াছিল।

শিরা-উপশিরা (অর্থাৎ আপাদমস্তক) যেন দানশীলতা ও বদান্যতায় ছিল পরিপূর্ণ। কোন জিনিস উপস্থিত থাকা অবস্থায় পবিত্র মুখ হইতে "না" শব্দটি বাহির হওয়াটা ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। ইহাও সম্ভব ছিল না যে, সন্তান-সন্ততির[১] ক্ষুৎ-পিপাসা তাঁহার বদান্যতার মধ্যে কোন বাধা সৃষ্টি

টীকা

১। হুজুরের কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমা (রাঃ) নিজে চাকি পেষিতেন। নিজে পানি বহন করিয়া আনিতেন। ঝাড়ু নিজেই দিতেন। চাকি পেষার কারণে হাতে

(বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন)

করিবে। দয়া ও বদান্যতার এই সাগর হইতে কি মুসলিম! কি কাফের ! বরং মানব জাতির সাথে সাথে জীব জন্তুরাও সমভাবে পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। এমনও হইয়াছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরে দিরহাম ও দীনার (স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা) অবশিষ্ট ছিল এবং উহা দান করার জন্য কোন উপযুক্ত পাত্র না পাওয়া গিয়াছে, ততক্ষণ পর্যন্ত হুজুর (ছাঃ) গৃহ-অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন নাই।

হুজুর (ছাঃ) ছিলেন বিনয় ও নম্রতার ছবি। হাতেম তায়ীর পুত্র আদী (রাঃ) শুধুমাত্র হুজুরের বিনয় দেখিয়াই তাঁহাকে বিশ্বস্ততার স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। ইহুদী সম্প্রদায়ের বহুত বড় আলেম হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) হুজুরের অকৃত্রিমতা ও সরলতায় মুগ্ধ হইয়াই (হুজুরের) দাসে পরিনত হইয়াছিলেন (এবং ইসলাম গ্রহনে ধন্য হইয়াছিলেন)। তিনি তখন বলিয়া ছিলেনঃ "এই চেহারা মিথ্যাবাদী হইতে পারে না"। সর্বপ্রকার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা থাকা সত্বেও হুজুরের শরম ও লাজুকতা কুমারী কন্যা হইতে ও অধিক ছিল। পবিত্রতা ও নির্মলতা ছিল তাঁহার জীবনের অংশ। তোমাদের হয়ত স্বরণ থাকিবে যে, বাল্যকালে একবার যখন হুজুরের লজ্জাস্থান খুলিয়া গিয়াছিল, তখন হুজুর (ছাঃ) বেহুঁশ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

টীকা

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার বাকী অংশ)

দাগ পড়িয়া গিয়াছিল। মোশক (পানি বহনের কাজে ব্যবহৃত চামড়ার থলি বিশেষ) বহন করিতে করিতে সুন্দর নরম কাঁধ মোবারক ছুলিয়া গিয়াছিল। পরিচ্ছন্ন বসন হইয়া গিয়াছিল ময়লা। এহেন দুর্দিনে একদা তিনি হুজুর (ছাঃ)-এর নিকট একজন কৃতদাসের জন্য আবেদন করিলেন। উত্তরে হুজুর (ছাঃ) বলিলেন ঃ অমুক শহীদের এতিম বাচ্চাদের সঙ্গে আমার প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে। এইবার উহাই পূর্ণ হইবে। আগামীতে তোমাকে দিব। কিন্তু শুন ! অতি উত্তম কৃতদাস হইল উহা, যাহা আখেরাতে কাজে আসিবে। অতএব তুমি প্রত্যেক নামাজের পর سبحان الله (সুবহানাল্লাহ) الحمد لله (আল্-হামদু লিল্লাহ) الله اكبر (আল্লাহু আক্‌বার) তেত্রিশ তেত্রিশ বার করিয়া পড়িয়া লইও। এই গুলি আখেরাতের খাদেম। এই ধরণের ঘটনা অনেক রহিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করা হইল।

শব্দার্থ ঃ

(মূল উর্দূ কিতাবের পাঠকদের জন্য)

مسه – শরীরস্থ তিল বা আঁচিল, বড় তিল। سیج بند – পালঙ্কের পায়ার সঙ্গে চাদর বাঁধার ডোরী বা রশি। گھنڈی – বোতাম। জামায় লাগানো সুতার গোলাকার কারুকাজ, সুতার গোলক। خداوند – প্রভু। اولین وآخرین – পূর্ব এবং পরেরগণ, প্রাচীন ও আধুনিকগণ। ذکاوت বুদ্ধিমত্তা, তীক্ষ্ণবোধ। ذهانت – প্রতিভা, বোধ, মেধা। تدبر – চিন্তা, দুরদর্শিতা, পরিণামদর্শিতা। عقل – বিজ্ঞতা, জ্ঞান, উপলদ্ধি, যুক্তি। سیاست – রাষ্ট্র, শাসন, রাজনীতি। انتهاء – সমাপ্তি, সীমা, প্রান্ত, দিগন্ত, চূড়ান্ত, সর্বোচ্চ। শেষ সীমা, পরিণাম। کیوں نه هو – বরং। প্রসংসাসূচক শব্দ, বাঃ বাঃ, কি সুন্দর। কিযে বলিব। যাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। بهادری ودلیری – সাহসিকতা ও বীরত্ব। کوٹ کوٹ کر بهری هوئی – চূর্ণ চূর্ণ করিয়া বা ঠাসিয়া ভরা হইয়াছে যাহা, ঠাসা। بهت – অত্যন্ত। اطمینان – ধৈর্য, শান্তি, নিশ্চিন্ত অবস্থা। اور – এবং, বরং, বরঞ্চ। تو – তখন, অতপর, তবে, তো। فرق – পার্থক্য, ফাটল, ভাঙ্গন। امانت – আমানত, গচ্ছিত ধন বা বস্তু। گرمی – তাপ, উত্তাপ, রাগ, উদ্যম, আবেগ। سخاوت – উদারতা, বদান্যতা, দানশীলতা। گویا – যেমন, যেন, যেরূপ। رگ وپے – শিরা, স্নায়ু, নাড়ী, শিরা উপশিরা। مجال – শক্তি, সামর্থ্য, প্রভাব। کیا – কি, কোন্, কত। دولت خانه – ঘর, বাড়ী, বাসস্থান, অট্টালিকা, প্রাসাদ, ভবন। تواضع – বিনয়, ভদ্রতা, মনোযোগ, সম্বর্ধনা। عاجزی – নম্রতা, মিনতি, অসহায়তা, অক্ষমতা। پیکر – ছবি, চিত্র, মন্ডল, চেহারা। بے تکلفی – অকৃত্রিমতা, স্বাভাবিকতা, সরলতা, সংকোচহীনতা, অন্তরঙ্গতা। سادگی – সরলতা, অনাড়ম্বরতা। حلقه بگوش – দাস, পরিচারক। بزرگی – সম্মান, মাহাত্ম্য, আভিজাত্য। عظمت – শ্রেষ্ঠতা, শ্রেষ্ঠত্ব, বৃহত্ব, বড়ত্ব, আড়ম্বর। باوجود – সত্ত্বেও। عفت – পবিত্রতা, সচ্চরিত্রতা পাপহীনতা।

হুজুর (ছাঃ) -এর আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি

প্রশ্ন ঃ হুজুর (ছাঃ) এর নিত্যনৈমিত্তিক রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার কিরূপ ছিল ?

উত্তর ঃ ইহা বাস্তব সত্য যে, (হুজুরের চরিত্রমাধুর্য) বর্ণনা (করিয়া শেষ) করা অসম্ভব। এই ব্যাপারে ইহাই চূড়ান্ত কথা। কারণ হুজুরের প্রিয়তমা পত্নী হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ), যিনি ছিলেন পবিত্র নববী জীবনের (একমাত্র) বুদ্ধিমতী রহস্যভেদিনী, তিনিও এই প্রশ্নের উত্তরে ইহা ছাড়া অন্য কোন উত্তর দিতে পারেন নাই যে, "হুজুরের চরিত্র ছিল পবিত্র কোরআন" (অর্থাৎ পবিত্র কোরআনে বর্ণিত চরিত্রই ছিল হুজুরের চরিত্র)।

সারকথা হইল এই যে, হুজুরের চরিত্র-মাধুরী ছিল পবিত্র কোরআন তথা আল্লাহ্ পাকের বিধি-বিধান এবং তাঁহার সন্তুষ্টির (পথের) বাস্তব নমুনা। কোরআনে পাকের তাফসীর করিতে হইলে হুজুরের জীবন-চরিত্র লক্ষ্য কর! হুজুর (ছাঃ) এর চরিত্র মাধুর্য দেখিতে চাহিলে পবিত্র কোরআন পড়িয়া দেখ!

যুদ্ধ-সন্ধি, শত্রুতা-মিত্রতা, এবাদত-বিশ্রাম, খোর-পোষ, উঠা-বসা, ঘুম-জাগৃতি, মোটকথা সর্বত্র হুজুর (ছাঃ) এর (কর্ম)পদ্ধতি উহাই হইত, যাহতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি থাকিত (এবং) যাহা হইত কোরআনের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য (-এর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ন)।

যে সব লোক বহু বছর বা দীর্ঘ সময় হুজুরের খেদমতে ছিলেন তাঁহাদের বর্ণনা মতে, হুজুর (ছাঃ) ব্যক্তিগত কারণে কখনও কাহারও প্রতি

ক্ষিপ্ত হইতেন না। নিজের ক্ষতির বেলায় কখনও কাহারও নিকট হইতে বদলা লইতেন না। অবশ্য যদি শরীয়তের কোন অধিকার বিনষ্ট হইত, তবে তাঁহার রাগের অন্ত থাকিত না। তখন না কোন সুপারিশ (অপরাধীকে হুজুরের শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পারিত। না কাহারও ভালবাসা (তাহাকে উক্ত শাস্তি হইতে বাঁচাইতে পারিত)।[১]

হুজুরের চারিত্রিক উদারতা এবং আচার-আচরণ এত উন্নত ছিল যে, উহাকে নবুওয়তের প্রমাণ হিসাবে পেশ করা হইত। জানের দুশমন বড় বড় গোঁড়া কাফেররাও (হুজুরের আচারব্যবহার দেখিয়া) গরদান ঝুকাইয়া দিত এবং হুজুরের প্রেমে বিভোর হইয়া পড়িত।

অশালীন আচরণ, বে-আদবী, কষ্ট ও উৎপীড়নের প্রতিশোধ-ক্ষমার পরিবর্তে অন্য কিছু দিয়া লওয়া ছিল হুজুরের পক্ষে অসম্ভব।

হুজুরের কোন সময়ই আল্লাহর স্মরণ হইতে শূন্য ছিল না। ঘুমানোর সময় চক্ষু ত ঘুমাইত। কিন্তু অন্তর আল্লাহর স্মরণে জাগ্রত থাকিত। এক এক মজলিসে ৭০ হইতে একশত বার পর্যন্ত ইস্তেগফার করা (গোনাহ্ মাফ্ চাওয়া) ত ছাহাবায়ে কেরামেরই শ্রুতি গোচর হইত। (ইহার অধিক আরও কত ইস্তেগফার যে হুজুর, করিতেন তাহা আল্লাহ্ই ভাল জানেন।)

সৃষ্টির সেবা ঃ

সৃষ্টির সেবা ছিল হুজুরের পবিত্র জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য।

টীকা

১। হুজুর (ছাঃ) এমনও বলিয়াছেন যে, যদি আমার কন্যা ফাতেমা (আল্লাহ না করুন) চুরি করে, তবে আমি তাহার হাতও কাটিয়া দিব।

সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিঃ

সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি ছিল (হুজুরের জীবনের) অপর এক নিঃশ্বাস (তুল্য বিষয়)। যেন উহার উপরই ছিল হুজুরের জীবনের ভিত্তি। জীবন যখন সম্পূর্ণরূপে বিপন্ন ও সংকটাপন্ন হইয়া পড়িত, তখনও সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিশীলতার প্রেরণা থাকিত সকল ভয়-ভীতি হইতে মুক্ত। বরং সেই উদ্যম ও প্রেরণা তখনই পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইত।[১] ওহোদ যুদ্ধে হুজুরের মোবারক চেহারায় (শিরস্ত্রানের) দুইটি কড়া বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে! রক্তের ফোয়ারা চেহারা মোবারকের ধমনী সমূহ হইতে উথলিয়া উঠিতেছে! কিন্তু সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে বড় দরদী (প্রিয় নবী ছাঃ রক্তের) প্রতিটি ফোঁটা সংরক্ষণ করিতেছেন! এই কারণে যে, যদি (রক্তের একটি ফোঁটাও) মাটিতে পতিত হয়, তবে আল্লাহ্‌র ক্রোধ জোশ মারিয়া উঠিবে। এই জন্য তাঁহার (ছাঃ)কোন দুঃখ নাই যে, এত অভদ্রতা, হিংস্রতা ও নিষ্ঠুরতা (পূর্ণ আচরণ) কেন করা হইল! তাঁহার চিন্তা (শুধু) এই বিষয়ে

টীকা

১। তায়েফে যখন হুজুর (ছাঃ)-এর পবিত্র দেহ ইট-পাথরের আঘাতে আঘাতে রক্ত রঞ্জিত করা হইল, তখন পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা বলিয়াছিলেন- হুজুর! (এই সব পাপিষ্ঠদেরকে) বদ্ দোয়া করুন কিন্তু সৃষ্টির প্রতি হুজুরের সহানুভূতির সহজাত স্পৃহা ও উদ্যম এই বলিয়া তখন চিৎকার করিয়া উঠিল যে, না না ! ইহা কখনো হইতে পারে না। কারণ! এমনও ত হইতে পারে যে, তাহাদের বংশে এমন কোন বাচ্চা জন্মিবে, যে সত্য দ্বীনকে মানিয়া লইবে। অনুরূপভাবে ওহোদের যুদ্ধে এত কিছু হইল। ধারাবাহিকভাবে হুজুরের উপর আক্রমণ করা হইল, সৃষ্টির প্রতি সবচেয়ে বড় সহানুভূতিশীল এই ব্যক্তিটিকে তাহাদের থেকে পৃথক করার জন্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হইল এই যে, তখনও তাঁহার পবিত্র মুখে এই দোয়া জারি ছিল যে, হে আল্লাহ্! আমার এই অবুঝ সম্প্রদায়কে আপনি ক্ষমা করুন! তাহারা আমাকে চিনে না!

যে, এই জাতির সফলতা ও উন্নতির মধ্যে কোন বাধার সৃষ্টি না হইয়া যায়। পবিত্র মুখ হইতে বারবার (শুধু) এই কথাই উচ্চারিত হইতেছে "হায়!" ঐ সম্প্রদায়ের কল্যাণ কিভাবে সাধিত হইবে, যে নিজের সবচেয়ে বড় হিতাকাঙ্খীর সহিত এই আচরণ করিয়াছে!"

বিনয় ও নম্রতা ঃ

তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্র। দরিদ্র হইতে দরিদ্রও যদি তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানাইত, তিনি তাহা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করিয়া লইতেন। একজন গরীব অসহায়ের কুটিরে গমনে দোজাহানের বাদ্‌শাহর কোন আপত্তি থাকিত না। সাধারণ হইতে সাধারণ ব্যক্তিও যেখানে ইচ্ছা সেখানে হুজুরের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে পারিত। হুজুরের দরজায় কোন দারোয়ানও ছিল না এবং তাঁহার চলার পথে গাড়োয়ানের হাঁক ডাক ও ছিল না। সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে চলাফেরার সময় না ছিল পৃথক কোন জাঁকজমক। না আসন গ্রহণে ছিল কোন স্বাতন্ত্র্য। বিশ্রাম ও আরামে তাঁহার অংশ ছিল সকলের চেয়ে কম। কিন্তু কষ্ট ও সহিষ্ণুতার বেলায় সকলের সমান বরং অধিক। জুতা এবং ছিড়া কাপড় নিজ হাতেই সিলাই করিতেন। গাধার উপর আরোহণ করিতেও তাঁহার আত্মাভিমান হইত না । বা- আত্ম মর্যাদায় বাধিত না। তিনি ফরমাইয়াছেন, "তোমরা সকলেই আদম-সন্তান। আর আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি মাটি হইতে।" হুজুর (ছাঃ) কে যদি কখনও (কোন) দুইটি বিষয়ের মধ্য হইতে কোন একটি গ্রহণ করার এখ্‌তিয়ার দেওয়া হইত, তবে তিনি (অপেক্ষাকৃত) সহজটিকেই (গ্রহণ করিতে) পছন্দ করিতেন। কিন্তু যদি উহাতে বেইনসাফী ও দুর্নীতি (মাথা চাড়া দেওয়ার সামন্যতম সম্ভাবনাও) থাকিত, তবে তিনি তাহা (অর্থাৎ সেই ধরণের বিনয় ও নম্রতা) হইতে বহু বহু দূরে থাকিতেন।

কম কথনঃ

কম কথন ছিল হুজুরের (ছাঃ) সহজাত অভ্যাস। অবশ্য যদি কখনও কথা বলিতেন, তবে উপকারের কথাই বলিতেন। অপরাপরদের প্রতিও (হুজুরের পক্ষ হইতে) এই তাগিদই থাকিত যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং কেয়ামতের দিবসে বিশ্বাসী, তাহার জন্য আবশ্যক, সে যেন চুপ থাকে। আর যদি কথা বলে, তবে যেন উত্তম কথা বলে। (পবিত্র মুখ হইতে ইহাও) ঘোষিত হইয়াছে যে, মুসলমানের সৌন্দর্য এরই মধ্যে যে, তাহার (মুখ) হইতে অপ্রয়োজনীয় কথা-বার্তা নির্গত হইবে না।

আনন্দ ও বেদনা-সর্বাবস্থায় (হুজুরের) দৃষ্টি ও মনোযোগ আল্লাহ্‌র প্রতি (নিবদ্ধ) থাকিত। যদি কোন বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটিত, তখন তিনি পড়িতেন– اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন– অর্থাৎ, আমরা তো আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চিতভাবে আমরা তাঁহার দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী)। অথবা বলিতেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ (আল্ হামদু লিল্লাহি 'আলা কুল্লি হাল- অর্থাৎ, সর্বাবস্থায় সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য)। আর আনন্দের সময় বলিতেন– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (আল্ হাম্দু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন অর্থাৎ, সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য)।

হুজুর (ছাঃ) এর রাগ ও সন্তুষ্টি উভয়ই পবিত্র চেহারা হইতে স্পষ্টরূপে বুঝা যাইত। তিনি যখন রাগান্বিত হইতেন, তখন অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইতেন। আর সন্তষ্টির সময় তাঁহার চক্ষু অবনত হইয়া যাইত। অহংকার ও গর্বের পরিবর্তে (তাঁহা হইতে) মিনতি প্রকাশ পাইত।

হুজুরের দয়ার আঁচলে যেরূপভাবে মানুষেরা আশ্রয় লইত, অনুরূপভাবে প্রানীরাও। সেই ছায়া তলে যেরূপভাবে মুসলমানগণ শান্তি পাইতেন, অনুরূপভাবে কাফেরগণও।

(উপরন্তু) তিনি বলিয়াছেন–প্রকৃত মোমেন ঐ ব্যক্তি, যাহার দ্বারা কোনও আদম সন্তান কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

জীবজন্তুর প্রতি হুজুরের অনুগ্রহ ঃ

যখন (কোন পিপাসিত) বিড়াল আসিত, তখন হুজুর স্বয়ং তাহার সামনে পানির বর্তন ঝুকাইয়া দিতেন এবং বিড়ালটি তৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উহা কাতকরিয়া রাখিতেন। তিনি ফরমাইয়াছেন—এক অসৎ মহিলা শুধু এই কারণেই নাজাত পাইয়াছিল যে, সে পিপাসার কারণে মৃতপ্রায় একটি কুকুরকে পানি পান করাইয়াছিল। যাহার ফলে কুকুরটি প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছিল। অপর এক মহিলা শুধু এই কারণে দোযখে জ্বলিতে ছিল যে, একটি বিড়ালকে সে বাঁধিয়া রাখিয়া ছিল। এবং খাবার না দেওয়ার কারণে বিড়ালটি শেষ পর্যন্ত মরিয়া গিয়াছিল।

(জীবজন্তুর পৃষ্ঠে) আরোহীদের প্রতি হুজুর (ছাঃ)-এর এই নির্দেশ ছিল যে, তাহারা যেন সাওয়ারী প্রাণীদের উপর কোন কঠোরতা না করে। জবাই কারীদের প্রতি এই নির্দেশ ছিল যে, জবাইয়ের সময় যেন তাহারা সহজ পদ্ধতি গ্রহণ করে (যেমন, ধারাল ছুরি রাখা, ক্ষুৎ- পিপাসার্ত প্রাণীকে প্রথমে তৃপ্ত করা অতপর জবাই করা ইত্যাদি)। ঘোড়সওয়ারদের প্রতি এই উপদেশ থাকিত যে, তাহারা যেন নিজ ঘোড়াসমূহের মুখমন্ডল চাদর অথবা জামার হাতা দ্বারা (হইলেও) পরিষ্কার করিয়া লয় (অর্থাৎ পরিস্কার করার অন্য কিছু না থাকিলে)। সেই সর্বজনীন দয়া ও অনুগ্রহের ভিত্তিতেই প্রাণীরা পর্যন্ত স্বীয় অভীযোগ হুজুরের দরবারে পেশ করিত।

প্রশ্ন ঃ এবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে হুজুর (ছাঃ)-এর অভ্যাস ও নিয়ম-নীতি কি ছিল ?

উত্তর ঃ সকল কাজের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থাই ছিল হুজুরের পছন্দনীয়, যাহা সর্বদা আঞ্জাম দেওয়া (-ও) সহজ। ফরজ এবং সুন্নত ছাড়াও নিম্নবর্ণিত নফলসমূহ পড়ার আলোচনা সাধারণতঃ হাদীস শরীফে পাওয়া যায়-

(১) এশ্‌রাক, দুই অথবা চার অথবা আট রাকাত।

(২) চাশ্‌তের সময় (মধ্য দিবসের কিছুক্ষণ পূর্বে) দুই, চার অথবা আট রাকাত।

(৩) আছরের পূর্বে চার রাকাত।

(৪) মাগরিবের পর ছয় হইতে কুড়ি রাকাত।

(৫) মস্‌জিদে প্রবেশের সময় তাহিয়্যাতুল মস্‌জিদ দুই রাকাত।

(৬) ওজুর পর তাহিয়্যাতুল ওজু দুই রাকাত।

(৭) তাহাজ্জুদ (চার হইতে) বার রাকাত।

সফরের সময় (চার রাকাত ওয়ালা) ফরজ (নামাজের ক্ষেত্রে) চার রাকাতের পরিবর্তে দুই রাকাত পড়িতেন। নফল সমূহ সাধারণতঃ ফরজের ন্যায় গুরুত্বের সহিত পড়িতেন না। (কখনো কখনো) এমনও হইয়াছে যে, নফল নামাজ যানবাহনের উপরই পড়িয়া লইয়াছেন।

হুজুরের (ছাঃ) নামাজ দীর্ঘ হইত (অত্যন্ত)। বিশেষতঃ যখন একাকী পড়িতেন। নামাজে কেয়াম (দাড়াঁন) এত লম্বা হইত যে, পা মোবারক ফুলিয়া যাইত। সেজদায় এত দীর্ঘ সময় পড়িয়া থাকিতেন যে, মনোনিবেশকারী (দর্শকের অন্তরেও) আশঙ্কা ও সন্দেহের উদ্রেক হইত। কেরাতের ক্ষেত্রে-প্রতিটি অক্ষর শুদ্ধ শুদ্ধ রূপে পৃথক পৃথক ভাবে (থামিয়া থামিয়া) পড়িতেন। নফল নামাজ (কখনও কখনও) বসিয়া বসিয়াও পড়িয়া লইতেন। হুজুর (ছাঃ) রাত্রকে তিন ভাগে ভাগ করিতেন ঃ

(১) প্রথম ভাগ মাগরিব, এশা ও অন্যান্য নামাজের জন্য।

(২) দ্বিতীয় ভাগ ঘুমানোর জন্য এবং

(৩) তৃতীয় ভাগ তাহাজ্জুদের নামাজের জন্য।

ফরজ রোজা ছাড়াও হুজুর (ছাঃ) সাধারণতঃ সোম ও বৃহস্পতিবারে রোজা রাখিতেন। ইহা ব্যতীত মাসের শুরু, মধ্য অথবা শেষের তিন দিন রোজা রাখিতেন। এইগুলি ব্যতীত ৯ই যিল-হজ্জ, ১০ই মোহাররম এবং ১৫ই শাবান–এর রোজাও হুজুর রাখিতেন। আর (দিন-তারিখের) কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা ও শর্ত ছাড়াও হুজুর (ছাঃ) রোজা রাখিতেন। এতদ্ব্যতীত এমনও হইয়াছে যে, হুজুর (ছাঃ) যখন জানিতে পারিলেন যে, ঘরে (খাবার) কোন কিছু নাই, তখন রোজা রাখিয়া ফেলিয়াছেন। হুজুর (ছাঃ) (একাধারা) দুই–দুই, তিন-তিন দিনও রোজা রাখিতেন। যাহাকে ছাউমে বেছাল (অর্থাৎ ধারাবাহিক রোজা) বলা হয়। যাহা বিশেষভাবে শুধু হুজুরের জন্য বৈধ ছিল। অন্য কাহারও জন্য নহে।

শব্দার্থ ঃ

(মূল উর্দূ কিতাবের পাঠকদের জন্য)

اخلاق – আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি, স্বভাব-চরিত্র। عادتیں - عادت – এর বহু বচন, অর্থঃ অভ্যাস, স্বভাব, রীতিনীতি। محترمہ – সম্মানিতা, মাননীয়া। کنواری – অবিবাহিতা বালিকা বা নারী। عفت – পবিত্রতা, সততা, সাধুতা। پاکدامنی – পূণ্যশীলতা, সংযমশীলতা, নির্মলতা, ستر – লজ্জাস্থান, পর্দা, শরীরের যে অংশ ঢাকিয়া রাখার আদেশ শরীয়তকর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। حد – অন্ত, সীমা, প্রান্ত; আরও দৃঢ়। حد ہونا – চূড়ান্ত হওয়া, নিঃশেষ হওয়া, সমাপ্তি ঘটা। رازدار – বিশ্বস্ত, বিশ্বাসী; রহস্যভেদী, রহস্যবিদ। سیرت – গুণ, স্বভাব, চরিত্র, জীবন-বৃত্তান্ত। طرز – পদ্ধতি, রীতি, অভ্যাস। خفا – অসন্তুষ্ট, বিরক্ত, ক্রোধান্বিত। وسعت – বিস্তৃতি, অবকাশ; উদারতা। عمدگی – সৌন্দর্য, শ্রেষ্টত্ব। کٹر – নির্মম, পাষাণহৃদয়; গোঁড়া। گستاخی – অভদ্রতা, ঔদ্ধত্য। مدار –

পরিধি ; গ্রহের পথ; স্থায়িত্ব, ভরসা; অবলম্বন; কেন্দ্র। همدردی – সহানুভূতি, দরদ, সমবেদনা, সমব্যথা। جوش – উত্তেজনা, আবেগ, উদ্যম। خون ابلنا – ফিনকি দিয়া রক্ত বাহির হওয়া, সবেগে রক্ত বাহির হওয়া। بے دردی – নিষ্ঠুরতা, নির্দয়তা। خیرخواہ – মঙ্গঁল- কামনাকারী, হিতার্থী। انکساری – বিনয়, নতি, বশ্যতা। تواضع – বিনয়, নম্রতা; আতিথেয়তা। حددرجہ – অতিমাত্রায়, নিতান্ত। بلاتکلف – অকপটে। امتیاز -স্বাতন্ত্র্য, পরিচয়, পার্থক্য। راحت – বিশ্রাম, শ্রান্তি, আরাম। اختیار – এখতিয়ার, অধিকার, ক্ষমতা। کوسوں دور – বহুদূর;। کوس – তিন হাজার গজের দূরত্ব। سسکنا -দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলা, মৃত্যুগামীর খোব অল্প জান বাকী থাকা, কাতরানো, নিঃশ্বাস বন্ধ প্রায় হওয়া; ফোঁপাইয়া কাঁদা; ব্যকূল হওয়া। اترانا – অহংকার করা; সদর্পে পদক্ষেপ করা। درمیانی رفتار – মধ্যপন্থা, মধ্যমগতি। نبھانا – সমাধা করা, সমাপন করা, আঞ্জাম দেওয়া। ورم – আব, ফুলা, স্ফীতি।

প্রশ্ন ঃ (মানুষের সহিত সাক্ষাৎ ও) মিলা-মিশার ক্ষেত্রে হুজুরের আচার-ব্যবহার কিরূপ ছিল ?

উত্তর ঃ (মানুষের সঙ্গে হুজুরের) মিলা-মিশার এমন কিছু নিয়ম ছিল, যাহার ফলে প্রতিটি ব্যাক্তি এই ধারনা করিত যে, রাসূলূল্লাহ (ছাঃ)-এর সবচেয়ে বেশী অনুগ্রহ-দৃষ্টি আমার (সেই ব্যক্তির) প্রতি রহিয়াছে। সকলের সঙ্গেই প্রফুল্ল-মুখে সাক্ষাৎ করিতেন। মুচকি হাসি এবং চেহারার প্রফূল্লতা (ও সজীবতা) ছিল হুজুরের সাধারণ (ও নিত্য) অভ্যাস। যাহার ছিল না (কোন) তুলনা।

হুজুর (ছাঃ) আপন সঙ্গীদিগকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। তাহাদের জন্য অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতেন। ধর্মীয় কারণ ব্যতীত (দুনিয়াবী) কোন কারণে পবিত্র মুখ হইতে এমন কোন কথা নিঃসৃত হওয়া ছিল

অসম্ভব, যাহার দ্বারা কাহারও (অন্তরে) কষ্ট হইতে পারে। সাক্ষাৎকারী নিজে যতক্ষণ পর্যন্ত না উঠিত, হুজুর (ছাঃ) ততক্ষণ পর্যন্ত (মজলিস হইতে) উঠিতেন না। অবশ্য কোন অপারগতা থাকিলে উঠিয়া যাইতেন এবং তাহার জন্য ওজরও পেশ করিতেন। মজলিসে কখনও পা প্রসারিত করিয়া বসিতেন না। হুজুর (মজলিসে) মানুষের জন্য জায়গা ছাড়িয়া দিতেন। (চলা-ফিরা ও) উঠা-বসার সময় তাঁহার (ছাঃ) মধ্যে বিশেষ কোন আড়ম্বর ও জাঁকজমক পরিলক্ষ্যিত হইত না। বসার সময় হুজুরের হাঁটু মোবারক সঙ্গী-সাথীদের (হাঁটুর) সম অবস্থানে থাকিত। অগ্রবর্তীও হইত না পৃথকও থাকিত না। মজলিসের যেথায় জায়গা মিলিত, সেথায়ই তিনি (ছাঃ) বসিয়া যাইতেন। বক্ষঃস্থল (তথা সম্মান জনক আসনে বসা)-এর আকাঙ্খা কখনও হুজুর করিতেন না।

বিশেষ বিশেষ (সময় এবং) স্থানে (সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গেঁ) সাক্ষাতের জন্য উত্তম পোষাকও হুজুর (ছাঃ) পরিধান করিতেন। কেশ মোবারক ইত্যাদিও ঠিক করিয়া লইতেন। কোন লোক যদি হুজুর (ছাঃ) কে হঠাৎ দেখিত, তবে অবশ্যই তাহার উপর (হুজুরের) প্রভাব ও ভয় ছাইয়া যাইত। কিন্তু যখনই সে (হুজুরের সঙ্গেঁ) মিলিত হইয়া কথা বার্তা বলিত, (তখনই সে) হুজুরের জন্য পাগলপারা হইয়া যাইত।

হুজুর (ছাঃ) কৌতুক (এবং হাসিতামাশা)ও করিতেন। কিন্তু মিথ্যা কথা কখনও (তাঁহার) মুখে আসিত না। হুজুরের সঙ্গী-সাথীগণ পরস্পর (বসিয়া) আদিম কালের গল্প বর্ণনা করিতেন। হুজুর (ছাঃ) (তখন) চুপ করিয়া বসিয়া শুনিয়া থাকিতেন। তাঁহারা কোন কারণে হাসিলে হুজুরও হাসিয়া ফেলিতেন। আর যখন হুজুর (ছাঃ) কোন কথা বলিতেন, তখন (উপস্থিত ছাহাবীগণ) সকলে চুপ করিয়া শুনিয়া থাকিতেন। কাহারও সঙ্গে

সাক্ষাতের সময় হুজুরই প্রথমে সালাম দিয়া দিতেন। সর্বদা নিজ সঙ্গী-সাথীদের (ভালমন্দ) অবস্থার খোঁজ খবর লইতেন। কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িলে হুজুর তাহার অবস্থা জানার জন্য তাহার বাড়ীতে চলিয়া যাইতেন। কেহ সফরে গেলে হুজুর তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকিতেন। কাহাকেও দুঃখগ্রস্ত বলিয়া জানিতে পারিলে, তাহাকে সান্তনা দিতেন। কাহারও পক্ষ হইতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হইয়া গেলে তাহার ওজর গ্রহণ করিতেন। হুজুরের দরবারে ধনী-দরিদ্র, দুর্বল-সবল সকলেই সমান ছিল।

প্রশ্ন ঃ হুজুর নিজ সময়কে কিভাবে ভাগ করিতেন ? অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ প্রোগ্রাম (ও কর্মধারা) কি ছিল ?

উত্তর ঃ হুজুরের পবিত্র মজলিসের দুইটি দিক ছিল। যাহার ভিত্তিতে হুজুরের সময় বণ্টন করা হইত ঃ

(১) বাড়ীর ভিতর এবং (২) বাড়ীর বাহির।

বাড়ীর ভিতরের সময় কে আবার তিন ভাগে ভাগ করিতেন ঃ

(১) এবাদতের জন্য (২) পারিবারিক কাজকর্ম, কথাবার্তা ও হাস্যরসের জন্য এবং (৩) বিশ্রামের জন্য।

বিশ্রামের সময়ের মধ্য হইতেও আবার একটি অংশ উম্মতের কল্যাণ-কাজের জন্য ওয়াক্ফ করিয়া দিতেন। যাহার প্রক্রিয়া ছিল এইরূপ যে, হুজুর (ছাঃ) বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে (বাড়ীর ভিতরের) দরবারে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ দিতেন। অতঃপর সেই বিশিষ্টলোকদের মাধ্যমে সর্বসাধারণের নিকট (পর্যন্ত) কল্যাণ ও শিক্ষারবাণী পৌছাইতেন। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এমন ছিলেন, যাঁহাদের নিকট দ্বীনী (ধর্মীয়) হোক বা দুনিয়াবী (জাগতিক) হউক, প্রয়োজনীয় কোন কথাই গোপন রাখা হইত না (অর্থাৎ তাঁহারা সকলেই ছিলেন হুজুরের রহস্যবিদ)।

প্রশ্ন ঃ হুজুর (ছাঃ)-এর দরবারে বিশেষত্ব তথা মর্যাদা ও (এবং সম্মান)-এর ভিত্তি বা মাপকাঠি কি ছিল ?

উত্তর ঃ ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব, সৃষ্টির সেবা এবং সহানুভূতিশীলতা।

বাড়ীর অভ্যন্তর ঃ

প্রশ্ন ঃ পরিবারের লোকদের জন্য যেই সময়টি নির্ধারিত ছিল, সেই সময়টি হুজুর (ছাঃ) কি অবস্থায় কাটাইতেন ?

উত্তর ঃ সাধারণ গৃহকর্তাগণ যেইভাবে নিজ স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে থাকেন, হুজুর (ছাঃ)ও তেমনই ছিলেন। তিনি পরিবারের লোকদিগকে পূর্বের যুগের কেচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করিয়াও শুনাইতেন। (পরস্পরে) মনোরঞ্জনকর কথাবার্তাও হইত। রঙ্গরসিকতা আবার কখনও কখনও তিক্ততা ইত্যাদিও সৃষ্টি হইত। হুজুর (ছাঃ) ঘরের কাজ-কর্মেও অংশগ্রহণ করিতেন। হুজুর (ছাঃ) বকরীর দুধও দোহন করিতেন। তিনি (সাধারণতঃ) নিজের কাজ নিজেই করিতেন।

হুজুর (ছাঃ) প্রাত্যহিক রাত্রে ধারাবাহিকভাবে আপন স্ত্রীগণের মধ্য হইতে এক এক জনের নিকট থাকিতেন (ও রাত্রিযাপন করিতেন)। বাকি, দিনে একবার-সাধারণতঃ আছরের (নামাজের) পর প্রত্যেক স্ত্রীর গৃহে হুজুর (ছাঃ) গমন করিতেন। আর (প্রত্যহ) মাগরিবের নামাজের পর (স্ত্রীগণ) সকলে (হুজুরের) সেই স্ত্রীর গৃহে সমবেত হইতেন, যাঁহার নিকট ঐ রাত্রি যাপনের পালা থাকিত।

বিশেষ দরবার ঃ

প্রশ্ন ঃ হুজুরের (ছাঃ) বিশ্রামের সময় হইতে যেই অংশটি উম্মতের জন্য বাহির করা হইত, উহার বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ছিল ?

উত্তর ঃ (১) (সেই) দরবারে উপস্থিতির অনুমতি দানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী অর্থাৎ অধিকজ্ঞান ও আমলসম্পন্ন লোকদের কে প্রাধান্য দেওয়া হইত।

(২) সেই সময়টিকে তাঁহাদের মধ্যে তাঁহাদের ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে বণ্টন করা হইত।

(৩) একটি হউক বা দুইটি হউক বা তিনটি হউক মোটকথা-যত প্রয়োজনই[১] কোন ব্যক্তি লইয়া আসিত, হুজুর (ছাঃ) সেইগুলি মিটাইয়া দিতেন।

(৪) সেই বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে এমন সকল কাজে নিয়োজিত করিতেন, যেগুলি স্বয়ং তাঁহাদের জন্য এবং সমগ্র জাতির সংশোধনের জন্য ছিল (উপযোগী আবশ্যক)

(৫) তাঁহাদের প্রতি এই উপদেশ ছিল যে, তাঁহারা যেন ঐ সকল কথা অনুপস্থিত লোকদের নিকট পৌঁছাইয়া দেন।

(৬) এই উপদেশও ছিল যে, যেই সমস্ত লোক কোন কারণবসতঃ যেমন দূরত্ব অথবা লজ্জা অথবা (আমার) প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ভয় বা অন্য কোন ওজর-আপত্তির কারণে আপন সমস্যাসমূহ আমার নিকট প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, তোমরা তাহাদের সমস্যাগুলি (-এর কথা) আমার নিকট পৌঁছাইয়া দিবে।

(৭) শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সম্পর্কেই (সেই বিশেষ দরবারে) আলোচনা হইত।

টীকা

১. অর্থাৎ ধর্মীয় প্রয়োজনাদি। যেমন- শরীয়তের বিধিনিষেধ ও মাসলা-মাসায়েল জিজ্ঞাসা।

(৮) ইহার (অর্থাৎ সেই বিশেষ দরবারের) ফল এই হইয়া ছিল যে, ছাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) জ্ঞানান্বেষী হইয়া (হুজুরের দরবারে) আসিতেন এবং নববী জ্ঞান-বিজ্ঞানের মুক্তা দ্বারা আঁচল ভর্তি করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেন ও হেদায়াতের পথিকৃৎ (ও দিশারী) হইয়া মজলিস হইতে বাহির হইতেন।

সাধারণ দরবার ঃ

প্রশ্ন ঃ দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ বাহিরের বৈঠক ও সাধারণ দরবারের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ছিল এবং উহার অবস্থা কিরূপ ছিল ?

উত্তর ঃ (১) ধৈর্য, বিশ্বস্ততা, জ্ঞান এবং বিনয় (ও লজ্জা) ছিল সেই জ্যোতির্ময় মজলিসের উজ্জ্বল তারকা পুঞ্জ স্বরূপ।

(২) (সেই মজলিসে) শুধু অভাবগ্রস্তদের ব্যাপারে আলোচনা হইত এবং প্রয়োজনীয় কথা সন্তুষ্টচিত্তে শুনা হইত।

(৩) তথায় সেই সকল বিষয়ই আলোচনা হইত, যেইগুলির মধ্যে প্রতিদানের আশা থাকিত।

(৪) গাম্ভীর্য এবং দৃঢ়তা ছিল পবিত্র সেই মজলিসের রাত্রি স্বরূপ। নীরবতা ছিল উহার বিছানা এবং ভদ্রতা ছিল ছাউনি। (সেথায় কখনও কোন) চিৎকারও শুনা যাইত না এবং (কোন) গোলমালও হইতনা। তথায় না ছিল কোন ঝগড়া, না অনর্থক কৌতুক। না কাহারও অসম্মান করা হইত, না অবজ্ঞা। শালীনতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্বয়ং হুজুর (ছাঃ)ও মজলিসে পা প্রসারিত করিয়া বসাটা পর্যন্ত পছন্দ করিতেন না।

(৫) সময়ের (যথাযথ ও) পুরাপুরি মূল্যায়ণ করা হইত।

(৬) আগন্তুকগণ দ্বীনী কথাবার্তা শুনার বাসনা লইয়াই আসিতেন এবং ন্যায় ও সত্যপথের উজ্জল প্রদীপরূপ ধারণ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেন।

(৭) স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষ হইতে আগন্তুকদের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ন আচরণ করা হইত এবং তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা হইত।

(৮) যেই কোন সম্প্রদায়ের (-ই হউক,) সম্ভ্রান্ত, নেতৃস্থানীয় এবং সম্মানিত ব্যক্তিদের ইজ্জত করা হইত।

(৯) সম্ভব হইলে দরবারে রিসালাত (ছাঃ)-এর পক্ষ হইতেও সেই সম্মানিত ব্যক্তিটিকেই উক্ত সম্প্রদায়ের নেতা বানাইয়া দেওয়া হইত।

(১০) লোক সকলকে আল্লাহ্র শাস্তির ব্যাপারে করা হইত সতর্ক। উপদেশ দেওয়া হইত ক্ষতিকর বিষয়াদি হইতে বাঁচিবার জন্য।

(১১) এমন কোন কাজ করা হইত না, যাহার দরুন কাহারও কষ্ট হয়।

(১২) হাস্যমুখ, সৌজন্যসুলভ আচরণ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করা হইত না।

(১৩) বন্ধু-বান্ধবদের খোঁজখবর লওয়া হইত।

(১৪) পারস্পরিক মামলা–মোকদ্দমাসমূহ যাচাই করিয়া নিশ্চয়তার সহিত মীমাংসা করা হইত।

(১৫) ভালকাজের প্রশংসা করিয়া (উহার প্রতি) সমর্থন ও উৎসাহিত করা হইত।

(১৬) মন্দ কাজের কুফল বর্ণনা করিয়া উহা হইতে বাঁচার উপদেশ দেওয়া হইত।

(১৭) সকল কাজ এবং সকল আমলের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থায় কার্যসম্পাদন করা হইত।

(১৮) লোকদের সংশোধনের প্রতি পূর্ণ খেয়াল রাখা হইত। উহাতে কোন প্রকার অবহেলা বা উদাসীনতা প্রদর্শন করা হইত না।

(১৯) প্রতিটি কাজের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা থাকিত।

(২০) সত্য কথা বা এ ব্যাপারে (কোন প্রকার) কমিও করা হইত না এবং অতিরঞ্জনও না।

(২১) গোপনীয় বিষয়সমূহকে আমানত মনে করা হইত।

(২২) অভাবগ্রস্ত এবং পথিকদের যথাযথরূপে খোঁজখবর লওয়া হইত।

(২৩) প্রীতি ও ভালবাসার জ্যোৎস্না থাকিত বিস্তৃত। প্রতিটি ব্যক্তি হুজুর (ছাঃ) কে আপন পিতা মনে করিতেন। আর সৃষ্টিকুল ছিল (সেই দরবারে) সন্তানতুল্য। অধিকারের ক্ষেত্রে তাহারা (সকলেই) ছিল সমান।

(২৪) প্রতিটি ব্যক্তির প্রতি সমান ভাবে লক্ষ্য রাখা হইত। আপসে সকলেই সমান বলিয়া পরিগণিত হইতেন।[১]

(২৫) হুজুর (ছাঃ) এর আসন গ্রহণের অবস্থাও এমন ছিল যে. অপরিচিত ব্যক্তি চিনিতে পারিত না–হুজুর (ছাঃ) কোন জন ?

টীকা

১. সাথী-সঙ্গীদের সহিত সমতা রক্ষার ব্যাপারে এই দুইটি ঘটনা অবশ্যই স্মরণ রাখা উচিৎ; যেগুলি সুরূরুল মাহ্যুন হইতে সংক্ষিপ্তভাবে এইখানে নকল করা হইতেছে –

প্রথম ঘটনা ঃ একদা হুজুর (ছাঃ) সফরে ছিলেন। বকরী জবাই করার সিদ্ধান্ত হইল। কেহ বলিলেন, আমি জবাই করিব। কেহ বলিলেন, আমি চামড়া ছুলিব। মোট কথা, এইভাবে (সকলে) পৃথক পৃথক কার্য বণ্টন করিয়া লইলেন। হুজুর (ছাঃ) বলিলেন, আমি খড়ি কুড়াইয়া আনিব। ছাহাবীগণ আবেদন জানাইলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা খাদেমরা কিসের জন্য! ইসলামী সাম্যের শিক্ষক হুজুর (ছাঃ) বলিলেন, আমি কাহারও হইতে বড় হইয়া থাকিতে চাহি না।

(বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন)

(২৬) অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়ানো ছিল হুজুরের অপছন্দ। ইহাও হুজুরের অপছন্দ ছিল যে, হুজুর (ছাঃ) বসিয়া থাকিবেন আর অন্য লোকেরা দাড়াইয়া থাকিবে।

(২৭) অবশ্য বড়দের প্রতি সম্মান এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করা হইত।

(২৮) যাহার কল্যাণকামিতা ব্যাপক হইত, তাহাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করা হইত। বড় বলিয়া সে-ই পরিগণিত হইত, যে সৃষ্টির প্রতি সাহায্য-সহানুভূতিশীলতায় বেশী অংশ গ্রহণ করিত।

(২৯) কাহারও কথা ছেদন (তথা অগ্রাহ্য) করা হইত না।

(৩০) প্রথম বক্তার কথা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কেহ কথা বলার অনুমতি পাইতেন না। (ততক্ষন পর্যন্ত) সকলেই চুপ করিয়া (প্রথম বক্তার বক্তব্য) শুনিতে থাকিতেন।

টীকা

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার বাকী অংশ)

আল্লাহ্ তা'আলা এমন সকল বান্দাদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন, যাহারা আপন সঙ্গীদের উপর অহংকার প্রদর্শন করে। অতঃপর সকলে উঠিলেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করিলেন। আর হুজুর (ছাঃ) কুড়াইলেন কাঠ।

অপর এক সফরের ঘটনা ঃ নামাজের জন্য যাত্রীদল থামিল। লোকজন উট হইতে অবতরণ করিলেন। নামাজের প্রস্তুতি হইতে লাগিল। (সেই সময়) হুজুর (ছাঃ) তড়িৎ নিজ উটের দিকে চলিলেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, হুজুর ! কোথায় যাইতেছেন ? তিনি (ছাঃ) বলিলেন, উট বাঁধিয়া আসিতেছি। ছাহাবীগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা উপস্থিত আছি। আমরাই বাঁধিয়া দেই। হুজুর (ছাঃ) বলিলেন, "না! (স্বাভাবিক অবস্থায়) অন্যের নিকট সাহায্য চাওয়া কাহারও জন্য বৈধই (তথা উচিৎ) নহে। এমনকি মেসওয়াকের ডালা সংগ্রহেও অন্যের নিকট সাহায্য চাহিবে না!"

(৩১) হুজুর (ছাঃ) যখন কিছু বলিতেন, তখন উপস্থিত লোকদের মধ্যে এমন নিরবতা বিস্তার লাভ করিত যেন (তাঁহারা) কতগুলি নিস্প্রাণ দেহ।

(৩২) হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) বলেন, হুজুর (ছাঃ) সর্বদা তিনটি জিনিস হইতে নিরাপদ ও পবিত্র ছিলেন– (১) ঝগড়া (২) অহংকার এবং (৩) নিষ্প্রয়োজনীয় কথাবার্তা। আর তিনটি জিনিস হইতে সর্বদা জনসাধারণকে নিরাপদে রাখিয়াছেন (১) অপবাদ (২) পাপান্বেষণ (তথা অন্যের দোষ তালাশ) এবং (৩) (মানুষের) গোপন কথা প্রকাশ করা।

(৩৩) (উক্ত সাধারণ দরবারে প্রতিটি লোকের) উঠা-বসা, মোট কথা-সকল কার্য আল্লাহ পাকের জিকিরের সঙ্গে সম্পাদিত হইত।

শব্দার্থ ঃ

(মূল উর্দূ কিতাবের পাঠকদের জন্য)

عنایت – অনুগ্রহ, সুদৃষ্টি। **خندہ پشانی** – হাস্যমুখ, প্রফুল্লমুখ। **تبسم** – মুচকিহাসি। **تازہ روئی** – চেহারার সজীবতা ও প্রফুল্লতা। **معذرت** – অপারগতা, অক্ষমতা, ওজর। **اٹھنا بیٹھنا** – উঠা-বসা। **جوں جوں** – যতই, যত, যেমনি, যখনি, যেইমাত্র। **خوش طبعی** – কৌতুক, রসিকতা, হাসিতামাশা। **خیریت دریافت** – অবস্থা জানা। **مزاج پرسی** – অবস্থা জিজ্ঞাসা করা, দৈহিক অবস্থা জানিতে চাওয়া। **دلداری** – সান্ত্বনা (দেওয়া)। **عذر** – আপত্তি, ওজর : ক্ষমা। **پروگرام** – ধারা, পদ্ধতি, রীতিনীতি, শৃঙ্খলা, বিন্যাস। **بار یابی** – দরবারে উপস্থিতি, সভায় প্রবেশ। **خصوصیت** – বিশেষত্ব, বৈশিষ্ট্য। **مدار** – স্থায়িত্ব, ভরসা, ভিত্তি, অবলম্বন। **دلچسپی** – মনহারী, সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী, আকর্ষনীয়। **هنسی مذاق** – রঙ্গ রসিকতা, হাসিতামাশা, কৌতুক। **شکر رنجی** –

।৬ক্ততা, বিরক্তি, দুঃখ, বিবাদ, অনৈক্য, দ্বন্দ্ব। نمبر – পালা, সময়। دربار – দরবার, সভাগৃহ, রাজসভা। غرض – অর্থাৎ, মোটকথা, সংক্ষেপতঃ এই, অর্থাৎ, সারকথা এই। مفید – উপযোগী, উপকারী। رعب – প্রভাব-প্রতিপত্তি, ভক্তিপ্রযুক্ত ভয়; ভীতি। شان – অবস্থা ; গৌরব, মহিমা ; জাঁকজমক, মহত্ব, মাহাত্ম্য, দীপ্তি। سنجیدگی – গাম্ভীর্য, চিন্তাশীলতা, বিবেচনা ; গুরুত্ব ; পবিত্রতা, ধৈর্য, সহ্য। متانت – দৃঢ়তা, গাম্ভীর্য। سکون – বিরাম, শান্তি, নীরবতা। تهذیب – সভ্যতা, ভদ্রতা, সৌকুমার্য। سائبان – খড়ের ছাউনি, কুড়ে ঘর। شور – চিৎকার, গোলমাল। غوغا – গোলমাল, চিৎকার ; জনতা। آبرو ریزی – অপমান, অসম্মান, সম্মানহানি। توهین – অবজ্ঞা, কুৎসা, মানহানি। طالب – অনুসন্ধানকারী, প্রশ্নকারী, ছাত্র। رشد – ন্যায়পরায়নতা, সাধুতা, সরলপথ-প্রাপ্তি। هدایت – উপদেশ, পথ দেখান, পরিচালনা করা, সত্যপথ। دلداری – সান্ত্বনা, সৌজন্য, কোমল আচরণ, সন্তোষ, হৃদ্যতা, সহানুভূতি প্রদর্শন। مانوس – পরিচিত, সুপরিচিত, অন্তরঙ্গ। شریف – ভদ্র, অভিজাত। سربرآورده – নেতা, সরদার, সম্মানিত ব্যক্তি। نقصان ده بات – বিপত্তিকর, ক্ষতিকর, অনিষ্টকর বিষয়। خوش خلقی – প্রফুল্লচেহারা, সৌজন্যতা, ভদ্রতা ,প্রসন্নতা। دلجوئی – প্রীতি, ভালবাসা; সন্তোষ, সান্ত্বনা, আরাম, সন্তুষ্টি। معاملات – লেন-দেন, কারবার, কাজকর্ম, চুক্তি, ব্যাপার; সমস্যা, মোকদ্দমা, বিষয়সমূহ, কাজ। تحقیق – অনুসন্ধান, যাচাই, খোঁজন; বিশ্বস্ততা, নিশ্চয়তা প্রতিপাদন, প্রকৃত প্রমাণ। اصلاح – সংশোধন, সন্ধি, মিমাংসা, মিটমাট, রফা। حاجت والوں – অভাবগ্রস্ত, অপারগ, দরিদ্র, মুখাপেক্ষী। مسافر – পথিক, পর্যটক, অপরিচিত ব্যক্তি। آپس میں – পরস্পরের মধ্যে, আপসে, আপনা- আপনির মধ্যে। غمگساری – শহানুভূতিশীলতা। چھاجانا – ছাইয়া ফেলা, ছাইয়া যাওয়া, বিস্তৃতিলাভ করা, আচ্ছাদন করা, ছাওয়া। مذمت – অপবাদ, তিরষ্কার, ঘৃণা।

হুজুর (ছাঃ)-এর কথাবার্তা এবং বচন-ভঙ্গি ঃ

প্রশ্ন ঃ কথাবার্তা এবং বাক্যবিনিময়ের ক্ষেত্রে হুজুর (ছাঃ)-এর কি কি বৈশিষ্ট এবং কি কি রীতিনীতি পরিলক্ষিত হইত ? এবং তাঁহার বচন-ভঙ্গি কিরূপ ছিল ?

উত্তর ঃ হুজুর (ছাঃ)-এর যুগে আরবী ভাষাশৈলী- অনর্গলত্ব, অলঙ্কার, সৌন্দর্য এবং শ্রেষ্ঠত্বের (দিক হইতে সাহিত্যের) সর্বোচ্চ সোপানে (উন্নীত) ছিল। উন্নতমানের কবি এবং জাদুবর্ণনবক্তার (তখন) অভাব ছিল না। জনসাধারণ কর্তৃক (সাহিত্যচর্চার) মূল্যায়নের অবস্থা এই ছিল যে, শ্রেষ্ঠ কবিতা এবং কাছীদা সমূহকে তাহারা সেজদা করিত। কবিদের ব্যাপারে এই বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছিল যে, জিনেরা তাহাদের অনুগত থাকে। সেই জিনেরাই তাহাদিগকে কবিতা শিক্ষা দেয়। (ফলে) তাহারা কবিদের অনেক সম্মান করিত। কিন্তু ভাষার এত সব উন্নতি ও অগ্রগতি সত্ত্বেও হুজুরের (ছাঃ) মনোরম ও মধুর বাণী, তাঁহার সুমিষ্ট কথাবার্তা এমনই উন্নত এবং এতই সুন্দর ছিল যে, বড় বড় কবি–সাহিত্যিকগণও উহার সামনে মাথা নত করিয়া দিত। হুজুর (ছাঃ)-এর ছোট ছোট বচন আজও হাদীস শরীফের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। বাস্তব সত্য (হইল) এই যে, (তাঁহার ঐ সকল ছোট ছোট বচনের মধ্যে) জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহা সাগরকে যেন ছোটকায় কলশের মধ্যে ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে। হুজুর (ছাঃ)–এর সংক্ষিপ্ত- কিন্তু পরিপূর্ণ বাণী ছিল হক-বাতিল তথা সত্য-মিথ্যার (মধ্যকার দ্বন্দ্বের) যথার্থ সমাধান। (তাঁহার বক্তব্য) অশালীনতা অথবা কাহারও কুৎসারটনা হইতে ছিল পবিত্র; লৌকিকতা ও ধোকাবাজী হইতে ছিল উর্ধ্বে। নিষ্প্রয়োজনীয় একটি অক্ষরও হুজুরের মুখ হইতে নির্গত হইত না।

হুজুরের কথাবার্তা ছিল কোমল ও (যথাসুন্দর) ধীর গতির। (তাঁহার বক্তব্যের) প্রতিটি অক্ষর এবং প্রতিটি শব্দ ছিল পৃথক ও স্পষ্ট। (হুজুর এমনটি এই জন্য করিতেন) যাহাতে শ্রোতা উহা শুনিয়া মুখস্থও করিয়া লইতে পারে। কথার মধ্যে অস্পষ্টতা, দ্রুততা বা ক্ষিপ্রতার কোন স্থান তথায় ছিল না। তিনি (ছাঃ) কখনও কখনও একটি বাক্যকে দুই তিনবার পুনরাবৃত্তিও করিতেন। যাহাতে (বক্তব্য) ভালভাবে বুঝিয়া লওয়া যায়। হুজুর (ছাঃ) শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে, মুখ খুলিয়া কথা বলিতেন।

প্রশ্ন ঃ হুজুর (ছাঃ) ঘরের লোকদের সঙ্গে কিভাবে কাটাইতেন (এবং কিরূপ আচরণ করিতেন) ?

উত্তর ঃ হুজুর (ছাঃ) বাহিরে যেমন হাসিখুশী থাকিতেন, বাড়ীর ভিতরে ও তেমনি হাসিখুশীতেই কাটাইতেন এবং উহাকেই পুণ্য (ও ছওয়াবের কাজ)মনে করিতেন। হুজুর (ছাঃ) সফরের সময় লটারি দিতেন। উহাতে যেই স্ত্রীর নাম আসিত, তাঁহাকেই সফরে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। তিনি (ছাঃ) বলিতেন ভাল মানুষ তাহারা, যাহারা পরিবারের লোকদের সহিত (সদাচরণ করে ও) ভালভাবে থাকে। ইন্তেকালের সময় হুজুর (ছাঃ) -এর নয় জন স্ত্রী জীবিত ছিলেন। কিন্তু (তাঁহাদের) কেহই এমন ছিলেন না, যিনি হুজুর (ছাঃ)-এর জন্য আত্ম-উৎসর্গাভিলাষীণী নন। হুজুরের ব্যাপারে তাঁহাদের কাহারও কোন অভিযোগ ছিল না। হুজুর (ছাঃ) কাহারও বৈধ সহানুভূতির ক্ষেত্রে কখও কার্পণ্য করিতেন না। মানুষের বৈধ চাহিদাসমূহ তিনি (ছাঃ) অনায়াসে পূর্ণ করিয়া দিতেন। তিনি আপন পবিত্রা স্ত্রীগণের বান্ধবীদিগেরও সম্মান করিতেন। তাঁহাদের নিকট হাদিয়া-উপঢৌকন পাঠানোর ব্যবস্থা করিতেন। পুরুষদের প্রতি হুজুরের এই নির্দেশ ছিল যে, "তোমরা স্ত্রীগনের প্রতি পূর্ণলক্ষ্য রাখিবে। তাহারা তোমাদের অধীনস্থ ;

অতএব তাহাদের সহিত ভাল আচরণ করিতে ত্রুটি করিবে না"। আর স্ত্রীগনের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, "তোমরা স্বামীদের পরিপূর্ণ আনুগত্য করিবে। উহাতেই তোমাদের পরিত্রাণ। যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও সেজদা বৈধ হইত, তবে সে স্বামীই ছিল।

প্রশ্ন ঃ দাস-দাসীদের সঙ্গে হুজুরের আচরণ কিরূপ ছিল ?

উত্তর ঃ হুজুর (ছাঃ)-এর সর্বব্যাপী দয়া ও উদারতার মধ্যে দাস-দাসী এবং মুক্ত-স্বাধীন, সকলের সমান হিস্সা (বা অংশ) ছিল। দাসদিগকে সন্তান-সমমর্যাদায় রাখা হইত। (দাস-দাসীদের সঙ্গে সুন্দর আচরনের ফলে, সন্তান এবং দাসের মধ্যে আচার-আচরণে পার্থক্য না করার কারণে) হযরত যায়েদ, যিনি ছিলেন হুজুর (ছাঃ) -এর আজাদকৃত গোলাম, তাঁহাকে হুজুরের পুত্র বলা হইত। এই প্রসিদ্ধি এত ব্যাপক হইল যে, তিনি "যায়েদ বিন মোহাম্মদ" নামে খ্যাত হইয়া গেলেন। (তিনি একজন আজাদকৃত গোলাম হওয়া সত্ত্বেও হুজুর (ছাঃ) নিজ ফুফাত বোন (যয়নব)-এর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ পড়াইয়া দেন।

পূর্বে তোমরা পড়িয়াছ যে, মূতার যুদ্ধে তিন সহস্র (লোক)-এর মুসলিম সৈন্যদলের ইনিই ছিলেন সেনাপতি। যাঁহার অধীনে হুজুর (ছাঃ) -এর চাচাত ভাই হযরত জাফরও (রাঃ) ছিলেন। হযরত যায়েদ-তনয় উসামা (রাঃ) আজও "মাহ্বুবে রাসূলুল্লাহ" (বা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদরনীয়) নামে খ্যাত রহিয়াছেন। মক্কা বিজয়ের সময় হুজুর (ছাঃ)-এর পার্শ্বে একই উটনীর উপর তিনিও সওয়ার ছিলেন এবং ইন্তেকালের কিছু দিন পূর্বে সেই বিরাট বাহীনির সেনাপতিও হুজুর (ছাঃ) তাঁহাকেই বানাইয়া ছিলেন, যাহার মধ্যে হযরত ছিদ্দিকে আকবর এবং ফারূকে আজম (রাঃ)-এর মত ব্যক্তিগণও শামিল ছিলেন।

(হুজুরের দরবার হইতে)- সাধারণ মুসলমানদিগকেও সেই (ধরণের) ব্যবহারই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। হুজুর বলিয়াছেন

مَوَالِى الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ (অর্থাৎ, কোন সম্প্রদায়ের আজাদকৃত গোলামদিগকে সেই সম্প্রদায়ভুক্তই মনে করিতে হইবে।) এই কারণেই বনু-হাশেমের আজাদকৃত গোলামদিগকে জাকাত দেওয়া শরীয়তে ঐরূপভাবে নিষিদ্ধ, যেরূপভাবে স্বয়ং বনু হাশেমকে দেওয়া নিষিদ্ধ।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি দীর্ঘ দশ বৎসর হুজুরের (ছাঃ) সান্নিধ্যে ছিলাম। কিন্তু সফরে-হজরে (অর্থাৎ উপস্থিতিতে) ঘরে-বাহিরে (এক কথায়) সর্বত্র যেই পরিমাণ খেদমত আমি হুজুর (ছাঃ)-এর করিতাম, তাহা হইতে অধিক হুজুর (ছাঃ) আমার খেদমত করিতেন। হুজুর (ছাঃ) কখনও (অভিযোগের সুরে) আমাকে (এই কথা) বলেন নাই যে, এমনটি কেন করিয়াছ বা এমনটি কেন কর নাই ?

শব্দার্থ ঃ

(মূল উর্দূ কিতাবের পাঠকদের জন্য।

گفتگو – কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা। فصاحت – অনর্গল কথন, বাকপটুত্ব, বাগ্মীতা, চারুতা, সৌন্দর্য, অনর্গলত্ব। بلاغت – ভাষার অলঙ্কার; বাগবৈদগ্ধ্য। خوبی – সৌন্দর্য, শ্রেষ্ঠত্ব; প্রকৃষ্টতা। جادوبیان – মন্ত্রবর্ণনা, জাদুবর্ণন বক্তা, বক্তৃতায় পটু যে। قصیدہ – কবিতা, কাহারো প্রশংসা বা নিন্দাবর্ণিত কবিতা কাছীদা। پیارا – মনোরম, আদরনীয়, প্রিয়। اونچا – উচ্চ, উন্নত। موجود – বিদ্যমান, উপস্থিত, বর্তমান, প্রস্তুত। کوزہ – পানি রাখিবার মৃৎপাত্র, কলসি, কলশ, কুম্ভ। بیہودگی – অভদ্রতা, অনুপযুক্ততা, অশালীনতা; অলাভ, অহিতাচার, অপকার; ছেলেমি, বোকামী, বাবুগিরি, অসম্ভাব্যতা। تکلفات – লৌকিকতা, বাহ্যিকতা; অস্বাভাবিকতা; ছলনা, ছলা-কলা, কৌশল; প্রচলিত রীতি-নীতি রক্ষা, আচার অনুষ্ঠান, লোকদেখানো। سہولت – আরাম, মসৃনতা,

কোমল, সহজ। صفائى – স্পষ্ট, স্পষ্টতা। تاكه – যেন, যাহাতে, যাহে। قرعه ڈالنا – লটারী দেওয়া, ভাগ্য পরীক্ষা করা। فدائى – উৎসর্গাভিলাষী, উৎসর্গাভিলাষীনী। دلدارى – হৃদ্যতা, সবরতা, সহানুভূতি, সহানুভূতিশীলতা। فرمائش – (ক্রয় করার) আদেশ, কার্যের ভার, আবেদন, আহবান, চাহিদা, প্রয়োজন। پورى پورى – পুরাপুরি, সম্পূর্ণরূপে। پڑھ چکے ھو – অবশ্যই পড়িয়াছ। صاحبزاده – পুত্র, তনয়। برتاؤ – আচরণ, ব্যবহার, চরিত্র, রীতিনীতি। برابر – পার্শ্ব; সমান, সমান্তরাল; সহজ-সরল, সোজা; অনবরত, বিরামহীন।

বেচাকেনা–লেনদেন

প্রশ্নঃ হুজুর (ছাঃ) অন্যান্য (সাধারণ) লোকদের সঙ্গে কি কি (ধরণের) লেনদেন করিতেন এবং কিভাবে করিতেন ?

উত্তর ঃ হুজুর (ছাঃ) সাধারণ মানুষের সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় উভয়ই করিয়াছেন। নবুওয়তের পূর্বে হুজুরের বিক্রয় (সংক্রান্ত লেনদেন)-এর সংখ্যা ছিল বেশ এবং নবুওয়তের পর তুলনামূলকভাবে পূর্ব হইতে বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেনের সংখ্যা) ছিল কম। আর হিজরতের পর (উহার সংখ্যা ছিল) আরও কম। অবশ্য (পরবর্তী) সেই দিনগুলিতে ক্রয় (সংক্রান্ত লেনদেন)-এর সংখ্যা ছিল অধিক। হুজুর (ছাঃ) নগদ ক্রয়-বিক্রয়ও করিয়াছেন এবং বাকীতেও করিয়াছেন। হুজুর (ছাঃ) মজুরের কাজও করিয়াছেন। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ছাগলও (বকরী) চরাইয়াছেন। হযরত খাদীজার (রাঃ) পক্ষ হইতে (বাণিজ্য) পরিচালক হিসাবে সিরিয়াও গমন করিয়াছেন। আবার অন্যদেরকেও (আপন কাজের জন্য হুজুর (ছাঃ)) শ্রমিক এবং চাকর হিসাবে রাখিয়াছেন। হুজুর (ছাঃ) নিজেও অপরের ম্যানেজার (প্রতিনিধি) হইয়াছেন। আবার অন্যদেরকেও নিজের প্রতিনিধি বানাইয়াছেন। উপঢৌকন দেওয়া এবং লওয়া, দান করা এবং দান গ্রহণ করা, এই (ধরণের) সকল লেনদেনই (হুজুরের এইখানে) পাওয়া যাইত।

কিন্তু (হুজুর (ছাঃ) অপরকে) উপঢৌকন দিয়া বা কোন কিছু দান করিয়া যত আনন্দিত হইতেন, গ্রহণ করিয়া ততটুকু নহে। হুজুর (ছাঃ) যদি কাহারও নিকট হইতে কিছু ধার লইতেন, তবে (আদায়ের সময়) উহা হইতে উত্তম জিনিস আদায় করিতেন এবং তৎসঙ্গে জীবন ও সম্পদের বরকতের জন্যও দোয়া করিতেন। কিন্তু হুজুর সুদ লওয়া, সুদ দেওয়া, সুদের চুক্তি লিখা, ইত্যাদি ইত্যাদি (সুদ সম্পর্কিত) সব (কর্মকান্ডকেই) হারাম সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন- সুদের পাপের ছাব্বিশতম অংশ (ষষ্ঠবিংশাংশ) হইল মায়ের সঙ্গে ব্যভিচারের সমতুল্য (আল্লাহ্র পানাহ্)। একদা হুজুর (ছাঃ) কোন একটি জিনিস বাকীতে ক্রয় করিলেন এবং মূল্য আদায়ের পূর্বে উহা বিক্রয় করিয়াদিলেন। ঘটনাক্রমে উহাতে লাভ হইল। হুজুর (ছাঃ) সেই লভ্যাংশ বিধবা এবং এতিমদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন।

হুজুর (ছাঃ) একবার জনৈক ব্যক্তির নিকট হইতে একটি উঁট বাকিতে লইলেন। সেই ব্যক্তি তাকাদা করিতে আসিল এবং হুজুরের সঙ্গে কর্কশ (ভাষায়) কথাবার্তা বলিল। ছাহাবাগণ (ইহাতে) রাগান্বিত হইলেন। হুজুর (ছাঃ) তখন সকলকে থামাইয়া দিলেন। আর বলিলেন- পাওনাদারের বলার অধিকার রহিয়াছে।

আরেক বার অন্য এক ব্যক্তির সঙ্গে এমনই ঘটনা সংঘঠিত হইয়াছিল। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) তখন উপস্থিত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হইলেন। হুজুর (ছাঃ) তাঁহাকে নিবৃত্ত ও শান্ত করিয়া দিয়া বলিলেন- তাহার পরিবর্তে আমাকে (কিছু কঠোর কথা) বলা উচিৎ ছিল তোমার ! সে তো আপন অধিকার চাহিতেছে!

একবার এক ইহুদীর সঙ্গে এমনই অবস্থা সৃষ্টি হইয়া ছিল। সে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই তাকাদার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অন্তত্য কর্কশ ভাষায় বাক্যবিনিময় করিল। সে এই পর্যন্ত বলিল যে,

“আপনাদের অভ্যাস এরূপই! সর্বদা টালবাহানা করাই আপনাদের চরিত্র!” (তাহার এহেন ধৃষ্টতা দেখিয়া) ছাহাবীগণ জবাব দিতে চাহিলেন। কিন্তু হুজুর (ছাঃ) তাঁহাদিগকে বিরত রাখিলেন। ইহার পরও ইহুদীর পক্ষ হইতে কর্কশতা ও কঠোরতাই বৃদ্ধি পাইতে ছিল। কিন্তু প্রতি উত্তরের ক্ষেত্রে হুজুরের নম্রতা, ভদ্রতা ও ধৈর্য্য বাড়িতে চলিয়াছিল। শেষপর্যন্ত সেই ইহুদী হুজুরের জন্য আত্মহারা হইয়াগেল এবং বলিতে লাগিল, আপনার মধ্যে নবুওয়তের সকল আলামত আমি পাইয়াছি বটে। শুধু (অপরের পক্ষ হইতে) কর্কশ কথা ও (কটুবাক্য শুনার কারণে উদ্ভূত) ক্রোধের সময় আপনার ধৈর্য্যের পরীক্ষাটা বাকি ছিল। অদ্য তাহাও পূর্ণ হইয়া গেল। এখন আমাকে আপনার খেদমতের জন্য গ্রহণ করুন এবং ইসলামে দীক্ষিত করিয়া আমাকে সম্মানিত (ও ধন্য) করুন!

শব্দার্থ ঃ

(মূল উর্দূ কিতাবের পাঠকদের জন্য)

معامله – চুক্তি, লেনদেন, কারবার, আদান-প্রদান; ঘটনা। حقدار – পাওনাদার, দাবীদার, ঋনদাতা। ٹالنا – ফাঁকি দেওয়া, টালবাহনা করা, বিলম্ব করা। نرمی – নম্রতা। حلم – ভদ্রতা, সহনশীলতা, ধৈর্য্য। بردباری – ধৈর্য্য, সহ্য, গাম্ভীর্য।

পানভোজনের ক্ষেত্রে হুজুর (ছাঃ)-এর অভ্যাস

প্রশ্ন ঃ খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রে হুজুর (ছাঃ)-এর অভ্যাস ও নিয়ম-নীতি কিরূপ ছিল ?

উত্তর ঃ আল্লাহ পাকের অতিসাধারণ নেয়ামতকেও হুজুর (ছাঃ) অত্যন্ত বড় দান মনে করিতেন। মূল্যবান হউক বা স্বল্পমূল্যের হউক, যাহাই সামনে আসিত, তাহাই হুজুর গ্রহণ করিতেন। ফিরাইয়া দিতেন না। অবশ্য শর্ত ছিল- না-জায়েয ও অবৈধ (বস্তু) না হওয়া।) (প্রয়োজনীয়

কোন বস্তু) যদি না জুটিত, তবে হুজুর ধৈর্য্য ধরিতেন। তাই কত কত সময় উপবাস অবস্থায় কাটিয়া যাইত। হুজুর (ছাঃ) পেটে পাথর বাঁধিতেন। কিন্তু তাঁহার ধৈর্য্যে ফাটল ধরিত না। তুষ্টিতে কোন কমি হইত না। এমনও হইয়াছে যে, মাসের পর মাস অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু গৃহের চুল্লী ঠান্ডা অবস্থায়ই পড়িয়া ছিল। যখন খাওয়াদাওয়ার জন্য বসিতেন, তখন প্রথমে হাত ধৌত করিয়া লইতেন এবং "বিস্‌মিল্লাহ্" পড়িতেন। হাত কিংবা অন্য কোন জিনিসের উপর টেক লাগাইয়া, অনুরূপভাবে-ছোট টেবিল (যাহা চৌকির মত হইয়া থাকে) বা মেজ-এর উপর হুজুর খানা খাইতেন না। কারুকার্যপূর্ণ ছোট ছোট বাসনেও হুজুর (ছাঃ) খানা খাইতেন না। বরং একই বড় থালা বা ডিশের মধ্যে অনেক লোক -এর সঙ্গে হুজুর একত্রে খানা) খাইয়া লইতেন। মাটির উপর দস্তরখান বিছানো হইত। উহার উপরই হুজুর খাইতেন। আল্লাহ্ পাকের নেয়ামতের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করিতেন না। খাবার পছন্দ হইলে খাইতেন। নতুবা হাত উঠাইয়া লইতেন। কখনও খুঁত বাহির করিতেন না। (খাওয়াদাওয়া হইতে) ফারেগ হওয়ার পর যখন (অবশিষ্ট) খানা উঠানো হইত, তখন বলিতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَاَرْوَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ·

(আল-হামদু লিল্লাহিল লাযী আত্‌আমানা ওয়া সাকানা ওয়া আরওয়ানা ওয়া জাআলানা মিনাল মুস্‌লিমীন)

অর্থ ঃ আল্লাহর শুক্‌র-যিনি আমাদিগকে খানা খাওয়াইলেন। আমাদিগকে তৃপ্ত এবং সজীব (ও প্রাণবন্ত) করিলেন এবং আমাদিগকে করিলেন মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।

হুজুরের খাদ্য ছিল একেবারেই ঠাটবাট-শূণ্য। এক বারের ঘটনা। হযরত হাসান (রাঃ) আপন দুই সঙ্গীকে লইয়া হযরত সালমা (রাঃ)-এর

নিকট গেলেন এবং বলিলেন ঃ হুজুর (ছাঃ) যে খাদ্য পছন্দ করিতেন, (দয়া করিয়া) উহা পাকাইয়া আমাদিগকে খাওয়াও না !

হযরত সালমা বলিলেনঃ প্রিয় বৎসগণ ! ঐ খাদ্য আজ (এই যুগে) তোমাদের পছন্দ হইবে না-হইতে পারে না।

হযরত হাসান বলিলেন ঃ সালমা না ভাল ! এমনটি হইবেনা। অবশ্যই পছন্দ হইবে।

হযরত সালমা তখন উঠিলেন এবং অল্প কিছু যব পেষিয়া হাঁড়িতে ঢালিলেন। সামান্য কিছু যয়তূন-তৈল সেই গুলির উপর ছিটাইয়াদিলেন এবং সামান্য মরিচ ও কিছু জিরা ইত্যাদি (সেইগুলির সঙ্গে) মিলাইয়া বলিলেন ঃ এই খাদ্য ছিল হুজুর (ছাঃ)-এর প্রিয় (খাদ্য)।

চালনি সেই যুগে ছিল না। যবের আটা পেষা হইত এবং ফুকিয়া উহার অতিরিক্ত বস্তু (অর্থাৎ ভুসি ইত্যাদি) উড়ানো হইত। পাতলা (চাপাতি) রুটি হুজুর (ছাঃ)-এর ভাগ্যে কখনও জুটে নাই। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও নবুওয়তের পূর্ণ সময়ের মধ্যে কখনও এমন হয় নাই যে, হুজুর (ছাঃ) সেই যবের রুটি দ্বারা (-ই অন্ততঃ) ক্রমাগত দুই দিন পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। অধিকাংশ সময় এমন হইত যে, কত কত রাত্রি উপবাসে কাটিয়া যাইত। কোমর সোজা করা এবং ভর করার জন্য হুজুর (ছাঃ) পেটে পাথর বাঁধিতেন। অবশ্য (ঐ সকল দুঃখ-কষ্ঠ, অর্ধাহার-অনাহার) এই কারণে ছিল না যে, আয় কম ছিল ! বরং এই জন্য যে, দুনিয়ার সকল এতিম ও গরীব ছিল হুজুর (ছাঃ)-এর সম্পদে সমান অংশীদার। বরং হুজুর (ছাঃ) তাহাদের অধিকারকেই প্রাধান্য দিতেন। হুজুরের দরবারে যাহা কিছু আসিত, উহা তৎক্ষণাৎ খরচ হইয়া যাইত।

হুজুর (ছাঃ) বলিয়াছেন–সির্কা অতিউত্তম ব্যঞ্জন (অর্থাৎ সালন)। হুজুর লবনেরও এই বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন যে, উহা দরিদ্রের রুটিকে সুস্বাদু করিয়া (আনন্দের সহিত) গলাধঃকরণ করাইয়া দেয়। হুজুর (ছাঃ) কখনও পেটভরিয়া খাইতেন না। সর্বদা কিছুটা ক্ষুধা রাখিয়া দিতেন (অর্থাৎ ক্ষুধা কিছুটা বাকি থাকিতেই হুজুর খাবার ত্যাগ করিতেন)।

হুজুর (ছাঃ) ভিজা (খাবার) জিনিসসমূহ তিন অঙ্গুলি দ্বারা খাইতেন। আহার শেষে (ছাঃ) সেই (অঙ্গুলি)-গুলি চাটিয়া খাইতেন। (খাবারের পাত্রের) মধ্যাংশ হইতে অথবা ছাঁটিয়া বাছিয়া (বিভিন্ন অংশ হইতে) খাইতে হুজুর নিষেধ করিতেন। হাড়ে গোশ্‌ত অবশিষ্ট থাকিতে হুজুর উহা ফেলার অনুমতি দিতেন না। হুজুর (ছাঃ) পতিত (খাদ্য) দ্রব্য উঠাইয়া পরিষ্কার করিয়া খাওয়ার জন্য উৎসাহিত করিতেন। দস্তরখানে পতিত (খাবারের) টুকরাসমূহ উঠাইয়া খাওয়াকে সৌভাগ্যের কারণ বলিয়া আখ্যায়িত করিতেন। পেয়ালা এবং (ছোট) হাঁড়ির তলানি হুজুর (ছাঃ) বিশেষভাবে (আগ্রহের সঙ্গে) খাইতেন। হুজুর (ছাঃ) কখনও ছদকার জিনিস খাইতেন না। অবশ্য হাদিয়া-উপঢৌকন আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করিতেন ও ভক্ষণ করিতেন।

পানি ইত্যাদি পানের ক্ষেত্রে হুজুর (ছাঃ)-এর অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি (স্বাভাবিক অবস্থায়) বসিয়া, অত্যন্ত প্রশান্তির সাথে তিন দমে পানি পান করিতেন এবং প্রতিবারেই পান-পাত্র পবিত্র মুখ হইতে আলাদা করিয়া নিশ্বাস নিতেন এবং এই ভাবেই পানি পান করার হুকুম দিতেন।

প্রশ্ন ঃ ছদকা এবং হাদিয়ার মধ্যে পার্থক্য কি ?

উত্তর ঃ ছদকা হইল এই যে, ছওয়াব ও প্রতিদান প্রাপ্তির লক্ষ্যে কোন দরিদ্র-মুখাপেক্ষীকে কোন জিনিস দেওয়া এবং উহাতে কোন বিশেষ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব (অর্থাৎ তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করা) উদ্দেশ্য না হওয়া।

পক্ষান্তরে হাদিয়া বলা হয় ঐ জিনিসকে, যাহা কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শনার্থে পেশ করা (বা দেওয়া) হয়।

প্রশ্ন ঃ কোন ব্যক্তি যদি হাদিয়া পাঠাইত, সেই ক্ষেত্রে হুজুর (ছাঃ)-এর নিয়ম-নীতি কি ছিল ?

উত্তর ঃ তিনি (ছাঃ) উহা গ্রহণ করিতেন (হাদিয়া এবং পেশকারীর জন্য) দোয়া করিতেন। আর সেই ব্যক্তি হাদিয়া হিসাবে যাহা পেশ করিয়াছে, উহা হইতে উত্তম জিনিস তাহাকে (হাদিয়ার প্রতিদান হিসাবে) দেওয়ার চেষ্টা করিতেন।

প্রশ্ন ঃ হুজুর (ছাঃ)-এর সাধারণ খাবার কি ছিল ?

উত্তর ঃ সামান্য কিছু শুষ্ক খেজুর, যবের রুটি, ছাতু, দুধ ও গোশত।

প্রশ্ন ঃ কি কি জিনিস হুজুরের পছন্দনীয় ছিল ?

উত্তর ঃ লাউ, মধু ও গোশত। বিশেষভাবে প্রাণীর বাহুর গোশত হুজুরের খুব প্রিয় ছিল।[১]

প্রশ্ন ঃ কি কি জিনিস হুজুর (ছাঃ) এর অপছন্দনীয় ছিল ?

উত্তর ঃ রসুন, পিঁয়াজ এবং দুর্গন্ধময় জিনিস সমূহ।

টীকা

১। অবশ্য ইহার কারণ হযরত আয়েশা (রাঃ) এই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, গোশ্ত কখনও কখনও পাকানো হইত। আর হুজুরের অবসর ছিল কম। তাই বাহুর গোশ্ত যেহেতু তাড়াতাড়ি গলিয়া যায় ও সিদ্ধ হয় এবং দ্রুত উহা গলাধঃকরণ করা যায় ; এই জন্য হুজুর (ছাঃ) উহাকে অধিক পছন্দ করিতেন।

শব্দার্থ ঃ

(মূল উর্দূ কিতাবের পাঠকদের জন্য)

کهانے پینے – খানাপিনা, পানভোজন, খাওয়াদাওয়া। بڑهیا – উত্তম, শ্রেষ্ঠতর, মূল্যবান। گهٹیا – স্বল্পমূল্য, নিকৃষ্ট। صاف گذرنا – উপবাস থাকা, ভুখা অবস্থায় কাটান। خوان – চৌকীর মত ছোট মেজ, খাবার মেজ। پرتکلف – অত্যন্ত সজ্জিত, কঠোর পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে বানানো, কারুকার্যপূর্ণ। طشت – থালা, রেকাব। قاب – বড় আকারের কাঠের গামলা, বড় বাসন, বড় থালা, ডিশ্, প্লেট। کهینچ لینا – উঠাইয়া লওয়া ; গুটাইয়া লওয়া। تکلفات – লৌকিকতা, শোভনতা ; কৃত্রিম, আড়ম্বর, জাঁকজমক, ঠাটবাট। هانڈی – মৃৎপাত্র, হাঁড়ি। پهوکٹ – অতিরিক্ত, অনুপকারী, মূল্যহীন, অকেজো, ভুসি, খোসা। شکم سیر – পরিতৃপ্ত, পূর্ণপেট। سهارا – ভর, নির্ভর, সাহায্য। سرکه – সির্কা, টক ও ঝাঁজযুক্ত পানীয়। سالن – তরকারী, সালন, মাছ-মাংস বা শাক-সবজীর ব্যঞ্জন বিশেষ, ঝোল। فراغت – অবসর, মুক্তি, বিরতি, সমাপ্ত করিয়া। هنڈیا – ছোটহাঁড়ি, ডেগচি। تلچهٹ – গাদ, তলানি। نوش جان فرمانا – খাওয়া, পান করা। خصوصیت – বৈশিষ্ট্য, বিশেষত্ব, মর্যাদা। مرغوب – প্রিয়, পছন্দনীয়, চিত্তাকর্ষক।

আরাম ও বিশ্রাম

প্রশ্ন ঃ হুজুর (ছাঃ)-এর নিদ্রা ও শয়নের নিয়ম-রীতি কি ছিল ?

উত্তর ঃ হুজুর (ছাঃ) সাধারণতঃ ওজুর সহিত ঘুমাইতেন। শয্যায় গমণের সময় প্রথমে উহা ঝাড়িয়া লইতেন। অতঃপর আগে ডান পা বিছানায় রাখিতেন (ও পরে বাম পা)। আর ডান হাতের উপর ডান গাল রাখিয়া ডান পার্শ্বদেশের উপর হুজুর এমনভাবে শয়ন করিতেন, যেন কেবলার দিকে মুখ থাকে। অর্থাৎ তখন কেবলা ডান দিকে থাকিত। আর হুজুর (ছাঃ) তখন এই দোয়া করিতেন ঃ

رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

(রাব্বি ক্বিনী আযাবাকা ইয়াউমা তাবআছু ইবাদাকা)

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক ! যে দিন তুমি তোমার বান্দাদিগকে উঠাইবে, সেদিন আমাকে তোমার শাস্তি হইতে রক্ষা করিও।

হুজুর (ছাঃ) ঘুমানোর পূর্বে তেত্রিশ বার سُبْحَانَ اللّٰهِ (সুবহানাল্লাহ), এবং তেত্রিশ- তেত্রিশ বার করিয়া اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আল্-হামদুল্লিাহ) ও اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আক্‌বার) পড়িতেন। আর এক- একবার করিয়া আয়াতুল কুরসী ও চার কুল নিজেও পড়িতেন এবং উম্মতকেও উহার শিক্ষা দিতেন। হুজুর (ছাঃ) ইহাও বলিতেন যে, قُلْ هُوَ اللّٰهُ (কুল হুওয়াল্লাহ্) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (কুল আঊ'যু বিরাব্বিল ফালাক্ব) এবং قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ (কুল আঊ'যু বিরাব্বিন্নাস) পড়িয়া দুই হাতে দম করিয়া সমস্ত শরীরে বুলাইয়া দিবে! এরূপ তিনবার করিবে। এইগুলি ছাড়া আরও অনেক সূরা পড়ার অভ্যাস হুজুরের ছিল!

হুজুর (ছাঃ) কাপড়ের বিছানায়ও ঘুমাইয়াছেন এবং চামড়ার বিছানায়ও। হুজুর কাল (পশমী) কম্বল এবং শুধু মাদুরের উপরও ঘুমাইয়াছেন। আবার (শুধু) চট ও চামড়ার উপরও ঘুমাইয়াছেন। দু'জাহানের বাদশা (ছাঃ) খাট্ এবং চৌকির উপরও আরাম করিয়াছেন। আবার মাটির বিছানার উপরও।

হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ)-এর গৃহে হুজুরের বিছানা ছিল চামড়ার। খেজুরের ছাল উহার ভিতরে ভর্তি ছিল। আর হযরত হাফছা (রাঃ)-এর ঘরে হুজুরের বিছানা ছিল চটের। উহা (ভাঁজ করিয়া) ডবল করিয়া হুজুর (ছাঃ)-এর জন্য বিছাইয়া দেওয়া হইত। একদিন উহাকে চার

ভাঁজ করিয়া হুজুর (ছাঃ)-এর জন্য বিছাইয়া দেওয়া হইল। সেই দিন তাহাজ্জুদ নামাজ-এর জন্য জাগ্রত হইতে [এবং উঠিতে] হুজুরের বিলম্ব হইয়া গেল। তখন হুজুর (ছাঃ) হযরত হাফসাকে বলিয়া ছিলেন ঃ "আগামীতে কখনও এমনভাবে (চৌ-ভাঁজ করিয়া) বিছানা বিছাইও না! দুই ভাঁজ করিয়াই বিছাইয়া দিও!"

নিদ্রাবস্থায় হুজুর (ছাঃ)-এর (নাকের) নিঃশ্বাসের আওয়াজ (নাসিকা ধ্বনি) কিছুটা অবশ্যই শুনা যাইত। কিন্তু উহা বিরক্তিকর ছিল না। হুজুরের চক্ষু মোবারক ঘুমাইত। কিন্তু কলব মোবারক থাকিত জাগ্রত– ওহীর জন্য অপেক্ষমান। থাকিত হযরত জিবরাইল (আঃ)-এর প্রতি ধাবিত ও নিবিষ্ট। হুজুর (ছাঃ) যখন ঘুম হইতে জাগ্রত হইতেন, তখন বলিতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَمَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

(আল্ হামদু লিল্লাহিল্ লাযী আহ্য়ানা বা'দামা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্ নুশূরু)

অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাকের জন্যই সকল প্রশংসা, যিনি আমাদিগকে (আমাদের) মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দান করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহারই নিকটে (সকলকে) প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

শব্দার্থ ঃ

(মূল উর্দূ কিতাবের পাঠকদের জন্য)

بستر – বিছানা। ناگوار – ঘৃণিত ; অপ্রীতিকর, বিরক্তির। قلب – হৃদয়, অন্তর।

পোশাক–পরিচ্ছদ ইত্যাদি

প্রশ্ন ঃ হুজুর (ছাঃ) -এর পোশাক কেমন কেমন ছিল ?

উত্তর ঃ হুজুর (ছাঃ)-এর পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল (খুবই) সাদাসিধা ও অনাড়ম্বর। অনেক সময় পুরাতন তালিযুক্ত (কাপড় হুজুর পরিধান করিতেন)। কিন্তু (সেইগুলি হইত) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। অধিকাংশ সময় সুগন্ধিতে (থাকিত) সুরভিত। সবুজ বা লাল ডোরাযুক্ত ইয়ামানের তৈরী লুঙ্গি, চাদর এবং সাদা পোশাক সাধারণতঃ হুজুরের পছন্দনীয় ছিল।

পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে হুজুরের সাধারণ অভ্যাস ও নিয়ম ছিল এই যে, যাহা সহজলভ্য হইত, তাহাই হুজুর (ছাঃ) ব্যবহার করিতেন। সুতরাং হুজুর (ছাঃ) সুতি, পশমী এবং কাতান– সবধরনের কাপড়ই ব্যবহার করিয়াছেন। এমনিভাবে চাদর, জামা, পাগড়ি, টুপী, চামড়ার মোজা, জুতা- এই সকলও হুজুর (ছাঃ) ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা ছাড়া (প্রয়োজনের ক্ষেত্রে) সময়মত যাহা জুটিয়াছে (তাহাই হুজুর ব্যবহার করিয়াছেন)। প্রয়োজনের সময় হুজুর (ছাঃ) জুব্বা এবং সংকীর্ণ হাতাবিশিষ্ট শেরওয়ানীও পরিধান করিয়াছেন। হুজুর (ছাঃ) পাজামাও ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা পরিধানের পূর্বেই হুজুরের ইন্তিকাল হইয়া গিয়াছিল।

অবশ্য হুজুরের পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় ছিল অতি জরুরী। যথা ঃ

১. রেশমী না হওয়া।

২. সোনার কারুকার্য খচিত (রেশমী) বস্ত্র না হওয়া।

৩. এমন পোশাক না হওয়া, যাহা হইতে অহংকার ঝরে (ও গর্ব

প্রকাশ পায়)। এইজন্যই হুজুর (ছাঃ) পায়ের গিঁঠের নিচে লুঙ্গি ও পাজামা পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কারণ, ইহা অহঙ্কারপূর্ণ অভ্যাস ও রীতি (অর্থাৎ অহঙ্কারীদের জাতস্বভাব)।

৪. পোশাক এমন না হওয়া, যাহা দ্বারা লোক দেখানো উদ্দেশ্য হয়। চাই (বাস্তবে) উহা তুচ্ছ ও নিকৃষ্টই হউক না কেন।

৫. পোশাক এমন না হওয়া, যাহাতে মহিলাদের সঙ্গে সাদৃশ্য সৃষ্টি হয়। সুতরাং লাল রঙ্গের পোশাক হইতে হুজুর (ছাঃ) পুরুষদেরকে বারণ করিয়াছেন।

৬. বস্ত্র এমন না হওয়া, যাহা অন্য কোন সম্প্রদায়ের বিশেষ পোশাক (ও প্রতীক)।

একথা সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মূল্যবান পোশাকের নাম অহংকার নহে। আবার নিকৃষ্ট (ও নিম্নমানের) পোশাকের নামও সুফীত্ব বা আধ্যাত্মিকতা নহে। বরং অহংকার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, স্বজাতীয় লোকদের উপর বড়ত্ব-বড়াই প্রদর্শন করা। পক্ষান্তরে আধ্যাত্মিকতা হইল তাহার (অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তি সত্তার) মধ্যে অহংকার ও লোক দেখানো বাহ্যাড়ম্বরের চিহ্ন পর্যন্ত না থাকা। আর রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ)-এর সুন্নতের অনুসরণ করা। ঐ সাধারণ পোশাকও মন্দ, যাহা লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে পরিধান করা হয়। আবার সেই মূল্যবান পোশাকও ভাল (ও শরীয়ত সম্মত) যাহার উদ্দেশ্য গর্ব ও অহংকার প্রদর্শন নহে, বরং আল্লাহ পাকের নেয়ামত ও তাঁহার অনুগ্রহ-স্বীকারই যাহার লক্ষ্য হইয়া থাকে।

হুজুর (ছাঃ) উন্নতমানের পোশাকও পরিধান করিয়াছেন, আবার নিম্নমানেরও। ইন্তিকালের সময় হুজুর (ছাঃ) যে পোশাক পরিহিত ছিলেন, তাহা ছিল মোটা কাপড়ের (যাহার) ভাঁজে ভাঁজে স্তরে স্তরে (ছিল) তালি লাগানো।

হুজুর (ছাঃ) বলিতেন, জামা-কাপড়ে জোড়া-তালি লাগানোর পূর্বে যেন উহা পরিত্যাগ না করা হয়। আর যখন পরিত্যাগ করা হইবে, তখন যেন কোন দরিদ্রকে উহা প্রদান করা হয়।

হুজুর (ছাঃ) পাগড়ি (পরিধানের সময় উহা)-র প্রান্ত বাহির করিয়া রাখিতেন। কখনও কখনও পাগড়ির উভয় প্রান্তকেই নিচের দিকে লটকাইয়া রাখিতেন। হুজুর পাগড়ি এইভাবে বাঁধিতেন যে, পাগড়ির ডান অংশ উপরে থাকিত এবং নিচে টুপি থাকিত।

প্রশ্ন ঃ হুজুরের চাদর, লুঙ্গি এবং পাগড়ির দৈর্ঘ-প্রস্থ কি পরিমাণ ছিল ?

উত্তর ঃ হুজুর (ছাঃ)-এর চাদর ছিল ছয় হাত লম্বা ও তিন হাত চওড়া লুঙ্গি ছিল চার হাত এক বিঘত লম্বা ও দুই হাত এক বিঘত চওড়া। আর পাগড়ি ছিল সাত হাত লম্বা।

প্রশ্ন ঃ হুজুর (ছাঃ)-এর ব্যবহৃত আংটিটি রৌপ্যের ছিল ? না কি স্বর্ণের ছিল ? হুজুর উহা কোন হাতে পরিধান করিতেন ? উহার পাথরটি কোন দিকে থাকিত ?

উত্তর ঃ হুজুরের আংটিটি ছিল রৌপ্যের। স্বর্ণের আংটি হুজুর (ছাঃ) (পুরুষদের জন্য চিরতরে) নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। আর যেহেতু হুজুরের আংটির মধ্যে সীলমোহর ছিল এবং সীলমোহরের প্রয়োজনও হইত। তাই প্রয়োজনের সময় সাধারণতঃ হুজুর (ছাঃ) ডান হাতেই আংটি পরিধান করিতেন। কখনও কখনও বাম হাতেও লাগাইতেন। উহার মণিটি (অর্থাৎ পাথরটি) ভিতরের দিকে (তথা) হাতের তালুর দিকে থাকিত।

শব্দার্থ ঃ

(মূল উর্দূ কিতাবের পাঠকদের জন্য)

ميسر – সহজ লভ্য, প্রাপ্ত, অর্জিত, উপস্থিত, প্রস্তুত। كتان – শন, কাতান, একপ্রকার সূক্ষ্ম কাপড়। چوغا – জুব্বা, আবা। تنگ آستین – আঁট সাঁট বা অপ্রশস্ত হাতা। اچکن – শেরওয়ানী, লম্বা জামা বিশেষ। زربفت – সোনার কারুকার্যখচিত রেশমী বস্ত্র; সোনা। ٹخنا – পায়ের গিঁঠ, টাখনু, গোড়ালির উপরের হাড়। شیوه – রীতিনীতি, ভঙ্গি, ঢং, অভ্যাস, স্বভাব। دکھاوا – বাহ্যাড়ম্বর, লোকদেখানো, জাঁকজমক। خواه – চাই, যদিও। گھٹیا – স্বল্পমূল্য, নিকৃষ্ট, নিম্নমানের। ردی – প্রত্যাখ্যাত, তুচ্ছ, নষ্ট। بڑھیا – উত্তম, মূল্যবান। تصوف – আধ্যাত্মিকতা, সূফীত্ব, মরমীবাদ। هم جنس – স্বজাতি, সমজাতি। اثر – চিহ্ন, প্রভাব, ছাপ। شمله – পাগ্‌ড়ির কারুখচিত প্রান্তর, প্রান্তর।

পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ঃ

হুজুর (ছাঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি চুল রাখে, সে যেন নিয়মিত উহা পরিষ্কার করে। হুজুর (ছাঃ) প্রতি দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে মাথা আঁচড়াইতেন। (সর্বোচ্চ) প্রতি অষ্টম দিবসে গোসল করাকে হুজুর (ছাঃ) সুন্নত বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। প্রতি ওজুর সময় মেসওয়াক করাকে হুজুর সুন্নত বলিয়াছেন। এমনিভাবে জুমআর দিনে, ঈদের দিনে এবং কোন মজলিস বা লোক-সমাগমে যাওয়ার সময় মেসওয়াক করা, আতর লাগানো এবং ভাল পোশাক পরিধান করাকে হুজুর (ছাঃ) সুন্নত বলিয়াছেন। তিনি ক্ষৌরকার্যের সর্বোচ্চ সময় চল্লিশ দিন নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। গোঁফ (কর্তন করিয়া) খাট করা এবং দাড়ি লম্বা করাকে হুজুর (ছাঃ) মুসলমানদের প্রতীক বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন (ও ঘোষনা করিয়াছেন)।

হুজুর (ছাঃ) রাত্রে ঘুমানোর পূর্বে সুরমা ব্যবহার করিতেন। প্রত্যেক চক্ষুতে তিন তিন সলা করিয়া সুরমা লাগাইতেন। হুজুর (ছাঃ) প্রস্রাব (তথা মূত্র-পাত্র) ঘরে রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন। ঘর (সর্বদা) পরিষ্কার রাখার জন্য হুজুর (ছাঃ) নির্দেশ দিয়াছেন। হুজুর (ছাঃ) বলিয়াছেন-যেই ঘরে অশুচি-অপবিত্র লোক, অথবা ছবি, অথবা কুকুর থাকে, সেই ঘরে রহমতের ফেরেশ্‌তাগণ প্রবেশ করেন না। হুজুর (ছাঃ) রাত্রি বেলায় খাবার ইত্যাদির পাত্রসমূহকে "বিস্‌মিল্লাহ" বলিয়া ঢাকিয়া রাখিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

হুজুর (ছাঃ) শুধু পানি দ্বারাও ইস্তিঞ্জা (অর্থাৎ প্রস্রাব বা পায়খানার পর শৌচক্রিয়া) করিতেন। আবার শুধু ঢিলা দ্বারাও হুজুর ইস্তিঞ্জা করিতেন। অবশ্য এক সঙ্গে উভয়টি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করাকে হুজুর (ছাঃ) উত্তম বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। (বাড়ি বা বসতির) নিকটবর্তী স্থানে বসিয়া প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে (তথা মল ত্যাগ করা হইতে) হুজুর (ছাঃ) (বারণ ও) নিষেধ করিয়াছেন[১]। ছায়াদার জায়গা, মানুষের বসার স্থান এবং রাস্তার উপরে প্রস্রাব-পায়খানা করা হইতে হুজুর বারণ করিয়াছেন।

(হুজুর (ছাঃ) বলিয়াছেনঃ) শৌচকার্য বাম হস্তে হওয়া বাঞ্ছনীয়। শৌচের হস্তকে মাটি দ্বারা মলিয়া পানি দ্বারা ধৌত করা উচিৎ। অপবিত্র স্থানসমূহে বাম-হাত ও বাম-পা অগ্রে থাকা (তথা-রাখা) বাঞ্ছনীয়। আর পবিত্র ও উত্তম স্থানসমূহে ডান হাত, ডান-পা অগ্রে রাখিবে। প্রস্রাবের জন্য নরম জায়গা তালাশ করা উচিৎ। অথবা মাটি খনন করিয়া এমন করিয়া লওয়া উচিৎ, যেন প্রস্রাবের ছিটা না উঠে।

টীকা

১। হুজুর (ছাঃ) মানুষের দৃষ্টির আড়াল হওয়ার জন্য দুই-দুই চার-চার মাইল পর্যন্ত দূরে চলিয়া যাইতেন।

একদা হুজুর (ছাঃ) দুইটি কবরের পার্শ্ব দিয়া গমন করিতেছিলেন। তখন হুজুর বলিলেন ঃ এই কবরের মুরদাদের উপর সামান্য সামান্য (কারণ–ও) বিষয়ের জন্য শাস্তি হইতেছে। একজন পরোক্ষে মানুষের নিন্দা করিত। অপরজন (প্রস্রাব ইত্যাদির) নাপাক ছিটা হইতে বাঁচিতনা (বরং অসর্তক থাকিত)। প্রস্রাব-পায়খানায় যাওয়ার সময় তাই এই দোয়া পড়িতে হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল খুবছি ওয়াল খাবাইছি)

এবং বাহির হইতে পড়িতে হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ غُفْرَانَكَ

(আল্লাহুম্মা গুফরানাকা)

ইহা ছিল হুজুর (ছাঃ) (আমার জান তাঁহার জন্য উৎসর্গীকৃত)-এর পূত-পবিত্র সুন্নত ও অভ্যাস।

اللهم وفقنا لا تباع سنن حبيبك ونبيك خاتم الانبياء والمرسلين وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين - امين يارب العالمين -

শব্দার্থ ঃ

(মূল উর্দূ কিতাবের পাঠকদের জন্য)

علامت – চিহ্ন, প্রতীক। قرار دینا – নির্ধারণ করা, আখ্যা দেওয়া, চিহ্নিত করা। سلائی – সলা, শলাকা। ارشاد – বর্ণনা, বিবৃতি ; আদেশ। ڈھیلوں – (ڈھیلاএর বহু বচন) অর্থ-ঢিল, ডেলা। قضائے حاجت –পায়খানা করা, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়া। آبدست – শৌচক্রিয়া। نجاست অপবিত্র, আবর্জনা। معمولی নগণ্য, সামান্য। چغلی – পরনিন্দা, পরোক্ষে পরনিন্দা।

বিবাহ-শাদি ঃ

প্রশ্ন ঃ বিবাহ-শাদি কি ধর্মীয় বিষয় ? না কি পার্থিব ?

উত্তর ঃ বিবাহ একটি ধর্মীয় বিষয় বা কাজ।

প্রশ্ন ঃ ধর্মীয়দৃষ্টি কোন হইতে বিবাহের উদ্দেশ্য বা উপকারিতাগুলি কি কি ?

উত্তর ঃ (১) সত থাকিতে পারা ও দৃষ্টি অবনত থাকা (অর্থাৎ) রাখিতে পারা। (২) আল্লাহর এবাদতের জন্য একে অপরের নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া[১]। (৩) আল্লাহর নেক ও ভাল বান্দাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া। (৪) আল্লাহর সৃষ্টিজীব (মানব জাতির অর্ধাংশ)-নারীকূলের জীবন প্রবাহ সুখে-স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হওয়া এবং পুরুষগণ ঘরের ভিতরের (বিষয়াদির) ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হইয়া ধর্মীয় দায়িত্বসমূহ যথা-জেহাদ এমনিভাবে হালাল কামাই ইত্যাদিতে নিয়োজিত থাকা (এবং তাহা আঞ্জাম দেওয়ার সুযোগ পাওয়া)। (৫) আপন ছেলে-সন্তানদের দুঃখ কষ্ট দেখিয়া আল্লাহর (অন্যান্য) সৃষ্টি জীবের দুঃখ-কষ্টের কথা অনুভব করা এবং (মানুষের সঙ্গে) ভাল ব্যবহার ও সৃষ্টজীবের সেবার অভ্যাস (ও মন-মানিসিকতা সৃষ্টি) হওয়া।

টীকা

১। তাইতো (হাদীছ শরীফে) ঐ সকল দম্পতির প্রশংসা করা হইয়াছে. যাহারা রাত্রি বেলায় উঠিয়া তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে এবং একজন উঠিতে অলসতা করিলে অপরজন তাহার উপর পানি ছিটকাইয়া দেয়। হুজুর (ছাঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ দুনিয়ার সর্বোত্তম পুঁজি ও সম্পদ হইল ভাল এবং সতী স্ত্রী।

প্রশ্ন ঃ ইসলাম ধর্মে একই সময়ে (একত্রে) কয়টি বিবাহ্ বৈধ ?

উত্তর ঃ চারটি।

প্রশ্ন ঃ উহার জন্য কি কোন শর্তও আছে ?

উত্তর ঃ (হ্যাঁ আছে ! সেগুলি এইঃ) (১) সকল স্ত্রীর খরচ (একসঙ্গে) বহন করিতে সক্ষম হওয়া। (২) সকলের সঙ্গে একরকম ব্যবহার করা (৩) সকলের সঙ্গে ভাল আচরণ করিতে পারা।

প্রশ্ন ঃ হুজুর (ছাঃ)-এর ইন্তিকালের সময় কতজন স্ত্রী জীবিত ছিলেন ?

উত্তর ঃ নয় জন।

প্রশ্ন ঃ হুজুর (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণের আলোচনা আমাদের কিভাবে করা উচিৎ ? অর্থাৎ তাঁহাদের উপাধি বা পদবী কি ? এবং মুসলমানদের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক কি ধরণের ?

উত্তর ঃ তাঁহারা আমাদের আধ্যাত্মিক মাতা। (তাই আমাদের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক হইল মায়ের সম্পর্ক)। কোরআন শরীফে তাঁহাদের (সঙ্গে আমাদের) এই সম্বন্ধকেই স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। অতএব তাঁহাদের প্রত্যেককেই "উম্মুল মোমেনীন" অর্থাৎ মোমেন-জননী–বলিতে হইবে। ইহাই তাঁহাদের পদবী বা উপধি।

প্রশ্ন ঃ মুসলমানদের জন্য যখন (একত্রে) শুধুমাত্র চারটি বিবাহ জায়েজ, সেই অবস্থায় হুজুর (ছাঃ) এতগুলি বিবাহ কেন করিলেন ? (এবং কি ভাবেই বা করিলেন) ?

উত্তর ঃ যেই আল্লাহ্ সাধারণ মুসলমাদের জন্য একত্রে শুধু চারটি বিবাহ বৈধ রাখিয়াছেন, তিনিই হুজুর (ছাঃ)-এর জন্য একত্রে উহা হইতে অধিক সংখ্যক বিবাহ জায়েজ রাখিয়াছেন।

প্রশ্ন ঃ হুজুর (ছাঃ)-এর বহু-বিবাহের প্রকাশ্য ও বাহ্যিক কোন উদ্দেশ্য বা কারণও ছিল কি ?

উত্তর ঃ হুজুরের বহু বিবাহের কয়েকটি কারণ বা উদ্দেশ্য একেবারেই স্পষ্ট। অতিরিক্ত কারণের ব্যাপারে আল্লাহ্ই ভাল জ্ঞাত।

প্রশ্ন ঃ সেই উদ্দেশ্য বা কারণগুলি কি ? কি ?

উত্তর ঃ (১) হুজুর (ছাঃ) -এর অভ্যাস ও নিয়ম এই ছিল যে, যেই জিনিসের শিক্ষা হুজুর অপরকে দিতেন, উহার উপর (প্রথমে) নিজে. কঠোর ভাবে আমল করিয়া দেখাইতেন। নামাজ[১], রোজা, হজ্জ, জাকাত,

টীকা

১। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ব্যতীত তাহাজ্জুদ নামাজও হুজুর (ছাঃ) অনুরূপ বাধ্যতামূলকভাবেই পড়িতেন। হুজুর (ছাঃ) তাহাজ্জুদ নামাজ অনেক লম্বা করিতেন। তাহাজ্জুদের এক এক রাকাতে অত্যন্ত ধীরস্থির ও শান্তভাবে কয়েক পারা পড়িয়া ফেলিতেন। তাহাজ্জুদ নামাজে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর কারণে পা মোবারক ফুলিয়া যাইত। অনুরূপভাবে হুজুর (ছাঃ) অধিকাংশ সময় রোজা রাখিতেন। "ছাওমে বেছাল" অর্থাৎ মাঝখানে কোন একদিনও রোজা না ভাঙ্গিয়া এক নাগাড়ে অনেক দিন বা সারা বৎসর রোজা রাখা– মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ। কিন্তু হুজুরের জন্য উহা ছিল বৈধ তদ্রুপ মুসলমানদের উপর শুধু জাকাতই ফরজ। অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত নেছাব পরিমাণ সঞ্চিত অর্থ-কড়ির উপর এক বৎসর অতিবাহিত হইলে, উহার চল্লিশভাগের এক ভাগ অসহায়-গরীবদের মাঝে বন্টন করা। কিন্তু হুজুরের জন্য সঞ্চয় করা ছিল নাজায়েজ। তাই রাত্রিতে শয়নকালে ঘরে একটি শস্য-দানা সঞ্চিত থাকাকেও হুজুর বৈধ মনে করিতেন না। এমনি ভাবে সাধারণ মুসলমানদের ত্যাজ্য সম্পত্তি তাহাদের সন্তানেরা পায়। তদুপরি মৃত্যুর সময়ে সমগ্র সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের অধিক সম্পদ ওয়াক্ফ করা কিংবা আল্লাহর-ওয়াস্তে দান করিয়া দেওয়া তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ। হুজুর এর ত্যাজ্য সম্পত্তি ছিল সকল মুসলমানদের জন্য।

(বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন)

ছদকা, জেহাদ, লেনদেন যেমন– ক্রয়-বিক্রয়, ধার-করজ, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি– সর্বক্ষেত্রে হুজুর (ছাঃ)-এর এই অবস্থাই ছিল[১]। সুতরাং যখন (প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ও অবস্থার প্রেক্ষিতে) চার বিবাহের অনুমতি দেওয়া হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে এই নির্দেশও দেওয়া হইল যে সকল স্ত্রীর সঙ্গেই (ভাল ব্যবহার করিতে হইবে,) ভালভাবে থাকিতে হইবে, কাহারও পক্ষ হইতে কোন অভিযোগের সুযোগ যেন না হয়, সেই বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে ; তখন হুজুর (ছঃ) নিজে একত্রে নয়টি বিবাহ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে (সুন্দরভাবে) জীবনযাপন করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, একত্রে অনেক স্ত্রী থাকিলেও এইরূপে (তাহাদের সকলের সহিত) ভালবাসা ও সমতাপূর্ণ আচরণ বজায়রাখা সম্ভব।

(২) যদি বিবাহকে আনন্দ উপভোগের উপকরণই ধরা হয়, তবে সেই ক্ষেত্রেও হুজুর (ছাঃ) কার্যতঃ ইহা দেখাইয়া দিয়াছেন যে, মানুষ- একজন কেন, নয়জন স্ত্রীর মায়া-টানে পড়িয়াও দুনিয়াদার হইয়া যায় না। বরং সেই অবস্থায় থাকিয়াও সে কঠিন হইতে কঠিনতর এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর দ্বীনী খেদমত আঞ্জাম দিতে সক্ষম। দ্বীনের পথে কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করিতে সমর্থ। এমনিভাবে স্বীয় প্রভু আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অধিক হইতে অধিকতর (দৃঢ় ভাবে) আপন সম্পর্ক বজায় রাখিতে সিদ্ধহস্ত।

টীকা

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার বাকী অংশ)

অথচ হুজুর (ছাঃ) সন্তান-সন্ততিগণ উহা হইতে কিছুই পান নাই। হুজুরের জীবনের সকল আয় এবং মৃত্যুরপর তাঁহার সমুদয় ত্যাজ্য-সম্পত্তি ছিল গরীব, অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত। অনুরূপভাবে যুদ্ধ ক্ষেত্রে হুজুর (ছাঃ) এর অবস্থান সম্পর্কে ইতোপূর্বে তোমরা কিছুটা জ্ঞাত হইয়াছ। বদরের যুদ্ধে তো হুজুরের ত্যাগের দৃশ্য ছিল উপমাহীন অতুলনীয়। এক দিকে প্রিয় কণ্যার জান ওষ্ঠাগত। অন্য দিকে হুজুর যুদ্ধের ময়দানে ব্যস্ত। এই রূপ হাজারো ঘটনা ঘটিয়াছে হুজুরের জীবনে।

(৩) আর যদি বিবাহ কে আপদ ও মুসিবত মনে করা [illegible] (ছাঃ)-এর জন্য তাহাই আবশ্যক ছিল। অর্থাৎ দুনিয়ার অন্যান্য বালা-মুসিবতের ন্যায় এই ক্ষেত্রেও হুজুরের উপর [illegible] দুঃখ-দুর্দশা আপতিত হওয়াটাই ছিল আবশ্যক। যাহাতে [illegible] রাসূলের উম্মতগণ (সেই অবস্থায়ও ইসলামের বিধি-নিষেধ মানিয়া চলার ব্যাপারে) ধৈর্য ও শৈর্যের শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে।

(৪) অনেক মাসআলা ও সমস্যা এমন, পুরুষদের মাধ্যমে [illegible] প্রচার-প্রসার অসম্ভব। এমনিভাবে (কোন পুরুষের পক্ষে) পরনারীদের নিকট সেই সমস্ত মাস্আলা বর্ণনা করাটাও লজ্জা-শরমের পরিপন্থী কাজ। সুতরাং হুজুর (ছাঃ)-এর বহু-বিবাহের উদ্দেশ্য হইল-উহার মাধ্যমে ঐসকল গোপন মাসআলা ও বিষয়ের সহজ শিক্ষা ও প্রচারের ব্যবস্থা করা।

(৫) আরও কিছু বিশেষ বিশেষ কারণ ছিল, যাহার পর্যালোচনা "উম্মৎ-জননীগণের" বিশদ আলোচনার মধ্যে আসিবে।

(৬) আল্লাহ না করুন ! হুজুর (ছাঃ)-এর যদি কোন খারাপ উদ্দেশ্য থাকিত, তবে যৌবনেই তাঁহার এই সকল বিবাহ করা উচিত ছিল। জীবনের পাঁচপঞ্চাশটি বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পরে-বৃদ্ধবয়সে [illegible]

প্রশ্ন ঃ হুজুর (ছাঃ)-এর পূর্বের নবীগণও কি একাধিক বিবাহ করিয়া ছিলেন ?

উত্তর ঃ হাঁ ! করিয়া ছিলেন।

প্রশ্ন ঃ উাহার (অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণের বহু বিবাহ সম্পর্কে) বিস্তারিত আলোচনা কর ?

উত্তর[১]**ঃ** সাইয়্যেদুনা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন তিনজন।

সাইয়্যেদুনা হযরত ইয়া'কূব (আঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন চারজন।

সাইয়্যেদুনা হযরত মূসা (আঃ)- এর স্ত্রী ছিলেন চারজন।

সাইয়্যেদুনা হযরত দাউদ (আঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন নয়জনেরও অধিক।

সাইয়্যেদুনা হযরত সোলাইমান (আঃ)- এর স্ত্রী ছিলেন একশতের চেয়েও অনেক অধিক সংখ্যক। তাওরাতের বর্ণনা অনুসারে তো তাঁহার স্ত্রী-সংখ্যা ছিল এক হাজারেরও অধিক।

প্রশ্ন ঃ হিন্দুদের ধর্মীয় বড় বড় সাধুগণও কি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর ঃ হাঁ ! গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রশ্ন ঃ সেই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর ?

উত্তর ঃ (১) রামচন্দ্রজীর[২] পিতা মহারাজা দশরথের স্ত্রী ছিলেন তিনজন। (২) কৃষ্ণজী, যিনি (হিন্দু-ধর্মের) অত্যন্ত বড় অবতার ছিলেন, সাধারণ খ্যাতি অনুসারে তাঁহার স্ত্রী ছিলেন কয়েক শতজন[৩]।

(৩) রাজা পান্ডুর স্ত্রী ছিলেন দুইজন।

(৪) রাজা সনাতনের স্ত্রী ছিলেন দুইজন।

(৫) বৎসরাজের স্ত্রী ছিলেন দুইজন আর দাসী ছিল একজন।

টীকা

১. রাহমাতুল্লিল্ আলামীন খঃ ১ পৃঃ ১৮৮-২৬২, জনাব কাজী মোঃ সালমান সাহেব সালমান মানছুরপুরী।

২. রাহমাতুল্লিল্ আলামীন খঃ ২ পৃঃ ১৫৬।

৩. লালা লাজপত রায় আঁজাহানীর "বহুত কম লীঁ মগর ফির ভী আঠ মানীঁ"।

প্রশ্ন ঃ উম্মুল মোমেনীন (তথা মোমেন-জননী) গণের মোহরানা কি কি ছিল ?

উত্তর ঃ হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর মোহরানা ছিল ছয়টি উষ্ট্র। হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ)-এর মোহরানা ছিল চারশত দিনার তথা স্বর্ণমুদ্রা (অর্থাৎ ভারতীয় দুই হাজার রূপী প্রায়)। অন্য সকলের মোহরানা ছিল পাঁচশত দিরহাম (তথা রৌপ্যমুদ্রা) করিয়া। বর্তমান পরিমাপে যাহার ওজন একশত ত্রিশ তোলা রৌপ্য সমান প্রায়।

প্রশ্ন ঃ হযরত উম্মেহাবীবা (রাঃ)-এর মোহরানা এত অধিতক কেন ছিল ?

উত্তর ঃ এই কারণে যে, আবিসিনিয়ার বাদশাহ স্বয়ং এই মোহরানা নির্ধারণ করিয়া ছিলেন এবং তিনি নিজেই উহা আদায় করিয়া দিয়া ছিলেন। হুজুর (ছাঃ) কে উহা আদায় করিতে হয় নাই (অর্থাৎ সেই মোহরানা হুজুর (ছাঃ) নিজে আদায় করেন নাই)।

প্রশ্ন ঃ হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর মোহরানা কত ছিল ?

উত্তর ঃ তাঁহার মোহরানাও সেই পাঁচশত দিরহাম (-রৌপ্য মুদ্রা)-ই ছিল।

প্রশ্ন ঃ হুজুর (ছাঃ) -এর সহধর্মিণীগণের নাম ও তাঁহাদের পিতা-মাতার নাম কি কি ছিল ? তাঁহাদের কে কোন বংশের ছিলেন ? হুজুরের সঙ্গে বিবাহ কখন হইয়াছে ? পূর্বেও তাঁহাদের কাহারও কোন বিবাহ হইয়াছিল কি না ? হুজুরের সংস্রবে কে কত সময় (জীবিত) ছিলেন ? তাঁহাদের কাহার কখন ইন্তিকাল হইয়াছিল ?

উত্তর ঃ এই সকল জিজ্ঞাসার জবাব নিম্নের নক্‌শা হইতে বাহির করিয়া লও!

উম্মৎ জননী অর্থাৎ নবী-পত্নী পূন্যবতী

১	২	৩	৪
ক্রঃ নং	নাম, উপাধি ও মাতার নাম	পিতার নাম ও গোত্র / বংশ	পূর্বে বিবাহ হইয়াছিল কি না ? হইলে কতটি হইয়াছে ?
১	মোমেন-জননী হযরত খাদিজা (রাঃ) উপাঃ তাহেরা, মাতাঃ ফাতেমা বিনতে জায়েদা।	খোওয়াইলেদ। কুসাই বংশোদ্ভূত কোরাইশ।	পূর্বে তাঁহার দুইটি বিবাহ হইয়াছিলঃ (১) আতিক বিন আয়েজ মাখজুমীর সঙ্গে। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। (২) আবু হালা হিন্দ বিন নাব্বাশের সঙ্গে। তাঁহার সন্তান-সন্ততিও হইয়াছিল।
২	মোমেন-জননী হযরত সাওদা (রাঃ)। মাতাঃ শামুস বিন্‌তে কায়স।	জামআ। লুওয়াই বংশোদ্ভুত কোরাইশ।	পূর্বে সাকরান বিন আমর বিন আবাদূদ-এর সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল।

৫	৬	৭	৮
হুজুরের সঙ্গে কখন বিবাহ হইয়াছে ? উভয়ের বয়স তখন কত ছিল ?	কত দিন হুজুরের খেদমতে ছিলেন ?	মৃত্যু কখন হইয়াছে এবং কোথায় হইয়াছে ?	বিশেষ অবস্থা ও মন্তব্য
যখন হুজুরের বয়স পঁচিশ বৎসর এবং হযরত খাদিজার বয়স চল্লিশ বৎসর।	পঁচিশ বা চব্বিশ বৎসর ছয় মাস।	পবিত্র মক্কায়। তখন হুজুরের বয়স ছিল পঞ্চাশ এবং হযরত খাদিজার বয়স ৬৫ বৎসর।	স্বামী আবু হালা হইতে হযরত খাদিজার তিন পুত্র জীবিত ছিলেন। তাঁহারা সকলে মুসলমান হইয়া ছিলেন। তাঁহাদের নাম ঃ (১) হিন্দ (২) তাহের এবং (৩) হালা। হযরত খাদিজার মোহরানা ছিল ৬টি উষ্ট্র।
নবুওয়তের দশম বৎসর, হযরত খাদিজার মৃত্যুর পর। তখন হুজুর (ছাঃ) এবং হযরত সাওদা উভয়ের বয়স ছিল ৫০ বৎসর।	প্রায় ১৪ বৎসর।	৭২ বৎসর বয়সে, ১৯ হিঃ সনে, মদীনা মোনাওয়ারায়।	তিনি, প্রথমে (নিজে) মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। অতঃপর স্বামীকে মুসলমান বানালেন। ইহার পর উভয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। তথায় স্বামীর মৃত্যু হয়। হুজুর (ছাঃ) তখন এই বিপদ গ্রস্তা বিধবার প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন এবং উভয় জাহানের সম্মানে তাঁহাকে ভূষিত করিলেন।

১	২	৩	৪
ক্রঃ নং	নাম, উপাধি ও মাতার নাম	পিতার নাম ও গোত্র / বংশ	পূর্বে বিবাহ হইয়াছিল কি না ? হইলে কতটি হইয়াছে ?
৩	মোমেন-জননী হযরত আয়েশা (রাঃ)। উপাঃ ছিদ্দীকা। মাতাঃ এই দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ-প্রাপ্তা রমণী হযরত উম্মে রুমান জয়নব।	হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ)। মুররা বংশোদ্ভূত কোরাইশ।	পূর্বে কোন বিবাহ হয় নাই।

৫	৬	৭	৮
হুজুরের সঙ্গে কখন বিবাহ হইয়াছে ? উভয়ের বয়স তখন কত ছিল ?	কত দিন হুজুরের খেদমতে ছিলেন ?	মৃত্যু কখন হইয়াছে এবং কোথায় হইয়াছে ?	বিশেষ অবস্থা ও মন্তব্য
নবুওয়তের একাদশ বর্ষের শাওয়াল মাসে। তখন হুজুরের বয়স ছিল ৫০ বৎসর ৯ মাস। বিবাহের তিন বৎসর পর প্রথম হিজরী সনের শাওয়াল মাসে তাঁহার রুখছতী (অর্থাৎ নব বধুর পিত্রালয় হইতে ১ম বারের মত স্বামীর বাড়ী যাওয়ার অনুষ্ঠান পর্ব সমাধা) হয়। বিবাহের সময় হযরত আয়েশার বয়স ছিল ৬ বৎসর এবং রুখছতীর সময় ৯ বৎসর।	৯ বৎসর পাঁচ মাস প্রায়।	৬২ বৎসর বয়সে, ৫৭ হিঃ সনে ১৭ই রমজানুল মোবারক মাসে, মদীনা তাইয়্যেবায়।	উন্নত প্রতিভা, তীক্ষ্ণ মেধা, স্বভাবজাত বুদ্ধি, অসাধারণ বুঝ শক্তি, অসামান্য বিদ্যা এবং অতুলনীয় কার্য-সম্পাদন ক্ষমতা এবং (নেক ও) সুন্দর আমলের জন্য পত্নীগণের মধ্যে হযরত আয়েশাই ছিলেন হুজুরের নিকট সব চেয়ে বেশি প্রিয়পাত্রীও আদরিণী। বড় বড় ছাহাবীগণ জটিল জটিল সমস্যার ব্যাপারে তাঁহার নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। প্রায় ২২৫০টি হাদিস তাঁহার নিকট হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

১	২	৩	৪
ক্রঃ নং	নাম, উপাধি ও মাতার নাম	পিতার নাম ও গোত্র / বংশ	পূর্বে বিবাহ হইয়াছিল কি না ? হইলে কতটি হইয়াছে ?
৪	মোমেন-জননী হযরত হাফছা (রাঃ)। মাতাঃ হযরত জয়নব বিনতে মাজউন। যিনি অনেক পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়া ছিলেন ।	হযরত ফারুকে আজম ওমর (রাঃ)। কায়াব বংশোদ্ভুত কোরাইশ।	পূর্বে হযরত খুনাইস বিন হোজাফার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। যিনি আবিসিনিয়া এবং মদীনা উভয় স্থানে হিজরত করিয়া ছিলেন। অতঃপর ওহোদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়া তিনি জখমী হন এবং মদীনা শরীফে মৃত্যু বরণ করেন।
৫	মোমেন-জননী হযরত জয়নব (রাঃ)। উপাঃ উম্মুল মাসাকীন।	পিতাঃ খুজাইমা। বনু হেলাল বিন আমের-বংশোদ্ভূত কোরাইশ।	পূর্বে তাঁহার তিনটি বিবাহ হইয়াছিলঃ (১) তোফায়েলের সঙ্গে (২) ওবায়দার সঙ্গে। এই দুইজন ছিলেন হুজুরের বড় চাচা হারেসের পুত্র। আর (৩) আব্দুল্লাহ বিন জাহাশের (রাঃ) সঙ্গে। তিনি ওহোদ যুদ্ধে শহীদ হন।

৫	৬	৭	৮
হুজুরের সঙ্গে কখন বিবাহ হইয়াছে ? উভয়ের বয়স তখন কত ছিল ?	কত দিন হুজুরের খেদমতে ছিলেন ?	মৃত্যু কখন হইয়াছে এবং কোথায় হইয়াছে ?	বিশেষ অবস্থা ও মন্তব্য
৩য় হিজরী সনের শাবান মাসে। হুজুরের বয়স ছিল তখন ৫৫ বৎসর ৬ মাস। হযরত হাফছার বয়স ছিল প্রায় ২২ বৎসর।	৮ বৎসর।	৬০ বৎসর বয়সে, ৪১ হিঃ সনের জুমাদাল উলা মাসে, মদীনা মোনাওয়ারায়।	তিনি ছিলেন অত্যধিক বুদ্ধিমতী, প্রতিভাবতী এবং বীরত্বভাবাপন্না।
৩য় হিঃ সনে। হুজুরের বয়স ছিল ৫৫ বৎসর। আর হযরত জয়নবের বয়স তখন প্রায় ৩০ বৎসর।	দুই মাস বা তিন মাস।	৩০ বৎসর বয়সে, ৩য় হিঃ সনে, মদীনা তাইয়্যেবায়।	দানশীলতায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়া। সেই কারণেই তাঁহার উপাধি "উম্মুল মাসাকীন" (অর্থাৎ-দরিদ্র অসহায়দের মাতা) হইয়া ছিল।

১	২	৩	৪
ক্রঃ নং	নাম, উপাধি ও মাতার নাম	পিতার নাম ও গোত্র / বংশ	পূর্বে বিবাহ হইয়াছিল কি না ? হইলে কতটি হইয়াছে ?
৬	মোমেন-জননী হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)। তাঁহার প্রকৃত নাম ঃ হিন্দ।	আবু উমাইয়্যা। ডাকনাম ঃ জাদুর রাকিব। বনী মাখজুম বংশোদ্ভূত কোরাইশ। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ সেই বংশেরই লোক ছিলেন।	হুজুরের ফুফু "বাররা"--এর পুত্র (অর্থাৎ হুজুরের ফুফাত ভাই) এবং হুজুরের দুধ ভাই হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আসাদ মাখজুমীর সঙ্গে তাঁহার প্রথম বিবাহ হয়। শুরু যুগে ইসলাম গ্রহণকারীগণের মধ্যে তিনি হইলেন প্রায় ১১তম ব্যক্তি। তিনি প্রথমে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন অতঃপর মদীনায়। তিনি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। সর্বশেষে ওহোদ যুদ্ধে অংশগ্রহন করিয়া ২য় হিঃ সনের জুমাদাল উখরা মাসে তিনি শহীদ হন।

৫	৬	৭	৮
হুজুরের সঙ্গে কখন বিবাহ হইয়াছে ? উভয়ের বয়স তখন কত ছিল ?	কত দিন হুজুরের খেদমতে ছিলেন ?	মৃত্যু কখন হইয়াছে এবং কোথায় হইয়াছে ?	বিশেষ অবস্থা ও মন্তব্য
৪র্থ হিঃ সনে বা ৫ম হিঃ সনের জুমাদাছ ছানী মাসে। হুজুরের বয়স ছিল তখন ৫৬ বৎসর এবং হযরত উম্মে সালামার বয়স ২৪ বৎসর।	সাত বৎসর বা সাত বৎসর ৯ মাস।	৮৪ বৎসর বয়সে ৫৯ বা ৬০ হিঃ সনে, মদীনা শরীফে। বর্ণিত আছে যে, হুজুরের পত্নীগণের মধ্যে সর্বশেষে তাঁহারই ইন্তিকাল হইয়াছিল।	ইসলামের (বিধি-বিধান মানিয়া চলার) বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। স্বামীর সঙ্গে হিজরত করিয়া তিনিও মদীনায় আসিতে ছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বজনেরা তাঁহাকে এবং তাঁহার দুগ্ধপোষ্য শিশু কে আটকাইয়া রাখিয়া দিল। স্বামী আল্লার পথে বাহির হইতে যাইয়া স্ত্রী-পুত্রের (এহেন অবস্থার) প্রতি কোন লক্ষ্যই করিলেন না। তখন হইতে তিনি এক বৎসর পর্যন্ত নিয়মিত ঐ স্থানে আসিয়া আসিয়া অঝোরে কাঁদিতেন, যেই স্থানে পরম শ্রদ্ধেয় মাথার মুকুট অর্থাৎ আপন স্বামী হইতে তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিয়া ছিল। অবশেষে সেই কঠিনহৃদয়দের অন্তর নরম হইল। তাহারা তাঁহাকে অনুমতি দিল। তখন তিনি একাকিনীই মদীনা পানে রওয়া করিলেন। এক ব্যক্তি দয়া পরবশ হইয়া তাঁহাকে মদীনার উপকণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিল। স্বামীর ইন্তেকালের সময় হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)-এর সন্তান সন্ততি ছিল কয়েকজন।

১	২	৩	৪
ক্রঃ নং	নাম, উপাধি ও মাতার নাম	পিতার নাম ও গোত্র / বংশ	পূর্বে বিবাহ হইয়াছিল কি না ? হইলে কতটি হইয়াছে ?
৭	মোমেন-জননী হযরত জয়নব (রাঃ)। উপাধিঃ উম্মুল হিকাম। মাতাঃ হুজুরের ফুফু উমাইমা।	জাহাশ বিন ইয়াব। বনী আসাদ বংশোদ্ভূত খোজাইমা গোত্র।	প্রথম বিবাহ হযরত জায়েদ বিন হারেছার সঙ্গে হইয়াছিল। তিনি ছিলেন হুজুরের আজাদকৃত গোলাম। অবশেষে তিনি তাঁহাকে তালাক্ দিয়া দেন।

৫	৬	৭	৮
হুজুরের সঙ্গে কখন বিবাহ হইয়াছে ? উভয়ের বয়স তখন কত ছিল ?	কত দিন হুজুরের খেদমতে ছিলেন ?	মৃত্যু কখন হইয়াছে এবং কোথায় হইয়াছে ?	বিশেষ অবস্থা ও মন্তব্য
৫ম হিঃ সনের জিলকদ মাসে। হযরত জয়নবের বয়স ছিল তখন ৩৬ বৎসর এবং হুজুরের বয়স ৫৭ বৎসর।	৫ বৎসর ৪মাস প্রায়।	প্রায় ৫২ বৎসর বয়সে, ২০ হিঃ সনে, মদীনা শরীফে।	সেই বিবাহ দ্বারা তৎকালীন আরব সমাজের অতি প্রসিদ্ধ এই ভ্রান্ত বিশ্বাসটি খণ্ডন ও মূলোৎপাটন করা হইয়াছিল যে, “পালক পুত্রের সম্পর্ক ঔরসজাত পুত্রেরই মত। সুতরাং (ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীর ন্যায়) পালক পুত্রের স্ত্রীও হারাম।” অথচ জায়েদ বিন হারেছা ছিলেন হুজুর (ছাঃ) -এর মুতাবান্না অর্থাৎ পালক পুত্র (সুতরাং হুজুর (ছাঃ) সেই ভ্রান্ত বিশ্বাস ও প্রথাটিকে খণ্ডনের জন্যই আপন পালক পুত্রের (রাঃ) তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী হযরত জয়নবকে বিবাহ করিয়া ছিলেন।

১	২	৩	৪
ক্রঃ নং	নাম, উপাধি ও মাতার নাম	পিতার নাম ও গোত্র / বংশ	পূর্বে বিবাহ হইয়াছিল কি না ? হইলে কতটি হইয়াছে ?
৮	মোমেন-জননী হযরত জোয়াইরিয়া (রাঃ)।	হারেছ বিন আবি জিরার। বনু মুস্তালিক গোত্রের সর্দার।	তাঁহার প্রথম বিবাহ (মুসাফি' বা) মায়ামিল্‌খ বিন ছাফওয়ান মুস্তালিকী -এর সঙ্গে হইয়াছিল।

৫	৬	৭	৮
হুজুরের সঙ্গে কখন বিবাহ্ হইয়াছে ? উভয়ের বয়স তখন কত ছিল ?	কত দিন হুজুরের খেদমতে ছিলেন ?	মৃত্যু কখন হইয়াছে এবং কোথায় হইয়াছে ?	বিশেষ অবস্থা ও মন্তব্য
৫ম হিঃ সনের শাবান মাসে, গাযওয়ায়ে বনী মুস্তালিকের সময়। তখন উম্মুল মোমেনীন -এর বয়স ছিল ২০ বা ২১ বৎসর। আর হুজুর (ছাঃ) -এর বয়স ছিল ৫৭ বৎসর ৬ মাস প্রায়।	৫ বৎসর ৬ মাস প্রায়।	৬৫ বা ৭১ বৎসর বয়সে, ৫৬ হিঃ সনে, মদীনা তাইয়্যেবায়।	গাযওয়ায়ে বনু মুস্তালিকের সময় তিনি বন্দী হইয়া (মুসলমানদের হাতে আসেন এবং দাসী হিসাবে) হযরত ছাবেত বিন কায়েস (রাঃ) -এর বন্টনে পড়েন। হযরত ছাবেত (রাঃ) মুক্তিপণ আদায়ের শর্তে তাঁহাকে

মুক্ত করিয়া দেওয়ার অঙ্গীকার (ও চুক্তি) করেন। তখন হযরত জোয়াইরিয়া (রাঃ) মুক্তিপণের ব্যাপারে সাহায্য প্রাপ্তির আশায় হুজুরের দরবারে উপস্থিত হইলেন। হুজুর (ছাঃ) (তাঁহার মুক্তিপণের) টাকা আদায় করিয়া দিলেন। আর যেহেতু তিনি গোত্র-পতির কন্যা ছিলেন। তাই হুজুর (ছাঃ) তাঁহাকে (তাঁহার সম্মতিক্রমে) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া লইলেন। যাহার ফলশ্রুতিতে মুসলমানগণ সেই গোত্রের একশত জন এমন ব্যক্তিকে তৎক্ষনাৎ আজাদ ও মুক্ত করিয়া দিলেন, যাহাদিগকে গ্রেফতার করিয়া দাস বানাইয়া তাঁহাদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) মাঝে বণ্টনও করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপ করার কারণ হইল– তাহাদের বংশের সঙ্গে তখন হুজুর (ছাঃ) -এর আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং এমতাবস্থায় তাহাদিগকে বন্দী ও দাস করিয়া রাখার অর্থই হইল-হুজুরের সঙ্গে বেআদবী ও তাঁহার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন (যাহা ছিল ছাহাবায়ে কেরামের পক্ষে অসম্ভব ও কল্পনাতীত)

এই বিবাহের দ্বিতীয় উপকার ছিল এই যে, উল্লেখিত হারেছের সাধারণ পেশা ছিল ডাকাতি। হুজুরের এই বিবাহের পর তাহা বন্ধ হইয়া গেল। মুসলমানগণও পাইলেন নিরাপত্তা।

১	২	৩	৪
ক্রঃ নং	নাম, উপাধি ও মাতার নাম	পিতার নাম ও গোত্র / বংশ	পূর্বে বিবাহ হইয়াছিল কি না ? হইলে কতটি হইয়াছে ?
৯	মোমেন-জননী হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ)। তাঁহার প্রকৃত নাম ঃ রামলা। মাতাঃ ছফিয়্যা বিনতে আবুল আছ।	আবু সুফিয়ান বিন উমাইয়্যা। শুরু যুগে তিনি হুজুরের প্রসিদ্ধ শত্রু ছিলেন। অবশেষে ৮ম হিঃ সনে তিনি মুসলমান হন। বনু উমাইয়্যা বংশোদ্ভূত কোরাইশ।	তাঁহার প্রথম বিবাহ ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাশ -এর সঙ্গে হইয়াছিল।

৫	৬	৭	৮
হুজুরের সঙ্গে কখন বিবাহ হইয়াছে ? উভয়ের বয়স তখন কত ছিল ?	কত দিন হুজুরের খেদমতে ছিলেন ?	মৃত্যু কখন হইয়াছে এবং কোথায় হইয়াছে ?	বিশেষ অবস্থা ও মন্তব্য
৬ষ্ঠ হিঃ সনে। মোমেন-জননীর বয়স তখন হইয়াছিল ৩৬ বৎসর। আর হুজুরের বয়স ছিল ৫৮ উর্ধ্ব।	প্রায় ৫ বৎসর।	৭২ বৎসর বয়সে, ৪৪ হিঃ সনে, মদীনা তাইয়্যেবায় তাঁহার মৃত্যু হয়।	তিনি স্বামীর সঙ্গে (হিজরত করিয়া) আবিসিনিয়ায় গিয়াছিলেন। স্বামী ছিল মদ্যপ। সেইখানকার (মন্দ) লোকদের সঙ্গে মিলিয়া সে ইসলাম পরিত্যাগ করিল। হুজুর (ছাঃ) ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার নিকট

বিবাহ প্রস্তাব পাঠাইলেন (এবং তাঁহাকে আপন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন)। হযরত উম্মে হাবীবার পিতা (তৎকালীন কাফের লিডার) হযরত আবু সুফিয়ানের মধ্যে এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হওয়ার ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। বাস্তব ঘটনা হইল এই যে, অতঃপর (মক্কার কাফের এবং মুসলমানদের মধ্যে) আর কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। সন্ধিকালীন সময়ে একবার আবু সুফিয়ান মদীনায় আসিয়া হযরত আলী (রাঃ) -এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সেই সময় তিনি (আপন কন্যা উম্মে হাবীবা (রাঃ) এর গৃহে তাঁহাকে দেখিতে যাইয়া) হুজুর (ছাঃ)-এর বিছানায় বসিতে (যাইতে) ছিলেন, এমন সময় হযরত উম্মে হাবীবা (হঠাৎ) বিছানা ভাঁজ করিয়া উঠাইয়া ফেলিলেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) -এর বিছানার উপর একজন কাফেরের বসার কোন অধিাকর নাই-সে উহাতে বসিতে পারে না। এই অবস্থা দৃষ্টে আবু সুফিয়ান বলিলেন– "আমার থেকে পৃথক হইয়া মেয়ে আমার (বড়) বিগড়াইয়া গিয়াছে।"

১	২	৩	৪
ক্রঃ নং	নাম, উপাধি ও মাতার নাম	পিতার নাম ও গোত্র / বংশ	পূর্বে বিবাহ হইয়াছিল কি না ? হইলে কতটি হইয়াছে ?
১০	মোমেন-জননী হযরত ছফিয়্যা (রাঃ)। মাতাঃ বাররা বিন্‌তে সামূয়াল।	হুয়াই বিন আখতাব। বনু নাজীর গোত্র-পতি।	(খায়বর-সর্দার) কিনানা বিন আবি হুকাইকের সঙ্গে পূর্বে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। সে যুদ্ধে নিহত হয়। ইহাও বর্ণিত আছে যে, ইহার আগে সাল্লাম বিন মিশকাত ইহুদীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়া ছিল।
১১	মোমেন-জননী হযরত মাইমুনা (রাঃ)। তিনি ছিলেন হযরত জয়নব বিনতে খোজাইমার বৈপিত্রেয় বোন।	হারেছ বিন হোজ্‌ন। বনু হেলাল বিন আমের বংশ।	তাঁহার প্রথম বিবাহ হোতাইব্‌ বিন্‌ আব্দিল উজ্জার সঙ্গে হয়। দ্বিতীয় বিবাহ হয় আবু রুহম বিন আব্দিল উজ্জার সঙ্গে।

৫	৬	৭	৮
হুজুরের সঙ্গে কখন বিবাহ হইয়াছে ? উভয়ের বয়স তখন কত ছিল ?	কত দিন হুজুরের খেদমতে ছিলেন ?	মৃত্যু কখন হইয়াছে এবং কোথায় হইয়াছে ?	বিশেষ অবস্থা ও মন্তব্য
৭ম হিঃ সনের জুমাদাল উখরা মাসে। তখন মোমেন-জননীর বয়স ছিল ১৭ বৎসর। আর হুজুরের বয়স প্রায় ৫৯ বৎসর।	৪ বৎসর প্রায়।	৬০ বৎসর বয়সে, ৫০ হিঃ সনের রমজান মাসে, মদীনা শরীফে তিনি ইন্তেকাল করেন।	তিনি গাযওয়ায়ে খায়বরের সময় মুসলমানদের হাতে বন্দী হইয়াছিলেন। বন্টনে তিনি হযরত দাহিয়ায়ে কাল্‌বী (রাঃ) -এর ভাগে পড়িয়া ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন

তিনি গাযওয়ায়ে খায়বরের সময় মুসলমানদের হাতে বন্দী হইয়াছিলেন। বন্টনে তিনি হযরত দাহিয়ায়ে কাল্‌বী (রাঃ) -এর ভাগে পড়িয়া ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন সর্দার-পত্নী ও সর্দার-কন্যা, সুতরাং হযরত দাহিয়ার নিকট হইতে তাঁহাকে ফিরাই লইয়া দু'জাহানের রাণীর মর্যাদা তাঁহাকে দান করা হইল। বণ্টনের পর ছফিয়্যার চেহারা মলিন দেখিয়া হুজুর (ছাঃ) তাঁহাকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তিনি বলিলেন– এইস্থানে আপনার আগমনের পূর্বে আমি একদা স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম– চাঁদ আপন স্থান হইতে সরিয়া আমার কোলে আসিয়া গিয়াছে। সরিয়া (কক্ষচ্যুত হইয়া) আমার কোলে আসিয়া গিয়াছে। অথচ, খোদার কসম ! আপনার ব্যাপারে আমার কোন কল্পনাও (ইতোপূর্বে) ছিল না। আমি এই স্বপ্ন আমার স্বামীর নিকট বর্ণনা করিলাম। তখন সেই দুর্ভাগা (আমাকে সজোরে) চপেটাঘাত করিয়া বলিল– তুই মদীনার সেই ব্যক্তির অপেক্ষায় (পথ চাহিয়া) আছিস!

৫	৬	৭	৮
৭ম হিঃ সনে, কাজা-ওমরা সমাপনের সময়ে। মোমেন-জননীর বয়স হইয়াছিল তখন ৩৬ বৎসর এবং হুজুরের বয়স ৫৭ বৎসর প্রায়।	প্রায় সোয়া তিন বৎসর।	৮০ বৎসর বয়সে, ৫১ হিঃ সনে, "সরফ" নামক স্থানে তিনি ইন্তেকাল করেন। সেইখানেই হুজুরের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়া ছিল।	

শব্দার্থ ঃ

(মূল উর্দূ কিতাবের পাঠকদের জন্য)

پاکدامن – পূণ্যবান-পুণ্যবতী, সংযমশীল-সংযমশীলা, সত-সতী। مخلوق –সৃষ্টি, সৃষ্টিকুল, সৃষ্ট। اندرون خانه – ঘরের মধ্যে, ঘরের ভিতরে, ঘরোয়া। انتظام – পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, সুশৃঙ্খলা। کمائی – রোজগার, আয়, কামাই। مشغول هونا – লাগা, ব্যস্তথাকা, নিয়োজিত থাকা। بال بچه - ছেলে-পুলে, সন্তান-সন্ততি। نیك سلوك – ভাল আচরণ, সদব্যবহার। اخراجات – ব্যয়ভার, খরচ। برداشت – ক্ষমতা, শক্তি, সহ্য, ধৈর্য। برابر – সমান, একরকম, একই ধরণের। لقب – উপাধি, পদবী, উপনাম, ডাকনাম। رشته – সম্পর্ক, সম্বন্ধ। روحانی – আধ্যাত্মিক, আত্মিক। حکمت – উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, অর্থ, দাবী। عیش – ভোগ, বিলাস, আনন্দ, আনন্দোল্লাসময় জীবন। پهنسنا – ফাঁদে পড়া, জড়িত হওয়া। انجام – সমাধা, সমাধান, (শেষ) ফল। خدمت – কাম, কাজ ; পরিচর্যা; চাকুরী, সংস্রব। مجاهده – পরিশ্রম, সাধনা, চেষ্টা। ریاضتیں – (ریاضت – এর বহুবচন) – সাধনা, পরিশ্রম, ব্যায়াম; আধ্যাত্মিক সাধনা। مصیبت – দুর্ভাগ্য, দুঃখ, বিপদ। ثابت قدمی – স্থিরতা, ধৈর্য। استقلال– ধৈর্য, স্থৈর্য, স্বাতন্ত্র্য, স্বনির্ভরতা। بزرگ – গুরুজন, সাধু। بچهترائج – বৎসরাজ, হিন্দুদের বড় গুরু। عرف – ডাকনাম, পরিচয়, যেই নামে সাধারণে পরিচিত। دختر – কন্যা। عرصه – সময়, কাল। ذهانت – প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা, তীক্ষ্ম মেধা। ذکاوت – বুদ্ধিমত্তা, তীক্ষ্ণ মেধা, চতূরতা। عقل – বুদ্ধি, জ্ঞান, বোধ, যুক্তি। سمجه – জ্ঞান, অনুভব, বুঝ, ধারণা, বুদ্ধি। علم – জ্ঞান, বিদ্যা; বিজ্ঞান। عمل – কার্য, কর্ম, সম্পাদন, কার্যক্রম, কর্মপদ্ধতি। پهوٹ پهوٹ کر رونا – অঝোরে কাঁদা। رحم کهانا – করুণা অনুভব করা, দয়াপরবশ হওয়া। شرابی – মদ্যপ, মদ্যপায়ী। اکهٹاکرنا – ভাঁজ করা, বাঁধা, জড় করা। تماچا – চপেটাঘাত, চড়, থাপ্পড়।

৬—

আত্মীয়-স্বজন ও অনুচরবর্গ

হুজুর (ছঃ)-এর চাচা, জেঠা ও ফুফু ঃ

প্রশ্ন ঃ হুজুর (ছাঃ)-এর চাচা-জেঠাগণ কতজন ছিলেন ? এবং (তাঁহাদের) নাম কি কি ছিল ?

উত্তর ঃ এগার বা তের জন ছিলেন। তাঁহাদের নাম ছিল এই ঃ (১) শহীদ–শ্রেষ্ট হযরত হামযা (রাঃ) (২) হযরত আব্বাস (রাঃ) (৩) জনাব আবু তালেব, তাঁহার আসল নাম ছিল আবদে মানাফ (৪) আবু লাহাব, আসল নাম– আব্দুল ওজ্জা (৫) যোবায়ের (৬) আব্দুল কা'বা (৭) জিরার (৮) কুছাম (৯) মোছ'আব, ডাকনাম– আয়দাক (১০) হারেছ (১১) মোকাওবিম (১২) মোগীরা এবং (১৩) হাজল বা হাজ্‌লা।

ইতিহাসবিদ–আলেমগণ এইরূপ মতও প্রকাশ করিয়াছেন যে, হারেছ–এর নামই মুকাওবিম ছিল। অনুরূপভাবে মুগীরার নামই হাজল বা হাজ্‌লা বলিয়া ধারণা করা হইয়াছে। এই হিসাবে হুজুর (ছাঃ)–এর চাচা-জেঠাগণ সর্বমোট এগার জন হন।

প্রশ্ন ঃ তাঁহাদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ কে ছিলেন এবং সর্বকনিষ্ঠ কে ছিলেন ? আর কে কে মুসলমান হইয়া ছিলেন ?

উত্তর ঃ সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন হারেছ এবং সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন হযরত আব্বাস (রাঃ)। আর তাঁহাদের মধ্য হইতে শুধু দুইজন মুসলমান হইয়াছিলেন– (১) হযরত হামযা এবং (২) হযরত আব্বাস (রাঃ)।

প্রশ্ন ঃ হুজুর (ছাঃ)-এর ফুফু কতজন ছিলেন ? এবং তাঁহাদের নাম কি কি ছিল ?

উত্তর ঃ ছয় জন– (১) হযরত ছফিয়্যা, (যিনি ছিলেন) হযরত যোবায়ের বিন– আউওয়ামের (রাঃ) সম্মানিতা মাতা (২) আতেকা (৩) বাররা (৪) আরওয়া (৫) উমায়মা (৬) উম্মে হাকীম বায়জা।

প্রশ্ন ঃ তাঁহাদের মধ্য হইতে কে কে ইসলাম গ্রহণ করিয়া ছিলেন ?

উত্তর ঃ হযরত ছফিয়্যার (ইসলাম গ্রহণের) বিষয়টি তো নিশ্চিত। কিন্তু আরওয়া এবং আতেকার (ইসলাম গ্রহণের) ব্যাপারে মতানৈক্য রহিয়াছে।

আজাদকৃত দাস-দাসী ঃ

প্রশ্ন ঃ হুজুর (ছাঃ)-এর আজাদকৃত দাস-দাসীর সংখ্যা কত ছিল?

উত্তর ঃ প্রায় ত্রিশজন দাস এবং নয় বা এগারজন দাসী (কে হুজুর ছাঃ আজাদ করিয়াছিলেন)। আর ইহা হইতে অধিক সংখ্যকের বর্ণনাও রহিয়াছে[১]।

খেদমত ও সেবাশুশ্রূষাকারী পুরুষগণ ঃ

প্রশ্ন ঃ হুজুর (ছাঃ)-এর বিশিষ্ট খাদেম কে কে ছিলেন?

উত্তর ঃ হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ), হযরত রবীয়া বিন কা'আব আসলামী (রাঃ), হযরত ওকবা বিন আমের জুহানী (রাঃ), হযরত বেলাল বিন রাবাহ (রাঃ), হযরত সা'আদ (রাঃ) (যিনি ছিলেন নাজ্জাশী বাদশাহ্র ভাতিজা বা ভাগিনা), হযরত জূ–মিখ্মার বা জূ–মিখবার (রাঃ), হযরত বুকায়র বিন শাদ্দাখ লায়ছী (রাঃ), হযরত মুআয়কীব বিন আবী ফাতেমা দাওসী (রাঃ), হযরত আবুজর গেফারী (রাঃ), হযরত আসলা' বিন শরীক (রাঃ) এবং হযরত আয়মান বিন ওবায়েদ (রাঃ)।

মহিলা সেবা-শুশ্রূষাকারিণীগণ ঃ

আর মহিলাগণের মধ্যে (হুজুরের বিশিষ্ট খাদেমা) ছিলেন– হযরত হিন্দ, হযরত আসমা, হযরত হারেসার কন্যাগণ এবং হযরত উম্মে আয়মান (রাঃ)।

টীকা ঃ

১. সুরুরুল মাহযুন, পৃঃ ২৯ এবং যাদুল মা'আদ পৃঃ ১২৩০ দ্রঃ (উল্লেখ্য যে, এই পুস্তকের বাকী অংশের প্রায় সকল তথ্যই অত্র টীকায় উল্লেখিত গ্রন্থদ্বয় হইতে লওয়া হইয়াছে)।

প্রশ্ন ঃ তাঁহাদের মধ্য হইতে কোন্ কোন্ জনের দায়িত্বে কি কি খেদমত ন্যস্ত ছিল ?

উত্তর ঃ হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ)-এর দায়িত্বে ছিল পারিবারিক প্রয়োজনাদির ব্যবস্থাপনা।

হযররত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্উদের (রাঃ) দায়িত্বে জুতা এবং মেসওয়াকের (ব্যবস্থাপনা ও) দেখাশুনা।

হযরত ওকবা বিন্ আমের জুহানী (রাঃ)-এর দায়িত্বে খচ্চরের দেখাশুনা, সফরের সময় উহাকে লইয়া চলা এবং লেগামের রক্ষণাবেক্ষণ।

হযরত আসলা বিন্ শরীকের (রাঃ) দায়িত্বে উটনীর দেখাশুনা।

হযরত বেলাল বিন রাবাহ (রাঃ) -এর দায়িত্বে আজান এবং ব্যয়–খরচের ভার।

হযরত আয়মান (রাঃ) -এর দায়িত্বে ওজু-ইস্তেঞ্জার পানি ও লোটা (দেখাশুনা এবং)।

হযরত মুআয়কীব বিন্ আবী ফাতেমা দাওসী (রাঃ)-এর দায়িত্বে ছিল আংটির রক্ষনাবেক্ষণ।

হুজুরের মোয়াজ্জিন ঃ

প্রশ্ন ঃ হুজুর (ছাঃ) কোথায় কাঁহাকে মোয়াজ্জিন নিযুক্ত করিয়াছিলেন ?

উত্তর ঃ (১) হযরত বেলাল (রাঃ) কে মদীনা তাইয়্যেবার মস্জিদে নববীতে।

(২) হযরত আমর বিন উম্মে মাকতুম (রাঃ) কে মদীনা তাইয়্যেবার মস্জিদে নববীতে, পালাক্রমে-কখনো রাত্রে–কখনো দিনে।

(৩) হযরত আবু মাহ্জুরা (রাঃ) কে মক্কা মোকাররমার মস্জিদে হারামে।

(৪) হযরত সাআদ কারাজ (রাঃ) কে মসজিদে কুবাতে।

হুজুর (ছাঃ)-এর পাহারাদারগণ ঃ

প্রশ্ন ঃ কে কোথায় হুজুর (ছাঃ) কে পাহারা দিয়াছিলেন ?

উত্তর ঃ হযরত সাআদ বিন্ মুআজ (রাঃ) বদর-যুদ্ধের দিবসে, যখন হুজুর (ছাঃ) কুটির (অর্থাৎ তাঁবুর) মধ্যে বিশ্রাম করিতে ছিলেন।

হযরত জাকওয়ান বিন আব্দে কায়স (রাঃ) এবং হযরত মোহাম্মদ বিন মাসলামা আনছারী (রাঃ) ওহোদ যুদ্ধের দিবসে।

হযরত যোবায়ের (রাঃ) আহযাব (তথা খন্দক) যুদ্ধের দিবসে।

হযরত 'আব্বাদ বিন্ বিশ্র (রাঃ), হযরত সাআদ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ), হযরত আবু আইয়্যুব আনছারী (রাঃ) এবং হযরত বেলাল (রাঃ)– ওয়াদিয়ে কোরা-যুদ্ধের দিবসে (হুজুর (ছাঃ) কে পাহারা দিয়া ছিলেন)।

প্রশ্ন ঃ প্রহরার নিয়ম কত দিন পর্যন্ত চালু.ছিল ?

উত্তর ঃ প্রকৃতপক্ষে হুজুর (ছাঃ)-এর ভরসা সর্বদা আল্লাহ পাকের সত্তার উপরই ছিল। যেমনটি প্রমাণিত হয় গাযওয়ায়ে গাতফানের সময়, দা'সূর মোহারেবীর ঘটনা হইতে। যাহা সংঘটিত হইয়াছিল তৃতীয় হিজরীর রবিউল আউওয়াল মাসে। অবশ্য উপকরণ ও কৌশল হিসাবে লোকেরা (অর্থাৎ ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হুজুর (ছাঃ)-এর জন্য) প্রহরা বসাইতেন। কিন্তু যখনই এই আয়াত আবতীর্ণ হইল ঃ

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

অর্থাৎ, "আল্লাহ পাকই আপনাকে মানুষের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবেন"। তখন হুজুর (ছাঃ) উহাও বন্ধ করিয়া দিলেন।

হুদী-পাঠক তথা উট-চালনার গান পরিবেশনকারীগণ ঃ

প্রশ্ন ঃ (হুজুর (ছাঃ)-এর সঙ্গে চলমান) কাফেলার মধ্যে অগ্রভাগের উটের উপর যাঁহারা হুদী-পাঠ করিতেন, অর্থাৎ– যাঁহারা উষ্ট্র–দ্রুতচলার জন্য কবিতা পরিবেশন করিতেন,তাঁহারা কে কে ছিলেন ?

উত্তর ঃ তাঁহারা ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা, হযরত আন্‌জাশা, হযরত আমের বিন আকওয়া' এবং তাঁহার (অর্থাৎ হযরত আমেরের) চাচা সালামা বিন আক্‌ওয়া' (রাঃ)।

হুজুরের লিপিকার ঃ

প্রশ্ন ঃ বিভিন্ন সময়ে হুজুর (ছাঃ)-এর (জারিকৃত আদেশ-নির্দেশ সম্বলিত) ফরমানাদি এবং অন্যান্য কাগজপত্রসমূহ কাঁহারা কাঁহারা লিখিতেন ?

উত্তর ঃ তাঁহারা হইলেন-হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ), হযরত ওমর ফারূক (রাঃ), হযরত ওসমান গণী (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত 'আমের বিন ফোহায়রা (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ বিন আরকাম, (রাঃ) হযরত উবায় বিন কা'আব (রাঃ), হযরত সাবেত বিন কায়েস বিন শাম্মাস (রাঃ), হযরত খালেদ বিন সাঈদ (রাঃ), হযরত হানজালা বিন রবী'(রাঃ), হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রাঃ), হযরত মোআবিয়া (রাঃ) এবং এবং হযরত শুরাহ্‌বীল বিন হাসানা (রাঃ)।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ–যাঁহাদের প্রতি ছিল হুজুরের খাছ দৃষ্টি ঃ

প্রশ্ন ঃ তাঁহারা কাঁহারা ? যাঁহাদের প্রতি হুজুর (ছাঃ) বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতেন ?

উত্তর ঃ তাঁহারা ছিলেন– চার খলীফা, হযরত হামযা, হযরত জাফর, হযরত আবুজর গেফারী, হযরত মেকদাদ, হযরত সালমান, হযরত হোজায়ফা, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, হযরত 'আম্মার এবং হযরত বেলাল (রাঃ)।

আশারায়ে মুবাশ্‌শারা ঃ

প্রশ্ন ঃ আশারায়ে মুবাশ্‌শারা অর্থাৎ ঐ বিশিষ্ট দশ ব্যক্তি, যাঁহাদিগকে দুনিয়াতেই বেহশ্‌তের সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা কাঁহারা ?

উত্তর ঃ তাঁহারা হইলেন– চার খলীফা, হযরত সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাছ, হযরত যোবায়ের বিন আউওয়াম, হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ, হযরত তালহা বিন্ ওবায়দুল্লাহ, হযরত ওবায়দা বিন জাররাহ এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ)।

শব্দার্থ ঃ

(মূল উর্দূ কিতাবের পাঠকদের জন্য)

لواحقین – চাকর, ভৃত্য, পরিচারক, চাকরবাকর, অনুচরবর্গ, দাসদাসীবৃন্দ, কর্মচারীবৃন্দ। خدمت – সেবা, শুশ্রূষা। خادم – খাদেম, সেবক, চাকর, কর্মচারী। جهونپڑی – কুটির, কুঁড়েঘর। تدبیر – উপায়, উপকরণ, কৌশল। حدی – উষ্ট্র-চালকের গান। قافله – যাত্রীদল, কাফেলা, অভিযাত্রীদল। محرر – লেখক, কেরাণী, লিপিকার, কাতেব। فرمان – রাজাজ্ঞা, আদেশ, নির্দেশ। نجباء – (نجیب এর বহুবচন) অর্থ–নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ, বিশিষ্ট লোকজন।

হুজুরের গৃহপালিত পশু, যুদ্ধাস্ত্র এবং ঘরের আসবাবপত্র

ঘোড়া ঃ

(১) সাকব– ওহোদ যুদ্ধের সময় হুজুর (ছাঃ) ইহার উপর সওয়ার (আরোহী) ছিলেন। ইহার কপাল এবং তিনটি হাত-পা সাদা ছিল। শরীরের রং ছিল কাল- মিশ্রিত লালবর্ণের (অর্থাৎ উন্নাব ফলের মত লালবর্ণের)। ডান হাত (বাহু) ছিল শরীরের বর্ণের। ঘোড়–দৌড়ের সময় (একদা) হুজুর (ছাঃ) উহার উপর আরোহণ করিয়াছিলেন। উহা (তখন সকলকে) অতিক্রম করিয়া আগে চলিয়া গিয়াছিল। ইহা প্রথম ঘোড়া, হুজুর (ছাঃ) (সর্বপ্রথম) যাহার মালিক হইয়া ছিলেন।

(২) মোরতাজিয– ইহা ছিল ধূলি-বর্ণের। অর্থাৎ কাল-মিশ্রিত সাদা (বর্ণের)।

(৩) লাহীফ– রবী'আ উপঢৌকন স্বরূপ এই ঘোড়াটি পাঠাইয়া ছিলেন।

(৪) লিযায- মোকাওকিশ এই ঘোড়াটি হাদিয়া হিসাবে পাঠাইয়া-ছিলেন।

(৫) জরব বা তরব – এই ঘোড়াটি ফারওয়া জুদামী উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া ছিলেন।

(৬) সাবহা – হুজুর (ছাঃ) ইহাকে ইয়ামানের ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিলেন। ঘোড়দৌড়-প্রতিযোগীতায় হুজুর (ছাঃ) তিনবার উহার উপর চড়িয়াছিলেন এবং বিজয়ী হইয়াছিলেন। হুজুর (ছাঃ) আপন পবিত্র হাতে উহাকে চাপড় দিয়া (এবং উহার পিঠে হাত বুলাইয়া) বলিয়া ছিলেন "বাহ্‌রুন" অর্থাৎ দ্রুতগামী ও দীর্ঘদেহী ঘোড়া, যাহার গতি-প্রবাহ সমুদ্রের মত।

(৭) ওয়ারদ্ – এই ঘোড়াটি হযরত তামীম দারী (রাঃ) উপহার স্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন।

(৮) জারীস।

(৯) মালাবিহ্

(১০) দশম ঘোড়টির নাম জানা যায় নাই। আর (ঘোড়ার সংখ্যা নির্ণয়ের ব্যাপারে) ইহা হইতে অধিক (সংখ্যক অর্থাৎ) ১৫টি পর্যন্তেরও বর্ণনা রহিয়াছে।

খচ্চর ঃ

(১) দুলদুল – ইহা হাদিয়া পাঠাইয়াছিলেন মোকাওকিশ। ইহা কাল-মিশ্রিত সাদা অর্থাৎ ধূসর রঙ্গের ছিল। ইহাই সর্বপ্রথম খচ্চর, ইসলামের যুগে যাহার উপর হুজুর (ছাঃ) আরোহণ করিয়াছিলেন।

(২) ফিজ্জা – ইহা হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) অথবা ফারওয়া জুদামী (হুজুরের দরবারে) পেশ করিয়াছিলেন।

(৩) আয়লিয়্যা – ইহা ছিল আয়লা নামক স্থানের বাদশার উপঢৌকন।

(৪) ইহার (অর্থাৎ- চতুর্থ নম্বর খচ্চরটির) উল্লেখ শুধু আল্লামা ইবনে

কাইয়্যিম (রঃ) করিয়াছেন। কিন্তু তিনি (উহার কোন) নাম বর্ণনা করেন নাই। ইহা ছিল দুমাতুল জান্দালের বাদশার হাদিয়া।

দীর্ঘ-কর্ণ বিশিষ্ট পশু (অর্থাৎ-গাধা) ঃ

(১) ইয়াফুর বা ওফায়র- (নামক) এই গাধাটি "মোকাওকিশ" হাদিয়া দিয়াছিলেন। ইহা কাল মিশ্রিত লাল বর্ণের ছিল।

(২) আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম ইহার (অর্থাৎ- দ্বিতীয় গাধাটির) কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু নাম বলেন নাই। ইহা ছিল ফারওয়া জুদামীর হাদিয়া।

দুগ্ধদা এবং বোঝাবহনের উষ্ট্রী ঃ

দুধের এবং বোঝাবহনেরউষ্ট্রী ছিল কুড়িটি। আর আল্লামা ইবনে কাইয়্যিমের বর্ণনা অনুসারে পঁয়তাল্লিশটি। এইগুলি গাবা নামক স্থানে থাকিত।

আরোহণের উষ্ট্রী ঃ

আরোহণের উষ্ট্রী ছিল দুইটি বা তিনটি ঃ

(১) কছওয়া- ইহার ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, হিজরতের সময় ইহাই হুজুর (ছাঃ)-এর সওয়ারী ছিল।

(২) আজবা এবং

(৩) জাদ'আ-কেহ কেহ এই নাম দুইটি একই উষ্ট্রীর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ উল্লেখিত নাম তিনটি একই উষ্ট্রীর নাম বলিয়াও মত প্রকাশ করিয়াছেন।

আরোহণের উষ্ট্র ঃ

আরোহনের উষ্ট্র ছিল একটি। যাহা মূলতঃ আবু জেহেলের ছিল। বদর যুদ্ধে তাহা মুসলমানদের হস্তগত হয়। উহার নাকে ছিল রৌপ্যের কড়া। হোদায়বিয়ার সন্ধির দিবসে হুজুর (ছাঃ) উহাকে মক্কাবাসীদের নিকট হাদিয়া স্বরূপ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

ছাগ ও বকরী ঃ

হুজুর (ছাঃ)-এর ছাগল এবং বকরী ছিল এক শতটি। উহাদের মধ্যে যখন কোন বাচ্চা জন্মাইত, তখন হুজুর (ছাঃ) একটি (বড় ছাগল বা বকরী) জবাই করিয়া দিতেন। ফলে (ছাগ-বকরীর সংখ্যা কখনও) একশত (সংখ্যাকে) অতিক্রম করিত না। সেইগুলির মধ্য হইতে বিশেষ একটি বকরী হুজুর (ছাঃ)-এর দুধের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

মোরগ ঃ

মোরগ ছিল একটি। উহার রং ছিল সাদা। বাকী আল্লাহ্ পাকই ভাল জ্ঞাত।

যুদ্ধাস্ত্র

তরবারী ঃ

(১) মাসূর– ইহা সর্বপ্রথম তরবারী, যাহা হুজুর (ছাঃ) আপন সম্মানিত পিতার উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়াছিলেন।

(২) জুলফিকার–এই তরবারীটি ছিল বনিল হাজ্জাজ গোত্রের। বদর যুদ্ধে ইহা (মুসলমানদের) হস্তগত হইয়াছিল। ওহোদ যুদ্ধের পূর্বে হুজুর (ছাঃ) এই তরবারীটি সম্পর্কে একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। যাহার ব্যাখ্যা হুজুর (ছাঃ) পরাজয় দ্বারা করিয়া ছিলেন। ওহোদ যুদ্ধে তাহা (অর্থাৎ হুজুরের সেই ব্যাখ্যা) পূর্ণ ও বাস্তবায়িত হইয়াছিল।

(৩) কল'ঈ-

(৪) বাত্তার এবং

(৫) (খানাফ বা) হাতাফ– এই তিনতি তরবারী বনী কায়নোকার মালামালের মধ্য হইতে হস্তগত হইয়াছিল।

(৬) কজীব-ইহা সর্বপ্রথম তরবারী, যাহা হুজুর (ছাঃ) ছোট কোরআন শরীফকে গলায় ঝুলাইয়া রাখার মত করিয়া পরিধান করিয়া ছিলেন (অর্থাৎ গলায় ঝুলাইয়া ধারণ করিয়া ছিলেন)।

(৭) আযব (বা আছব)– ইহা হযরত সাআদ বিন ওবাদা (রাঃ) হুজুর (ছাঃ) কে হাদিয়া দিয়াছিলেন।

(৮) রসূব (বা দাসূব)।

(৯) (মিখজাম বা) মিজযাম।

বর্শা ঃ

(১) মাসওয়া।

(২) মুনসানী।

(৩) "হারবা" এক প্রকার" বর্শা। নাই'আ (বা নাব'আ) যাহাকে বলা হইত।

(৪) ইহা একটি ছোট বর্শা। যাহার নাম ছিল গামরা। উহা (রোজার) ঈদ (এবং) বকরা ঈদের সময় (ঈদগাহে) হুজুর (ছাঃ)-এর সামনে লইয়া যাওয়া হইত এবং নামাজের সময় উহাকে সামনে গাড়িয়া সুত্‌রা (অর্থাৎ বেড়াদন্ড) বানানো হইত। আবার কখনও কখনও উহা সঙ্গে লইয়া হুজুর (ছাঃ) চলাফেরাও করিতেন।

(৫) বায়যা– ইহা ছিল একটি বড় বর্শা।

লাঠি ঃ

(১) মিহ্‌জান– ইহা একটি ছোট লাঠি। প্রায় এক হাত লম্বা। ইহার হাতলটি ছিল বাঁকানো। উষ্ট্রের উপর আরোহণের সময় উহা হুজুর (ছাঃ)–এর সঙ্গে থাকিত। চলফেরা এবং (সওয়ারীর উপর) আরোহণ করিবার সময়ও হুজুর (ছাঃ) উহা দ্বারা সাহয্য গ্রহণ করিতেন।

(২) উরজুন – ইহা ছিল (একটি) পূর্ণ লাঠির অর্ধাংশ।

(৩) মামশূক– ইহা ছিল শাওহাত বৃক্ষের একটি চিকন–সরু লাঠি।

ধনুক ঃ

(১) শিদাদ (২) যাওরা (৩) রাওহা (৪) ছফরা (৫) বায়যা এবং (৬) কাতূম–ইহা ওহোদ যুদ্ধের সময় ভঙ্গিয়া গিয়াছিল।

তীরকোষ ঃ

(১) জমা' এবং (২) কাফূর।

শিরস্ত্রাণ ঃ

(১) মুওয়াশশাহ্ (২) যুল মাসবূগ।

লৌহবর্ম ঃ

(১) যাতুল ফুযূল–ইহা ঐ লৌহবর্ম, যাহা হুজুর (ছাঃ) আপন পরিবারের লোকদের খাবারের ব্যবস্থা –বন্দোবস্তের জন্য ত্রিশ সা' অর্থাৎ প্রায় আড়াই মণ শস্যের বিনিময়ে, আবু শাহ্ম নামক ইহুদীর নিকট এক বৎসরের জন্য বন্ধক রাখিয়াছিলেন। বর্ণিত আছে যে, হোনাইন যুদ্ধের সময় হুজুর (ছাঃ) এই লৌহবর্মটিই পরিধান করিয়াছিলেন।

(২) যাতুল বিশাহ্।

(৩) যাতুল হাওয়াশী।

(৪) সু'দিয়া এবং

(৫) ফিয্‌যা–এই দুইটি লৌহবর্ম বনি কায়নুকার মালামালের মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল।

(৬) বতরা (বা তবরা)।

(৭) খরনক বা (খনযক)।

চামড়ার কোমর বন্ধনী ঃ

(চামড়ার একটি (কোমর বন্ধনী ছিল।) উহাতে রৌপ্যের তিনটি কড়া ছিল।

ঢাল ঃ

(১) যালূক।

(২) ফাতক।

(এইগুলির মধ্য হইতে) একটি ঢালের উপর চিলের ছবি অঙ্কিত ছিল। হুজুর (ছাঃ) উহার উপর আপন পবিত্র হস্ত রাখিলে-তৎক্ষণাৎ উহা নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

পতাকা ঃ

একটি কাল রঙ্গের (বড়) পতাকা ছিল। উহার নাম ছিল ওকাব। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক পতাকা প্রয়োজনের সময় বানানো হইয়াছে। সেইগুলির বিভিন্ন রং ছিল। পতাকা-দন্ডগুলি সাধারণতঃ সাদা রঙ্গের হইত।

তাঁবু ঃ

তাঁবু ছিল একটি।

পোশাক

জামা ঃ

'আবা জাতীয় ঢিলা জামা ছিল চারটি। তন্মধ্যে একটির ভিতরে খেজুরের ছাল ভরা ছিল।

অন্যান্য কাপড়-চোপড় ঃ

জুব্বা তিনটি।

হিবারী কাপড় (অর্থাৎ সুতা বা কাতানের তৈরী, ডোরা ওয়ালা ইয়ামানী কাপড় বিশেষ) ছিল দুইটি।

কালারবিহীন সাহারী (অর্থাৎ ঈষৎ লালিমা মিশ্রিত কালরঙ্গের কাপড়ের তৈরী) জামা ছিল একটি।

সাহারী কুর্তা (অর্থাৎ ঢিলা এবং লম্বা জামা বিশেষ) ছিল দুইটি।

ইয়ামানী জামা একটি।

সহুল কুর্তা (অর্থাৎ মসৃণ সাদা কাপড় বা অপক্ক সুতার কাপড়ের তৈরী পোষাক বিশেষ) ছিল একটি।

নকশী বা ডোরাযুক্ত চাদর একটি।

সাদা কম্বল একটি।

টুপি তিনটি অথবা চারটি।

পাগড়ী একটি।

কাল কম্বল একটি।

লেপ একটি।

খেজুরের ছাল ভর্তি চামড়ার বিছানা ছিল একটি।

দুইটি কাপড় জুমার নামাজের জন্য নির্দিষ্টি থাকিত - (১) একটি রুমাল এবং (২) এক জোড়া সাদা মোজা। এইগুলি নাজ্জাশী বাদশা তাঁহাকে (ছাঃ)কে হাদিয়া স্বরূপ দিয়াছিলেন।

বাসনপত্র

কাঠের বড় পেয়ালা ঃ

কাঠের বড় পেয়ালা ছিল একটি। উহার তিন স্থানে রৌপ্যের ছোট ছোট পাত লাগাইয়া উহাকে শক্ত ও মজবুত করা হইয়াছিল।

পাথরের পেয়ালা ঃ

পাথরের পেয়ালা ছিল একটি। উহা দ্বারা হুজুর (ছাঃ) ওজু করিতেন।

পিতল বা কাঁসার বড় পাত্র ঃ

পিতল বা কাঁসার বড় পাত্র ছিল একটি। উহার মধ্যে মেহেদী এবং ওয়াস্‌মা (ইহা এক প্রকার উদ্ভিদ, যাহার পত্র দ্বারা চুলের কলপ প্রস্তুত করা হয়) পিষা হইত। (উল্লেখ্য যে,) হুজুর (ছাঃ) গরমের সময় মাথা মোবারকে মেহেদী ব্যবহার করিতেন।

কাঁচের পেয়ালা ঃ

কাঁচের পেয়ালা ছিল একটি।

পিতলের বড় পাত্র ঃ

পিতলের বড় পাত্র ছিল একটি। উহা গোসল ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হইত।

গারা ঃ

গারা নামক একটি বড় পাত্র ছিল। উহার মধ্যে চারটি কড়া লাগানো ছিল। উহাকে চার ব্যক্তি (মিলিয়া) উঠাইত (অর্থাৎ উহা এত বড় ছিল যে, উহাকে স্থানান্তর করিতে-বা বহন করিতে চারজন মানুষের প্রয়োজন হইত)।

একটি কাঠের পেয়ালা ঃ

উহা ঘরের ভিতরে রাখা থাকিত। প্রয়োজনের মূহুর্তে রাত্রের বেলায় কখনও কখনও হুজুর (ছাঃ) উহাতে প্রস্রাব করিতেন।

একটি থলি ঃ

উহার মধ্যে আয়না, চিরুনি, সুরমাদানী, কেঁচি এবং মেসওয়াক থাকিত।

একটি খাট ঃ

উহার পায়াগুলি ছিল শাল কাষ্ঠের। হযরত আস'আদ বিন যুরারা (রাঃ) উাহা হুজুর (ছাঃ)-কে হাদিয়া দিয়া ছিলেন।

একটি রৌপ্যের আংটি ঃ

হুজুর (ছাঃ)-এর একটি রৌপ্যের আংটি ছিল। উহার উপর (আরবীতে) খোদিত ছিল– الله رسول محمد ("মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ")।

শব্দার্থ ঃ

(মূল উর্দূ কিতাবের পাঠকদের জন্য)

تھپکنا – চাপড় দেওয়া, আদর করা, হাত বুলান। نیزہ – বল্লম, বর্শা। حمائل – ছোট কোরআন শরীফ-যাহা গলায় ঝুলানো হয়, গলায় ঝুলানোর বস্তু, বেল্ট, মোটা ফিতা, কোমরবন্ধ, পেটি-যাহা তরবারী ঝুলানোর জন্য গলায় বাঁধা হয়। کمان – ধনুক। ترکش – তীরকোষ, তুনীর, শরাশ্রয়। زرہ – লৌহবর্ম। پتری – রৌপ্য ইত্যাদির ছোট টুকরা, পাত। کونڈا – বড় পাত্র, পাত্র, থালা, বাসন, রেকাব। وسمہ – নীল বৃক্ষের পাতা, নীল রং ; এক জাতীয় উদ্ভিদ-যাহার পাতা দ্বারা কলপ প্রস্তুত করা হয়। کڑا – কড়া, আংটা। تھیلہ – থলি, চটের থলি। چارپائی – খাট।

সমাপ্ত